সখিনার চন্দ্রকলা

সেলিনা হোসেন

প্রিতম প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০০৭
প্রথম প্রিতম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১৩

প্রকাশক : পপি চৌধুরী
১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭২৮৬১৪৭, ০১৭১৮২৯৯৩৩১

প্রচ্ছদ: জয়া
প্রচ্ছদ ছবি: ইন্টারনেট হতে গৃহীত

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক

কম্পোজ: দীপ কম্পিউটার্স

মূল্য: ২২৫.০০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক: মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

SOKHINAR CHANDROKALA
by Selina Hossain
published by Pritom Prokash
11/1 Bangla Bazar, Dhaka-1100.
Ph: 7286147, 01718299331
Web: www.pritom-prokash.com,
E-mail: pritom_po@yahoo.com

Price Taka 225 / US $-10

ISBN: 978-984-8853-41-2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ
বাসবী ফ্রেজার
দূরের দেশের কাছের বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

গল্প

০১. উৎস থেকে নিরন্তর	১৯৬৯
০২. জলবতী মেঘের বাতাস	১৯৭৫
০৩. খোল করতাল	১৯৮২
০৪. পরজন্ম	১৯৮৬
০৫. মানুষটি	১৯৯৩
০৬. মতিজানের মেয়েরা	১৯৯৫
০৭. অনূঢ়া পূর্ণিমা	২০০১
০৮. একালের পান্তাবুড়ি	২০০৩
০৯. নারীর রূপকথা	২০০৭
১০. সখিনার চন্দ্রকলা	২০০৭
১১. অবেলার দিনক্ষণ	২০০৯

উপন্যাস

০১. জলোচ্ছ্বাস	১৯৭২
০২. জোৎস্নায় সূর্যজ্বালা	১৯৭৩
০৩. হাঙর নদী গ্রেনেড	১৯৭৬
০৪. মগ্ন চৈতন্যে শিস	১৯৭৯
০৫. যাপিতজীবন	১৯৮১
০৬. নীল ময়ূরের যৌবন	১৯৮২
০৭. পদশব্দ	১৯৮২
০৮. চাঁদ বেনে	১৯৮৪
০৯. পোকামাকড়ের ঘরবসতি	১৯৮৬
১০. নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি	১৯৮৭
১১. ক্ষরণ	১৯৮৮
১২. কাঁটাতারে প্রজাপতি	১৯৮৯
১৩. খুন ও ভালোবাসা	১৯৯০
১৪. কালকেতু ও ফুল্লরা	১৯৯২
১৫. ভালোবাসা প্রীতিলতা	১৯৯২
১৬. টানাপোড়েন	১৯৯৪
১৭. গায়ত্রী সন্ধ্যা-এক	১৯৯৪
গায়ত্রী সন্ধ্যা-দুই	১৯৯৫
গায়ত্রী সন্ধ্যা-তিন	১৯৯৬
১৮. দীপান্বিতা	১৯৯৭
১৯. যুদ্ধ	১৯৯৮
২০. লারা	২০০০
২১. মোহিনীর বিয়ে	২০০১
২২. কাঠ কয়লার ছবি	২০০১
২৩. আনবিক আঁধার	২০০৩
২৪. ঘুমকাতুরে ঈশ্বর	২০০৪
২৫. মর্গের নীল পাখি	২০০৫
২৬. অপেক্ষা	২০০৭
২৭. দিনের রশিতে গিটঠু	২০০৭
২৮. মাটি ও শস্যের বুনন	২০০৭
২৯. পূর্ণ ছবির মগ্নতা	২০০৮
৩০. ভূমি ও কুসুম	২০১০
৩১. যমুনা নদীর মুশায়রা	২০১১
৩২. গাছটির ছায়া নেই	২০১২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

১.	বনভূমি	০৯
২.	সিজ ফায়ার	২১
৩.	পঞ্চাশ	৩১
৪.	বিধবা	৩৮
৫.	ভাবমূর্তি	৪৮
৬.	নো ক্লু	৫৮
৭.	পা ও গ্রেনেড	৬৪
৮.	মইরম জানে না ধর্ষণ কি	৭১
৯.	জেসমিনের ইচ্ছাপূরণ	৮৩
১০.	ল্যাংড়াটা খুন হয়েছে	৯৪
১১.	অরণ্য কুসুম	১০৩
১২.	ধারণা	১১৪
১৩.	কুন্তলার অন্ধকার	১২২
১৪.	দুই কিশোরীর ক্রসফায়ার	১২৭
১৫.	শেষ পর্যন্ত শফিউল্লাহ	১৩৩
১৬.	ঘোষণা	১৪২
১৭.	সখিনার চন্দ্রকলা	১৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনভূমি

কচি বাঁশের সঙ্গে কুচো চিংড়ি দিয়ে দারুণ রেঁধেছে মা, চন্দনা উঠোনে দাঁড়িয়েই মায়ের রান্নার গন্ধ পেয়ে এমন সিদ্ধান্তে আসে। ভাবে দু'থালা ভাত খেয়ে দুপুরে কড়া ঘুম দেবে। আজ ভাত একটু বেশিই খেতে হবে। কেন অন্যদিনের চেয়ে বেশি খেতে হবে, এমন কোনো সঙ্গত ধারণা ওর মধ্যে কাজ করে না।

কিন্তু বিছানায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করার পরও ওর ঘুম আসে না। ইদানীং ও ঠিকমতো ঘুমুতে পারে না। রাতে শুয়ে জেগেই থাকে। অনবরত শুনতে পায় ঘরের বেড়ার পাশে খসখস শব্দ। এ কথা মাকে বললে মা রেগে যায়।

কোথায় শব্দ? আমি তো শুনতে পাই না।

বন্ধনীরানী রেগে গেলে চন্দনা ঠাণ্ডা গলায় শান্ত স্বরে বলে, তুমি শুনবে কি করে মা। তুমি তো ঘুমিয়ে থাকো।

আমি তো ঘুমুবোই, আমাকে তো ভূতে ধরেনি।

হ্যাঁ, আমাকে ভূতেই ধরেছে।

চন্দনা রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তড়পায়। ভূতটাকে পায়ের নিচে পিষে ফেলার ইচ্ছায় ওর শরীর নিশপিশ করে। মাকে তো এসব কথা বলা যায় না। শুনলে মায়ের শরীর খারাপ করবে। যতদিন না বলে থাকা যায় ততদিন মায়ের শান্তি। কিন্তু কতদিন আড়াল করে থাকতে পারবে? মায়ের জন্য চন্দনার দুঃখ হয়, কষ্ট চাক বেঁধে থাকে। তবু যতদিন পারা যায় ততদিন ও মাকে আড়াল করেই রাখবে।

সে সন্ধ্যায় কয়েকজন বাঙালি সেটেলার বাড়িতে আসে। চন্দনা হারিকেনের আলোয় কলেজের পড়া মুখস্থ করছিল। আগামীকাল ওর পরীক্ষা। ছেলেরা বন্ধনীরানীকে উঠোনে পেয়ে বলে, কেমন আছেন কাকী?

তোমরা কি চাও বাবারা?

কিছু না। এমনি এসেছি। চন্দনা নেই?

আছে তো। কাল ওর পরীক্ষা।

একজন হো হো করে হেসে বলে, ও আর কি পরীক্ষা দেবে। পড়ার চেয়ে ও রাজনীতি বেশি ভালোবাসে।

তা বাবারা ও যা করতে চায় করুক। আমার মেয়েটার মাথা ভালো। রেজাল্ট তো ভালোই করে।

শুধু মাথা না কাকী, ওর সব কিছু ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হো হো করে হাসে ছেলেরা। তখন হারিকেন উঁচু করে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে চন্দনা।

আমার বাড়িতে এসে তোদের এত হাসাহাসি কেন? বের হ, বের হ বলছি। নইলে চেলা কাঠ দিয়ে পিঠ ফাটিয়ে ফেলব।

ও বাব্বা, এত দেমাগ কিসের?

তোরা যাবি কি-না বল?

লেফটেন্যান্টের মেজাজটা ভালোই তো রপ্ত করেছিস। জমে গেছিস নাকি বেটার সঙ্গে!

চন্দনা হারিকেনটা দু'হাতে উপরে তোলে। ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করতেই ছেলেগুলো পিছু হটে দৌড়ে চলে যায়। যেতে যেতে নানা ধরনের অশ্লীল মন্তব্য করে। বন্ধনীরানীর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। বলে, ওরা এসব কি বলছে মা?

তুমি ওদের কথায় কান দেবে না।

কান দেব না বললেই হলো? না দিয়ে কি উপায় আছে?

আহ মা, আমি পড়তে বসব। কাল আমার পরীক্ষা।

চন্দনা হারিকেন হাতে দুপদাপ পা ফেলে নিজের টেবিলে ফিরে যায়। কিন্তু পড়ায় মন বসে না। দু'হাতে মাথা চেপে বসে থাকলে শুনতে পায় মা বারান্দায় বসে গুনগুন করে কাঁদছে। ওর মন আরো খারাপ হয়ে যায়। ও খাতার পাতায় আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বেশ বড় বড় করে লেখে 'বনভূমিতে হেসেখেলে বড় হয়ে ওঠা চন্দনার এখন ভীষণ দুঃসময়'।

চন্দনা বুঝে গেছে যে লেফটেন্যান্টের চোখ ওর ওপর পড়েছে। লেফটেন্যান্ট এখন মাকড়সার মতো সুতো ছড়াবে আর জাল বুনবে– ও হয়ে যাবে একটি পোকা।

ভয় নয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ওর চোখের সামনে পাহাড়ী খাদের মতো বিশাল হয়ে যায়। একবার গড়িয়ে পড়ার অর্থ মৃত্যু। চন্দনা বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ায়। দূর পাহাড়ের মাথায় সেনা ছাউনির চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। বন্দুকধারী পাহারাদারও স্পষ্ট হয়ে থাকে, যেন একটি মরা গাছের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে পলকহীন, ভাবলেশহীন। বন্দুকটা গর্জে ওঠানোই তার কাজ।

চন্দনা নিজের দিকে তাকায়। পুরো শরীরটা দেখতে পায় না– ঘাড়, পিঠ কিংবা নিতম্ব। সামনের অংশও সব দেখতে পায় না– শুধু দেখা যায় স্তন, পেট, উরু, হাঁটু, পায়ের পাতা এবং লেফটেন্যান্টের ভাষার গিরিখাদ। ওর ক্রোধ বাড়ে। লোকটার আচরণ সীমা ছাড়িয়েছে। একদিন রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ওর মাথাটা ফাটিয়ে দেবার ক্রোধে ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে। ঈশ্বর জীবন দিয়েছ, শক্তিও দাও, জীবনহরণ করার শক্তি। ওর কানে ধ্বনিত হয় লেফটেন্যান্টের দম্ভ তোর গিরিখাদে ঢুকে বনভূমি আর আকাশ দেখব। গিরিখাদে শুয়ে পাখি আর কুয়াশা দেখব। তুই বাড়াবাড়ি করলে বেঁধে রাখব গাছের সঙ্গে। নড়ার সাধ্য থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দনা ছুটে যায় জলের কাছে। ওকে ক্রোধ দমন করতে হবে। ক্রোধ দমন করার জন্য ওকে ওর মুখমণ্ডল দেখতে হবে। শরীরের এই অংশটুকু তো ও অন্য কিছুর সাহায্য ছাড়া দেখতে পায় না। তাহলে কি ওর মুখমণ্ডল ওর সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে? ও চোখের ভাষা পড়তে পারছে না।

কুঁচকে থাকা কপালের বলিরেখা কিংবা ভ্রূর ভঙ্গিও, যেটা দিয়ে শাসন হয়, ভালোবাসা হয়, সেটাও তো ওর দেখার বাইরে থেকে যায়। এরপরও চোয়াল আছে, চিবুক আছে, ঠোঁট আছে– সেসবের কী হবে? চন্দনা চিৎকার করে মাকে ডাকে।

রান্না ফেলে ছুটে আসে বন্ধনীরানী।

কি হয়েছে মা?

দিনটার কথা মনে আছে?

আজ বাবার মৃত্যুদিন।

থমকে যায় বন্ধনীরানী। স্খলিত কণ্ঠে বলে, জানি।

আজ আমি কলেজে যাব না।

জানি।

ভাত খাব না।

জানি।

ডায়রি লিখবি?

লিখব।

আর কি করবি?

নূরুল হক কুত্তাটার পাছায় লাথি মারব।

পারবি?

পারব। তুই দেখিস ঠিকই পারব।

এখন ঘরে আয়।

আজ সারাদিনে তুমি আমাকে ঘরে পাবে না। আমি বিজয় কাকার নির্বাচনী প্রচারণার কাজে যাব। কাকাকে জেতাতে হবে।

নির্দলীয় প্রার্থী হলে কেই জিততে পারে?

সৎ হলে, কর্মঠ হলে পারে মা। তুমি চুলোয় কি বসিয়ে রেখে এসেছিলে? পুড়ছে। গন্ধ পাচ্ছ না?

বন্ধনীরানী বাতাসে গন্ধ টেনে ছুটে রান্নাঘরে যায়। চন্দনা মায়ের চলে যাওয়া দেখে দৃষ্টি ফেরায়। দূর পাহাড়ের মাথায় সেনা ছাউনির চূড়াটা দেখা যাচ্ছে। ও বাবার মৃত্যুদিনকে স্মরণ করে। ওর পনের বছর বয়সে এই দিনে বাবা মারা গেছে। দু'দিন অভুক্ত থেকে, মুখে রক্ত উঠে, চোখটা ঘোলাটে করে, সারা শরীরে খিচুনি তুলে মাটিতে তড়পাতে তড়পাতে মৃত্যু। এসব ভাবনায় চন্দনার চোখ জ্বলে ওঠে না। চোখে মেঘ ঘনায় না। বৃষ্টি নামে না। চোখে দূর পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা নীলাভ কুয়াশা জমে না।

চন্দনার দৃষ্টিতে একজোড়া বুটের প্রতিচ্ছায়া ভেসে ওঠে। ও দেখতে পায় পাহাড়ের মাথা থেকে বুটের ফিতা ঝুলে আছে। ওই ফিতায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়ি মেয়েকে। মেয়েটির চোখে পাথরের মতো দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। একটু পরে ওই ফিতা থেকে ওকে ফেলে দেওয়া হবে পাহাড়ের খাদে। কাউকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য বুটের ফিতাই যথেষ্ট। অর্থাৎ সামরিক দাপট এমনই।

চন্দনা দাঁত কিড়কিড় করে। কিছু কিছু ভাবনা শব্দের ধ্বনি তোলে, কিছু কিছু ভাবনা পাল্টে দেয় দৃষ্টি, কখনো মুখমণ্ডল এমনভাবে বদলে যায় যে ও তখন অন্য মেয়ে হয়। এটা অবশ্য ওর নিজের কথা নয় অন্যের কথা, কারণ নিজের চেহারা তো ও দেখতে পায় না। জলের কাছে গেলে জল সবটুকু দেখতে পায় না। জলের ভেতরের শ্যাওলা, পোকামাকড়, বালি-কাদা ঢেকে রাখে অনেকটুকু। ওর বাবা বলত, আমার মেয়েটার চোখের ভেতরে ছুরি আছে। ছুরির মতো চকচক করে।

ওর বড় ভাই নীলুয়া বলেছিল, ঠিক তোমার কুড়ালের ধারের মতো বাবা।

দীপন্ত হাসতে হাসতে বলেছিল, ওর চোখের ভেতরে অনেক চোখ আছে।

সবাই মিলে হো হো করে হেসেছিল।

ওদের বাড়িতে এমন হাসি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

একদিন ওর বাবা গুঞ্জরলাল নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় এক পাটি বুট পুড়িয়েছিল।

চন্দনা তখন বছর দশেকের বালিকা। গুঞ্জরলাল বনে বাঁশ কাটতে গিয়ে একটি ধর্ষণের ঘটনা দেখতে পেয়েছিল। কুঠোর নিয়ে রে-রে করে তাড়া করতে গেলে সৈনিকটি বুট জোড়া হাতে নিয়ে দৌড় দিয়েছিল। ছড়া পার হতে গিয়ে এক পাটি বুট জলের মধ্যে পড়ে যায়। লোকটির ফিরে দাঁড়ানোর সাহস ছিল না। ছড়ার জল থেকে জুতোটি কুঠারের হাতলে ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছিল গুঞ্জরলাল। বড় ছেলেকে বলেছিল, বন থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আন। এটাকে পোড়াব।

কেন বাবা? পোড়াবে কেন? ওই জঙ্গলে ফেলে দাও।

না, পোড়াতেই হবে।

গুঞ্জরলাল ডাবায় জোর টান দিয়ে বলেছিল।

কেন বাবা?

ঘেন্না। ঘেন্নায় পোড়াব।

লোকটাকে মার দিয়ে গাছের সাথে বেঁধে রেখে ঘেন্না দেখানো যায় না বাবা?

যায়। এই কুড়াল দিয়ে মাথাটা দু'ফাঁক করে দিতে পারি।

দাও না কেন? বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল চন্দনা।

ক্লান্ত-বিষণ্ন গুঞ্জরলালের কণ্ঠ খাদে নেমে গিয়েছিল।

বলেছিল, তাহলে গ্রামটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। মানুষদের মেরে ফেলবে। ওদের হাতে অস্ত্র আছে। আমাদের নাই।

গুঞ্জরলালের ক্রোধ চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। একজন অসহায় মানুষের আর্তনাদকে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে দেখে দশ বছরের চন্দনা ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিল। বলেছিল, বাবা আমি গাঁয়ের মানুষকে জাগিয়ে তুলব।

গুঞ্জরলাল মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেদিন বাবার কোলে বসে দাউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-দাউ আগুনের দিকে তাকিয়ে বুট পুড়তে দেখেছিল। আশপাশের চারদিকে চামড়া পোড়ার গন্ধে ভরে গিয়েছিল। ছুটে এসেছিল মানুষ, অনেক মানুষ। ওরাও রাগে-ক্ষোভে-ঘৃণায় আগুনের মধ্যে শুকনো কাঠ-পাতা গুজে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে জ্বলেছিল আগুন।

এর খেসারত দিতে মাসখানেকও সময় লাগেনি গুঞ্জরলালের পরিবারের।

মেটে আলু খুঁজতে পাহাড়ে গেলে মধ্যবয়সী বন্ধনীরানীকে গণধর্ষণ করে সৈনিকরা ফেলে রেখে যাওয়ার সময় বুটের লাথিতে ভেঙ্গে মচকে কোমরের হাড়। ছড়ার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বন্ধনীরানী।

বাঁশ কেটে বাড়ি ফেরার পরে দূর থেকে কাউকে পড়ে থাকতে দেখেও বন্ধনীরানীকে চিনতে পারেনি। গুঞ্জরলাল ভেবেছিল আবার এক পাটি বুট পোড়াতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেবেছিল এবার এক পাটি নয় দুই পাটিই পুড়বে। সঙ্গে রাইফেলটাও। কিন্তু ছড়ার ধারে এসে মাথার বাঁশের বোঝাটা কীভাবে পড়ে যায় তা টের পায় না গুঞ্জরলাল। নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় অচেতন বন্ধনীর উপর। ওর পুরো শরীরটা হাতড়ে গুঞ্জরলাল পাগলের মতো বনভূমি খোঁজে– পাহাড় এবং গাছের ফাঁকে আকাশের খোঁজও ওর মাথার ভেতরে থাকে। নিজের শৈশব এবং বর্তমানের মধ্যবয়স এক হয়ে গেলে লাল্যাগোনা গ্রামের ওপরে হাজার হাজার সেনাছাউনি গড়ে উঠতে দেখে। উলুছড়ি সেনাক্যাম্প নয় কিংবা কজইছড়ি সেনাক্যাম্প নয়। আরও চাই। বেশি বেশি ক্যাম্প চাই। শুধু সৈনিকরা থাকবে, কিন্তু কোনো মানুষ নয়, সৈনিকরা কি মানুষ? এক সময় গুঞ্জরলালের হাত থমকে যায় বন্ধনীরানীর বুকের ওপরে। তখন প্রবল স্রোতে পাহাড়ী ঢল নামে। ছড়া জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। গুঞ্জরলাল জল দেখে এবং জলের শব্দে অভিভূত হয়ে যায়, যেন যৌবনের পূর্ণ জোয়ার, ভালোবাসায় মাতাল হয়ে ওঠা, প্রথম সঙ্গমের পরে অচেনা হয়ে যাওয়া নিজের শরীরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা।

গুঞ্জরলাল কতক্ষণ স্থবির হয়ে বসে থাকে বুঝতে পারে না, শুধু মনে হয় বনভূমিতে বাতাস নেই। সূর্যটা পথ হারিয়ে দাঁড়িয়ে আছে– পাখিগুলো টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে মরে যাওয়া বৃক্ষের ডাল থেকে। আর কি ঘটছে? গুঞ্জরলাল বোবার মতো চারদিকে তাকায়। ও মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে চায়। মনে হয় দূরে কোথাও পাহাড়িরা কথা বলছে অনেকে একসঙ্গে। কিন্তু পাহাড়িরা গাছ কাটছে না, জুম চাষে যায়নি। তাঁত বোনা ছেড়ে নারীরা নদীতে লাশ খুঁজতে গেছে। প্রত্যেকের প্রিয়জন যুদ্ধে গিয়েছিল, কেই জীবিত ফেরেনি।

এতক্ষণে গুঞ্জরলাল চিৎকার করে কাঁদার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে কিন্তু কাঁদতে পারে না। ক্রোধ ওর বেদনার পথ আটকে রাখে। গুঞ্জরলাল বিপুল বিস্ময়ে বন্ধনীরানীর ক্ষতবিক্ষত স্তনের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওর ক্রোধ বনভূমির মতো বিশাল হয়ে ওঠে। ও কুঠার দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে বাঁশের বোঝা।

তারপর বন্ধনীকে কোলে করে ছড়ার জলে ভিজিয়ে দেয়– ধুয়ে যেতে থাকে ক্ষতের রক্ত, ধুয়ে যেতে থাকে শরীরে লেগে থাকা ঘাসের কুচি, ঝরাপাতার টুকরো অংশ– কিন্তু ধুয়ে যায় না দানবের থাবার চিহ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুঞ্জরলাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা কাপড়গুলো জড়ো করে ছড়ার জলে ভিজিয়ে দেয়। অনেকগুলো গাছের পাতা মুঠির মধ্যে নিয়ে বন্ধনীরানীর শরীর পরিষ্কার করতে থাকে। বারবার কৃতজ্ঞতা জানায় ঈশ্বরকে। জলের মতো এমন অসাধারণ জিনিস ছিল বলে মানুষ তার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করতে পারে। প্রার্থনার ভঙ্গিতে গুঞ্জরলাল কিছুক্ষণ পরপর নিজের মাথা জলে ডোবাতে থাকে। জলের ভেতর রেখেই বন্ধনীরানীকে কাপড় পরিয়ে দেয়। মুখের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দেয়। ফুলে ওঠা ঠোঁট জোড়ায় আঙুল বোলায়। গুঞ্জরলাল আর কী করবে ভেবে পায় না। তখন ও জলের ভেতর থেকে স্ত্রীকে টেনে তুলে ঘাড়ে করে বাড়ি নিয়ে আসে। বাড়িতে চন্দনা একা ছিল।

ও ছুটে আসে।

বাবা, মায়ের কি হয়েছে? কে মেরেছে মাকে?

বাঘে খেয়েছে তোর মাকে।

বাঘ! চন্দনা দু'চোখ কপালে তোলে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারে না। কারণ নারী-পুরুষের শরীরটরীর বোঝার বয়স ওর হয়নি। কিন্তু বাঘের কথাও ওর বিশ্বাস হয় না। ও মায়ের কাছে বসে চোখ মোছে।

বুটের লাথিতে কোমরে চোট লেগেছিল বন্ধনীরানীর। ছয় মাসের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারল না। এখনও ঠিকমতো হাঁটতে পারে না। পা টেনে টেনে হাঁটতে হয়। বন্ধনীরানী মেয়েকে কিছুই বলে নি, কিন্তু এতদিনে চন্দনা বুঝে যায় সেদিন মায়ের কি হয়েছিল।

বন্ধনীরানী মারিশ্যা বাজারে যাবে বলে তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করেছে। চকে স্নান করবে বলে গামছা নিয়ে বাইরে আসতেই দেখতে পায় চন্দনাকে।

ওমা, তুই এখনো এখানে?

আচ্ছা মা,–

কি রে কি হলো? স্নান করে খেয়ে বের হবি?

না। মা, তোমার কোমরে কি এখনো ব্যথা হয়?

হয় তো। মাঝে মাঝে ব্যথার চোটে ঘুমুতে পারি না। তোর বাবা থাকতে গরম তেল মালিশ করে দিত, এখন আর হয় না। বড় কষ্ট।

কষ্ট। কোথায় কষ্ট? গায়ে? তাহলে বাবার মৃত্যুতে?

বন্ধনীরানী মাথা নেড়ে বলে, ঘটনাটা ঘটার পর থেকে তো তোর বাবার শরীরটা ভেঙে গেল। আর আমার শরীরটা–

আকস্মিকভাবে কি বলছে বুঝতে পেরে বন্ধনীরানী দ্রুতবেগে হেঁটে চকের ধারে যায়। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডুব দিয়ে চলে যায় অনেক দূরে। চন্দনা মায়ের জন্য দাঁড়ায় না। ও উল্টোমুখে হাঁটে। শুনতে পায় বিজয় কাকার নির্বাচনী প্রচারের স্লোগান। পাহাড়ি ছেলেমেয়েরা মিছিল নিয়ে যাচ্ছে। চন্দনা মিছিলটা ধরার জন্য দৌড় দেয়।

মাঝপথে যেতেই মুখোমুখি হয় লেফটেন্যান্টের। লোকটি দু'হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে বলে, দাঁড়াও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার হুকুম নাকি?

হা-হা করে হাসে লেফটেন্যান্ট।

আমি তোমাকে ভয় পাই না।

ভয় পাবে কেন? তুমি তো আমাকে ভালোবাসো।

ভালোবাসা? ভালোবাসা বুনো শূকর। ঘোঁত ঘোঁত শব্দ।

হি-হি করে হাসে চন্দনা।

লেফটেন্যান্ট পায়ের বুট মাটির ওপর দাবিয়ে বলে, এরপর বাড়াবাড়ি করলে এই রাইফেলের মাথায় ঝুলিয়ে–।

হুঃ! চন্দনা পাশ কাটিয়ে দৌড় দেয়। আর পেছন ফিরে তাকায় না। শুধু ঘাসের ওপর বুটের শব্দ, মায়ের কোমর ব্যথা, জলের নিচে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা। ও খানিকটুকু গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। মিছিল অনেকটা পথ এগিয়ে যায়। আবার একটা ছুট দিতে শুরু করলে ডান দিকের রাস্তা থেকে আকস্মিকভাবে সামনে পড়ে সোহেল। ওকে ছুটতে দেখে মুখ ঝামটে বলে, ওই ছেড়ি–

ছেড়ি!

না তো কি?

আমি কাচালং কলেজে পড়ি। তুই?

তোর লাভ?

লাভ?

হা-হা করে হাসে সোহেল।

কুত্তা। চন্দনা পায়ের কাছে পড়ে থাকা পাথর ওঠায় মারার জন্য।

একবার ভালোবাসার কথা বল চন্দনা।

কুকুর কোথাকার! চন্দনা পাথরটা ছুঁড়ে মারে। অল্পের জন্য মাথায় লাগে না সোহেলের। পাশ দিয়ে চলে যায়। সোহেল ওর দিকে এগিয়ে আসতে গেলে চন্দনা দ্রুত আর একটি পাথর তুলে নেয়। ও মারামারি করার জন্য প্রস্তুত হয়। লাল্যাগোনা গাঁয়ের বাঙালি-পাহাড়ি সবাই জানে চন্দনা পিছিয়ে থাকার মেয়ে না। ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বেই– ও হারবে, নয় জিতবে, কিন্তু লড়াই ছেড়ে দেবে না। দু'জনের মারামারি শুরু হওয়ার আগেই দু'জনেই দেখতে পায় একদল পাহাড়ি কাঠ কেটে ফিরছে। পাহাড়িদের দেখে সোহেল গাছ-গাছালির আড়ালে চলে যায়। চন্দনা পাথরের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একজন এগিয়ে এসে খানিকটা রুক্ষ কণ্ঠে বলে, কি হয়েছে চন্দনা?

তোমার কুঠারটা দাও তো কাকা।

কি করবি?

দাও না।

বুঝেছি, কারো সঙ্গে বেধেছে তোর। চল, বাড়ি চল। বাড়িতে আজ রান্না হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকা তোমরা কি এভাবে আমার রাগ কমাবে? আমি কুত্তাটার মাথা ঠিকই ফাটাব।

আয় আমাদের সঙ্গে। মাথা ঠাণ্ডা কর।

তোমরা যাও। আমার বাড়ি ফিরতে রাত হবে।

চন্দনা কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিন লাফে বনভূমির আড়ালে হারিয়ে যায়। একজন সেদিকে তাকিয়ে বলে, মেয়েটা আমাদের ভরসা।

ওর কথা শুনলে দুঃখ ভুলে যাই রে। আমাদের হয়তো দেখা হবে না, কিন্তু আমাদের নাতিপুতিরা ঠিকই দেখবে যে এই গ্রামগুলো আবার আমাদেরই হয়েছে। আমরাই সব ভূমির মালিক।

আশার কথা বলতে বলতে পাহাড়িরা পথ হাঁটে। তাদের দুঃখের কথা আকস্মিকভাবে এমন নিজেদের কথা হয়ে বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ওরা ভাবেনি। তখন মিছিলের লোকেরা জড়ো হলে চন্দনা বলতে থাকে তার নিজের জীবন দিয়ে অর্জন করার কথা, 'যতদিন জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন নারীর মুক্তি হবে না। আজ বাঙালি শাসকশ্রেণী আমাদের শাসন করছে, কাল ক্ষমতায় গেলে পাহাড়ি বুর্জোয়া শ্রেণী শোষণ করবে।' প্রতিদিনই প্রিয় বান্ধবী কল্পনার সাথে এসবই তো আলোচনা হয়। ও কল্পনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কল্পনার বলা একটি শব্দও ভুলে যায় না। কল্পনার সাহস ওর নিজের ভেতরে জ্বলতেই থাকে। ছোটখাটো আজকের সভায় থাকে না ওর কণ্ঠ। আবার গর্জে ওঠে, কল্পনার কাছ থেকে পাওয়া কথাগুলো 'পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীরা একদিকে সরকারি সেনাবাহিনী ও স্থানীয় বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, অপহরণ, শ্লীলতাহানি ও চরম লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে তাদেরকে সামাজিক গণ্ডির জীবনযাপন ও পুরনো ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত করে রাখা হয়েছে, আসলে পাহাড়িদের আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার ব্যতীত পৃথকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীদের মুক্তি হতে পারে না। কাজেই নারীকে শোষণ-নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে হলে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে সেটা সম্ভব নয়। এ মুক্তি পুরুষ ও নারী জাতির একে-অপরের মুক্তির সাথে সম্পর্কিত। তাই নারী ও পুরুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে, আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।' আস্তে, আস্তে কণ্ঠ ধীর লয়ে স্থিত হতে থাকে। কল্পনা এই মুহূর্তে গাঁয়ে নেই। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কাজে রাঙ্গামাটি গেছে। ও কল্পনার গভীর কথাগুলো মানুষের বুকের গভীরে ছড়াতে থাকে। নিজের ভেতরে প্রবল চাপ অনুভব করে। মনে হয় কল্পনার কথাগুলো এভাবে বলতে পেরে ও বনভূমির প্রতিটি গাছের শেকড়ে এক ফোঁটা চোখের জল জমা রাখছে। এ জল দিয়ে আমরা পুরনো গাছগুলোর কাণ্ড বিশাল করব– ডালপালায় ছেয়ে যাবে বনভূমির পাহাড়, চক, সমতল আর ছোট গাছগুলো চোখের জলে বাড়তে থাকবে– বাড়তেই থাকবে, যতদিন সেনারা এখান থেকে চলে না যাবে, সেটেলারদের আসা বন্ধ না হবে, যতদিন ওরা জুমের ফসল চুরি না করবে, পার্বত্য ভূমির কাঠ কেটে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে না যাবে, যতদিন ওরা নিজেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড় সমতলে, ছড়া ঝরণায় জীবনের গান গেয়ে ভরিয়ে তুলতে না পারবে, ততদিন– ও একটুখানি থেমে চেঁচিয়ে বলে, এমন জায়গা কি পৃথিবীর কোথাও আছে যেখানে মানুষের দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত সেনা সদস্যের পাহারার নিচে পুঁতে রাখা আছে? আমরা মুক্তি চাই।

'মুক্তি চাই' বলে গর্জে ওঠে বাঘাইছড়ি উপজেলা। চন্দনার কণ্ঠ এখন আর কোনো গাঁয়ের সীমানায় আবদ্ধ নেই। চন্দনা এখন বিশাল পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সবখানে। একটু পরে বলে, আমি এখন কল্পনা চাকমা। ও আমাদের বলত, আমাদের বলা উচিত আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও। আসুন আমরা সবাই এ কথা বলি।

মায়ের সঙ্গে মারিশ্যা বাজারে যাচ্ছে চন্দনা। ওখান থেকে কলেজে যাবে। মায়ের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে ও। মা বলেছে গতকাল লেফটেন্যান্ট নুরুল হককে বাড়িতে পাঠিয়েছিল ও বাড়িতে আছে কি-না তা খোঁজ করার জন্য। নুরুল হক খুব দাপিয়েছে। বলেছে, চন্দনাকে দেখে নেব।

চন্দনা মায়ের কথায় সাড়া দেয়নি। অন্য কথা বলে।

আমার ছোটবেলায় এমন পিচঢালা পথ ছিল না মা।

হ্যাঁ, তাই। তোর বাবাকে মারিশ্যা বাজারে ধান বিক্রি করার জন্য খুব কষ্ট করে যেতে হতো। বুনো পথে হেঁটে যেত মানুষ। একবার তোর বাবাকে শেয়াল কামড়ে দিয়েছিল।

হা-হা করে হাসে চন্দনা। বলে, ভাগ্যিস ওই লেফটেন্যান্টরা ছিল না, তাহলে ওটাই কামড়ে দিত। নইলে নুরুল হক কুত্তাটা।

আহ চন্দনা আস্তে কথা বল।

কল্পনা আমাদের গলা উঁচু করে কথা বলতে শিখিয়েছে। ও আমাদের জেগে উঠতে বলে। কাল ও রাঙ্গামাটি থেকে ফিরবে। আমরা দু'জন বিজয় কাকার নির্বাচনী কাজে থাকব।

বন্ধনীরানী কথা বলে না। জিরিয়ে নেয়ার জন্য গাছের নিচে বসে। কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।

কি হলো মা? কচুপাতায় করে একটুখানি জল এনে দি?

না জল খাব না। সোজা হয়ে শুয়ে থাকলে ব্যথাটা কমবে।

বন্ধনীরানী গাছের নিচে শুয়ে পড়ে। চোখ বোজে। চন্দনা গাছের ডাল ভেঙ্গে তাকে বাতাস করে। বন্ধনীরানী ভীষণ ঘামছে। চন্দনার মনে হয় ঘামের বিন্দুগুলো বনভূমির ছোট ছোট চক– জলভরা চকে পদ্ম ফুটে আছে। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, এমন পিচঢালা পথ কি আমাদের জন্য হয়েছে মা?

বন্ধনীরানী চোখ বুজেই বলে, না।

তাহলে তুমিও ঠিক জানো যে–

আর্মি ও সেটেলারদের জন্য হয়েছে। দেখিস না আর্মির গাড়ি যখন চলে তখন পাহাড় গুমগুম করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দনার চুলগুলো বাতাসে এলোমেলো হয়ে যায়। ওর দাঁতে ঘর্ষণ ওঠে এবং প্রতিজ্ঞার শপথে বলে, আমাদের লোকগুলোকে এক করে লড়াইটা চালাতে হবে মা।

বন্ধনীরানী আকস্মিকভাবে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে। মেয়েকে দু'হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, যদি তোকে মেরে ফেলে!

মারবে। মরণকে ভয় পাই না। ভয় একটাই।

কি?

আমার মরার পরে যদি আরও হাজার হাজার চন্দনা, লালবিহারী, কালিন্দিরা না উঠে দাঁড়ায়–

দাঁড়াবে, দেখিস দাঁড়াবে।

চন্দনা মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গাছের নিচে বসে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ওর বুকে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাসগুলো উড়ে যেতে থাকে। ওর মনে হয় চামড়া পোড়ার গন্ধ আসছে। প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনায় বুট জুতা পুড়ছে।

আগামীকাল নির্বাচন। প্রচার কাজ শেষ করতে করতে বেশ রাত হয়ে যায়। দুই কিলোমিটার পথ পেরিয়ে নিজের বাড়ি যেতে হবে। সুপর্ণা বলে, আজ বাড়ি না ফিরে আমাদের বাড়িতে থাক।

না, মায়ের কাছে ফিরব। সে যত রাতই হোক।

একা যাবি?

একাই তো। কাকে আর সঙ্গে নেব, কাউকে ভালোবাসার কথা বলারই তো সময় হলো না।

তখন বয়স্করা অনেকেই বলে, সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে কবে। রাতে ফিরিস না। কাল তো আবার আসতে হবে। নির্বাচনী কেন্দ্রে কাজ করবি না?

সবই করব কাকা।

সে দিনের বক্তৃতার পর থেকে ওরা তোর ওপর নজর রাখছে। ভিডিপি কমান্ডার নুরুল হকটা চামচাগিরিতে সেরা।

ওই কুকুরটাকে আমি কুকুর দিয়ে খাওয়াব। দেখো ঠিকই পারব।

আজ রাতে আর পথে নামিস না মা।

পথই আমার আপন। পথের কোন গাছটা, কোন পোকাটা আমাকে না চেনে!

হাসতে হাসতে অন্ধকার পথে নামে চন্দনা।

একবার মনে হয় দৌড় দেবে– ভীষণ লম্বা একটা দৌড়। ইচ্ছে হয় এক দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে যেতে। পরক্ষণে মনে হয়, না দৌড়ে যাবে না। আস্তে আস্তে হেঁটে যাবে। বনভূমিতে প্রতিটি পদক্ষেপ গুনে গুনে যাবে। এই বনভূমির প্রতিটি জায়গা ওর। গাছের ফাঁকে চাঁদটা দেখা যায় না ঠিকমতো। ফাঁকা সমতলে পূর্ণিমার চাঁদ বিশাল হয়ে আকাশের গায়ে আটকে থাকে। চন্দনা থমকে দাঁড়ায়। বলে, চন্দনা তুমি আমার সঙ্গে এসো। রাতটা তোমার সঙ্গে গল্প করে কাটাব। আজ রাতে মোটেই ঘুম আসবে না। না আসুক, তুমি আমার সঙ্গে থাকো চন্দনা। চন্দনা আবার হাঁটতে থাকে। পাহাড়ের মাঝে সরু পথ শুরু হয়েছে। দু'পাশে প্রবল ঝিঁঝির ডাক। চন্দনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটতে হাঁটতে বলে, তোরাও আমার সঙ্গে বাড়ি আয় ঝিঁঝি পোকা। চুটিয়ে গল্প করব। মেলা কথা আছে তোদের সঙ্গে। দূরে ঝরণার জল পড়ার শব্দ আসছে। ভালো লাগছে শুনতে। চন্দনা একছুট দেয়। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে, এই বনভূমি আমাদের। আমাদের পূর্বপুরুষরা এই বনের মধ্যে বসতি গেড়েছিল। আমরাই তো বনভূমিকে আবাসযোগ্য করেছিলাম। এখন আমাদের উৎখাত করে অন্যরা দখল করবে কেন? ওরা কি জানে না একদিন আমাদের আগের জীবনের নারী ও পুরুষরা বনভূমির গাছগুলোর পরিচর্যা করেছিল! প্রতিটি গাছের শিকড়ে ছোঁয়া লেগে আছে আমাদের নারীদের। সে শিকড়গুলো এখন শক্ত করে টেনে রেখেছে মাটি। পাহাড়ের মাথাগুলোয় জমে থাকা কুয়াশা আমাদের মানুষেরা গায়ে মেখে জুম চাষ করেছে। কুয়াশার কুমারী স্পর্শ মানুষদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, বনভূমিকে বাসযোগ্য করার স্বপ্ন। আমাদের ঝরণাগুলো গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়েছে পাহাড়ের মানুষদের। পার্বত্যভূমির প্রতিটি ঘাস, পোকা, বুনোফুল, পাখি-পশু, টংঘর, মাচাঘর, কেয়াং এবং ভূমির প্রতিটি ইঞ্চি আমাদের। আর কারো নয়। সবাইকে তাড়াতে হবে এই ভূমি থেকে। ওদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েই ওদেরকে বোঝাতে হবে তোমাদের মরণ আমাদের হাতে। এ কাজটুকু হলেই আমি দেবব্রতকে বলব, এখন সময় হয়েছে তোমাকে ভালোবাসার কথা বলার।

ও হেসে বলবে, সত্যি?

আমি বলব, চলো ঝরণার জলে স্নান করে দু'জনে হেঁটে যাব কেয়াংয়ে। বলব পুরোহিতকে, আমরা এসেছি।

দেবব্রত হাসতে হাসতে বলবে, পুরোহিত জিজ্ঞেস করবে, কেন এসেছ? আমি বলব, বলব না। আমাদের মুখ দেখেই তিনি বুঝে যাবেন যে আমরা তাকে প্রণাম করতে গিয়েছি।

উহ, কি আনন্দ! চন্দনা একছুটে দৌড়ে গিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় দাঁড়ায়। বন্ধনীরানী মেয়ের জন্য বাইরেই বসে ছিল। চন্দনা মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা আমি এসেছি।

আয়, ঘরে আয়। ভাত খাবি।

না, মা। এখন আর খাব না। অনেক কাপ চা খেয়েছি।

শুয়ে পড়বি?

না, লিখব।

ডায়রি?

হ্যাঁ মা।

বন্ধনীরানী ঘুমুতে যায়। ঘুম আসে না বন্ধনীরানীর। কোমরের ব্যথা বেড়েছে। ব্যথা বাড়লেই সেদিনের ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বন্ধনীরানী সেই ঘটনা মনে করতে চায় না। বুকের দরজাটা পাথর দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে। মেয়েটার দিকে তাকালে বুঝতে পারে ও কীভাবে তৈরি হচ্ছে– একরোখা, সাহসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের জাতিগোষ্ঠীর জন্য ওর বুক ফেটে যায়। বন্ধনীরানী নিজেও তখন সাহস ফিরে পায়। মেয়েটার পাশে থাকতে ভালো লাগে। আস্তে আস্তে ঘুম নামে তার চোখে। বিড়বিড় করে বলে, বনভূমির রাত বড় সুন্দর। সুন্দর রাত বাড়ে।

চন্দনা ডায়রি লেখা বন্ধ করে। হাই তোলে। আড়মুড়ি ভাঙে। ঘুম পাচ্ছে না। কাল বিজয় কাকাকে জেতাতে হবে। বিজয় কাকা নির্বাচনে জিতলে ওদের কথা বলার মানুষ হবে। কিসের যেন শব্দ। চন্দনা কান পাতে। মানুষের পায়ের শব্দ। ভুরু কোঁচকায়। শুধু পায়ের শব্দ নয়, বুটের শব্দ শোনা যায়।

লেফটেন্যান্ট কি? চন্দনা ঘরের চারদিকে তাকায়। হারিকেনের আলোয় ঘরে আলো-আঁধারি। ঘুমিয়ে আছে মা, ভাই, ভাইয়ের বউ। চন্দনার গা ছমছম করে না। ও দাঁত কিড়মিড় করে বলে, ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা, এই বনভূমি আমার।

তখন দরজা ভেঙ্গে ঢোকে ওরা। দশ থেকে বারো জন। ঘরের ভেতরে টর্চের আলো ফেললে ও দেখতে পায় পরিচিত মানুষদের। ভিডিপি কমান্ডারও আছে। চন্দনা চিৎকার করে বলে, খবরদার এগোবি না। হা-হা করে হাসে নুরুল হক। লেফটেন্যান্ট রাইফেলটা তাক করে ধরে বলে, এইটার নলের মাথায় বেঁধে তোকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাব।

আয় দেখি! চন্দনা যে চেয়ারটায় বসে এতক্ষণ লিখেছে সেই চেয়ারটা তুলে ধরার চেষ্টা করতেই অন্যরা এগিয়ে এসে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ফেলে। মুখও বাঁধে। আর চিৎকার করতে পারে না। হাত ধরে আছে দু'জনে। রাইফেলের নলের ডগায় নয়, ওরা ওকে শূন্যে তুলে বেরিয়ে যায়।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ওর চারপাশে মানুষের কণ্ঠের জান্তব উল্লাস। ওর মনে হয় বনভূমির চারদিক থেকে বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে। ক্রমাগত এগুচ্ছে। বুটের শব্দের নিচে থেঁতলাচ্ছে বনভূমি। ওর নিঃশ্বাস দ্রুত হয়। ও বুঝে যায় বনভূমির বৃক্ষরাজি, প্রাণীকুল এবং ম্রিয়মান মানুষেরা এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে মৃতপ্রায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিজ ফায়ার

তাহেরুন মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কি কচ্ছেন বীরপত্তিক নূরুদ্দিন? ভাত খাবেন এলা?

কি রান্ধিছো?

লাফা শাক রান্ধিনু আর শীদলের ভর্তা বানানু।

মুই এলা ভাত খামো। ভাত দে।

ভাত খাওয়ার চিন্তায় নূরুদ্দিনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, শিশুর মতো সরল হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়– এই মুহূর্তে যারা ওকে দেখে তারা হিসাব মেলাতে পারে না যে এই লোকটি মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিল। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে মানুষের চোখের সামনে বিস্ময়ের মানুষ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ও বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছিল। তখন গাঁয়ের লোকে ওকে ডাকত বীরপত্তিক নূরুদ্দিন, এখন আর কেউ সেই গৌরব নিয়ে ডাকে না, শুধু তাহেরুন ভোলে না, মাঝে মাঝে এই নামে ডেকে ওকে সেই সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। গভীর সুখের অনুভবে ওর বুক ভরে যায়। মনে করে এটাই ওর সঞ্চয়, গরিব মানুষের টাকা-পয়সার সঞ্চয় থাকে না, তাতে কি, এই স্মৃতিই ওর টাকা-পয়সার সঞ্চয়। অনেক মূল্যবান, কোনো চোরই চুরি করতে পারবে না।

তখন তাহেরুন সানকি বোঝাই ভাত নিয়ে আসে। ভাতের ওপরে লাফা শাকের ঝোল আর শীদলের ভর্তা। গরম ভাত দেখে জিভে পানি আসে নূরুদ্দিনের। এত যে ক্ষিদে লেগেছে ভাত দেখার আগে তা বোঝেনি, মাঝে মাঝে তো পেটের ক্ষিদেকে নুড়ি পাথরের নিচে চাপা দেয়, অভিমানভরা কণ্ঠে নিজেকে বলে, মুই তো দুই টাকার মজুর, মোর ভোখ লাগবে ক্যান? এখন তাহেরুনের হাত থেকে সানকিটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিতে নিতে বলে, তোর সানকি লি-আয়, মোর সাথে ভাত খা।

তাহেরুন নিজের সানকিতে ভাত বেড়েছিল, সেটা চুলোর পাড় থেকে নিয়ে আসে। পাতিল খালি, দু'জনের পেট ভরবে এমন অনুমান করেই রান্না করে ও। ওর হিসেবের মাপ একদম ঠিক, একটুও এদিক-ওদিক হয় না। নূরুদ্দিন বউয়ের এই দক্ষতায় মুগ্ধ। বলে, তুই ক্যাংকু করলু এডা? তাহেরুন নূরুদ্দিনের এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ও জানে পুরুষ মানুষের এসব বোঝার সাধ্য নেই, কোথাও কোথাও ওদের বোঝার ঘাটতি আছে সেটা ওরা স্বীকার করতে চায় না। তাই ও প্রসঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এড়িয়ে চুপ করে থাকে। তবে ও নূরুদ্দিনের সঙ্গে বসে ভাত খেতে ভালোবাসে। ওর মা-খালারা স্বামীর খাওয়া শেষ হলে ভাত খেত। এমন ব্যবস্থা ও ভাবতেই পারে না। খেতে খেতে দু'জনের যে কত কথা হয়, হাসাহাসি হয় এটা ও কখন পেত? সময় কোথায়? সারাদিন চলে যায় পথের ধারে বসে কাজ করে, ঘরে ফিরে থাকে রান্নাবাড়ি, লেপাপোছা, ধোয়ামোছাসহ কত কাজ! তাই ভাত খাওয়ার সময়টি ওদের দু'জনের বিনোদনের সময়। খানিকটুকু আনন্দ।

সানকি নিয়ে বসতে বসতে তাহেরুন দেখতে পায় বীরপ্রতীক নূরুদ্দিনের ঘাড়টা নুয়ে পড়েছে, হাত ডুব গেছে ভাতে, কারণ নূরুদ্দিন গরম ভাতে পানি ঢেলে দিয়েছে। লোকটি এমন করে খেতে মাঝে মাঝে ভালোবাসে, যখন মেজাজ ভালো থাকে ঠিক তখন। কারণ তখনই ও বুঝতে পারে যে ও দু'টাকার মজুর এবং মজুরের কপালে পান্তাভাত ছাড়া অতিরিক্ত আর কি জুটবে? স্বামীর এমন ধারণার কথা জানে তাহেরুন এবং মনে করে নূরুদ্দিনের এই ধারণাটি ঠিক। যে মানুষ সাহস নিয়ে যুদ্ধ করে, যার সাহসের জন্য বীরপ্রতীক খেতাব জোটে সে তো সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। তার ভুল হবে কেন? সে ভুল করতেই পারে না। এই মুহূর্তে তাহেরুন নূরুদ্দিনের সানকির দিকে তাকিয়ে বলে, মুইও পান্তাভাত খামো।

খা। নূরুদ্দিন মাথা না তুলেই বলে। ও বেশি কথা বলতে পারে না। মুখভর্তি ভাতের দলা ও দাঁতের নিচে ফেলে চাবায়।

তাহেরুন নিজের সানকিতে পানি ঢেলে দিলে গরম ভাত গবগব শব্দ করে এবং ধোঁয়া ওঠে। বেশ লাগে দেখতে, দু'জনে সেদিক তাকায়। তাহেরুন খিলখিল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বলে, মোর সানকিডা নদী হইছে। ডাহুক নদী।

নূরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, ও নিজেও হাসতে থাকে, এখন ওর মুখ-গহ্বর শূন্য, ভাতের দলা পেটে চলে গেছে। তাহেরুনের সঙ্গে নিজেও গলা ছেড়ে হাসে, হাসির তরঙ্গ বাড়ির আঙ্গিনায় ছড়ালে নূরুদ্দিন বলে, তোর ভাত গুটিক য্যান নুড়ি পাথর।

নুড়িপাথর! মোরা পাথরের মানুষ।

স্তব্ধ হয়ে যায় দু'জনের দৃষ্টির ভাষা। সত্যি কি ওরা পাথরের মানুষ? দু'জনের মাথা নেমে আসে ভাতের সানকির ওপর। ওরা গপগপিয়ে ভাত খায়, শীদলের ভর্তা খুঁটে খায় আর লাফা শাক দিয়ে ভাত মাখায়, সানকির পানিতে ভেসে থাকে শাকের কুচি, যেন বিলের শাপলার মতো লাফা শাকের কুচি ওদের দেখে একটি সুন্দর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছে– বলছে, তোমরা পাথর হওয়ার দুঃখ ভুলে যাও। তোমাদের কোনো বেদনা নেই।

নূরুদ্দিন বাম হাত দিয়ে চোখের পানি মোছে। তাহেরুনও। দু'জনের কেউই আজ মজুরি পায়নি। ভাটিয়া বলেছে, এ সপ্তাহের মজুরি দিতে পারবে না।

কীভাবে বীরপ্রতীকের সামনে ভরা সানকি এগিয়ে দেবে তাহেরুন? তাই ওকে চোখের পানি মুছতে হয়। আর একটু একটু করে অনেকটা সময় নিয়ে ভাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খায়। নূরুদ্দিনও ভাবে দু'কেজি চাল হাতে ধরিয়ে না দিয়ে কেমন করে বউকে বলবে, মোক ভাত দে মনার মা। মোর ভোক নাগিছে।

ভাত দেওয়া কি সহজ কথা? ভাতের কথা ভাবলে তো দু'জনের পিলে চমকে ওঠে। কি সাংঘাতিক কথা, কি কঠিন কাজ, দু'মুঠো ভাতের হিসাব মেলাতে মেলাতে বেলা শেষ হয়ে যায়। আর দু'মুঠো ভাতের জন্য ওরা তেঁতুলিয়া-বাংলাবন্দ সড়কের ধারে বসে নুড়িপাথরের গা থেকে বালুকণা পরিষ্কার করে পাথরের স্তূপ বানায়– ডাহুক নদী থেকে পাথর সংগ্রহ করে অন্যরা, জোয়ান ছেলেরা কিংবা তার চেয়েও ছোটরা– মহানন্দা নদী বয়ে আনে হাজার হাজার নুড়িপাথর, ঢেলে দেয় ডাহুকে, দুই নদীতে জমে আছে কতদিনের ভালোবাসা, যে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের এক জীবনের ক্ষতিপূরণ হয় না, আরও লাগে, আরও। উদাস হয়ে যায় নূরুদ্দিন। একটিমাত্র মেয়ে ওদের, শ্বশুরবাড়িতে আছে, বছরখানেক দেখা হয়নি মেয়েটিকে। মেয়েটি আসতে পারেনি, ওরাও যেতে পারেনি। কি আর হবে এইসব আসা-যাওয়ায়, গরিব মানুষের জীবনে এতকিছু কি মানায়? ভাবতেই তাহেরুন উদাস হয়ে যায়। তারপর ভাতের শেষ লোকমাটা মুখে পুরে বলে, ভেলা দিন থাকে বেটিটারে দেখিনি–

চল দেখবার যামো।

নূরুদ্দিনের চোখে ঝিলিক উঠে সেটা মুহূর্তে দপ করে নিভে যায়। বিলাসিতা, মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া এই মুহূর্তে বিলাসিতা, ভেবে লাভ নেই, মেয়েকে দেখার ইচ্ছা এই মুহূর্তে শিকায় উঠিয়ে রাখাই ভালো। ভালোবাসার মাটির হাঁড়িটা থাক না শিকায় ভরা, নামানোর দরকার কি? দু'জনে খাওয়া শেষ করে।

আসলে দু'জনে গতকালের ঘটনাটা ভুলতে চেষ্টা করছে। দু'জনের বুকের ভেতরে আগুন– দুঃখের এবং ক্রোধের। কিন্তু কেউই কাউকে কোনো কিছু বুঝতে দেয় না, কেবলই অন্য প্রসঙ্গ খোঁজে। বিয়ের পরে তাহেরুন ভীষণ গৌরবে নূরুদ্দিনের বীরপ্রতীক শব্দটি ধরেও রেখেছে নিজের ভেতর, এ গাঁয়ে আর কারও নামের সঙ্গে এ শব্দটি নেই। ও ভাবে স্বামী এবং সংসার পাওয়ার সঙ্গে এই শব্দটি ওর বাড়তি পাওয়া, গরিব মানুষের ধন। নিজের ভিটেয় ঘুমুনোর যে আনন্দ, এটাও তেমনি। জমি-জিরাত সব গিয়ে দু'টাকার মজুর হয়েছে তো কি হয়েছে, এই শব্দটা তো আছে। এ নিয়ে ওদের দুঃখ নেই।

বরং দু'জনে কাজের অবসরে হাঁ করে কাঞ্চনজঙ্ঘাচূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে, অনেক দূরের পাহাড়, কিন্তু স্থানটি চমৎকার, রোদ ঝলমলে দিনে পাহাড়ের চূড়াটি ঝকমক করে, অস্পষ্ট কুয়াশার পাতলা আবরণের ফাঁকে জমাট বরফ যেন অদৃশ্য দৃশ্যকে ঘনীভূত করার চেষ্টায় ওদের সামনে হাজির হয়। ওরা দু'জনে এমন সুন্দর দৃশ্যে দূরের হাতছানি দারুণ উপভোগ করে। ভাবে, ওদের জীবনে নদী আছে, পাহাড় আছে, নুড়িপাথরের স্তূপ আছে। জমি-জিরাত ভাটিয়ার কাছে বেচতে হয়েছে তো কি হয়েছে, বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করার স্মৃতি আছে। এখনও বুকভরা সাহস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। দরকার হলে আবারও লড়তে পারবে। দু'টাকার মজুর হয়েছে তো কি হয়েছে, লড়ার সাহস তো ফুরিয়ে যায়নি।

আসলে দু'জনে গতকালের ঘটনাটা ভুলতে চাইছে।

তাহেরুন সানকি নিয়ে উঠতে উঠতে বলে, তোমরা পানি খাবা?

খামো, এক ঘুরি দে।

তাহেরুন নিজের সানকি ধুয়ে কলসি থেকে পানি ঢেলে আনে। নূরুদ্দিন সানকি থেকে পানি অর্ধেক খেয়ে বাকিটার ভেতরে হাত ধুয়ে নেয়। লুঙ্গিতে মুছে ফেলে ভেজা হাত এবং মুখও। এখন কি করবে নূরুদ্দিন? সামনে কোনো কাজ নেই। ঘুম ছাড়া কিছু করার নেই, কিছু করার না থাকলে ভীষণ অসহায় মনে হয় নিজেকে। ও একটা বিড়ি ধরায়। তাহেরুন চুলোর ধারে গেছে, কাজ সারতে সারতে ও গুনগুনিয়ে গান গায়, ওর প্রিয় অভ্যাস। নূরুদ্দিন বিড়িতে টান দিয়ে কান খাড়া করে, বেশ মজা, ও একটা কাজ পেয়েছে, মনোযোগ দিয়ে গান শোনা এখনকার কাজ। কে বলেছে কাজ নেই! কত কাজ যে চারপাশে থাকে, শুধু খুঁজে নেওয়া মাত্র। নূরুদ্দিন উঠোনে নেমে দাঁড়ায়।

কাজ তো ওকে খুঁজতে হয়েছে, জীবন বাঁচানোর কাজ। যুদ্ধ করে ফিরে এসে হাজার রকম কাজ করেই তো বেঁচে থাকল এতটা জীবন। শুনতে পায় তাহেরুনের গলা চড়ছে, বেশ লাগছে গলার টানের সঙ্গে সুরের আবহ, মনে হয় বাড়িটায় যেন সেই পাহাড়ের চূড়ার দেখা ঝলমলে দৃশ্যটি ভর করেছে, এক সময় বুক সমান পানিতে দাঁড়িয়ে যে নদীর তল থেকে ও নুড়িপাথর তোলার কাজ শুরু করেছিল, ততদিনে বাঁচার তাড়নায় জমিটুকু বিক্রি করে দিতে হয়েছিল, এখন ওর বাড়িতে পাথর তোলা মানুষের দল নিয়ে পুরো নদীটা ওর বাড়িতে ভর করে।

নূরুদ্দিনের মনে হয় ওর মাথায় আকাল নেমে এসেছে, এই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে তাহেরুন ছাড়া আর কেউ নেই। চারদিকে তারার আলো, সে আলোতে তাহেরুনের সুরেলা কণ্ঠ আরও মায়াবী হয়ে ওঠে। ও তখন বুঝতে পারে একজন মুক্তিযোদ্ধার জন্য ওর এতো গর্ব কেন, কেন অন্যরা ভুলে গেলেও ও ভুলতে পারে না নূরুদ্দিনের বীরপ্রতীক হওয়ার অহংকার। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নূরুদ্দিন বিড়িতে জোর টান দেয়, তার ভেতরটা উথলে ওঠে মহানন্দার মতো, ও আকাশ ছুঁতে পারে এবং তারা কুড়িয়ে নিয়ে তাহেরুনের জন্য মালা গাঁথতে পারে।

কাজ শেষ করে তাহেরুন ওর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, এলা কি তুমরা নিন্দাবে?

না। নূরুদ্দিন সজোরে মাথা নাড়ে। ওর ঘুম পায়নি। আজ রাতে ওর ঘুমুনো হবে না।

তাহেরুন বলে, মুইও এলা নিন্দামনি।

চল হামরা আঙ্গিনাত বসি।

তাহেরুন ঘর থেকে তিন-চারটা চটের বস্তা এনে উঠোনে বিছিয়ে দেয়। নূরুদ্দিন লুঙ্গি গুছিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। তাহেরুন ওর পিঠের ঘামাচি খুঁটে দিতে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুক ভরে বিড়ির গন্ধ টানে। এককালে ও নিজেও প্রচুর বিড়ি খেত। মনার বিয়ের সময় হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়েছে। বিড়ি টানাটা খুব কাজের কাজ মনে হয় না। এখন নূরুদ্দিনকেও নিবৃত করার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। লোকটা বিড়ির নেশায় পাগল। একটা শেষ হলে সে আগুনেই আর একটা ধরায়। তাহেরুন বোঝে যে লোকটা এক প্যাকেট বিড়ি আজ রাতেই শেষ করবে।

আসলে দু'জনে গতকালের ঘটনাটা ভুলতে চাইছে।

এক সময় তাহেরুন ওর পিঠের ওপর নিজের মাথাটা ফেলে দিয়ে ডাকে, বীরপত্তিক।

নূরুদ্দিন বিড়ির ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে বলে, কতদিন আগত যুদ্ধ হয়েছিল তোর মনত আছে?

তাহেরুন হিসেব না করে তুখোড় স্মৃতির ক্ষিপ্রতায় বলে, সাতাইশ বছর। নূরুদ্দিন হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে কাশি ওঠে। কাশতে কাশতে বলে, ভাটিয়া মুক যুদ্ধের কথা ভুলে যাবার কয়।

তাহেরুন নূরুদ্দিনের শোকে মুখ থুবড়ে পড়ে না। ভুলে যেতে বললে তো ভুলে যাওয়া যাবে না। যুদ্ধ অত ছোট জিনিস নয়। তাহেরুন নূরুদ্দিনের বলাটা গায়ে মাখে না। নূরুদ্দিন আকস্মিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে বলে, চল নদীর ডাঙ্গাত যাই।

তাহেরুন সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়। সন্ধ্যা রাতে নদীর ধারে গেলে শরীর জুড়োবে। বিয়ের পরে ওরা এমন করে অনেক রাতে বাড়ির বাইরে চলে যেত। তখন নূরুদ্দিনের বয়স ছিল ছাব্বিশ, ওর আঠার।

তারপরের দিনগুলো খুব দ্রুত পাল্টেছে।

যুদ্ধ করে ফিরে এসে পেয়েছিল ধু ধু ভিটে। কাউকে কিছু না বলে যুদ্ধে চলে গেলেও রাজাকাররা ঠিকই বুঝেছিল এবং পাক আর্মির কানে উঠেছিল ওর যোদ্ধা হওয়ার খবর। আর্মি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে ভিটে, বাবা-মা ও ছোট চার ভাইবোনকে ডাহুক নদীর তীরে নিয়ে গুলি করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষে ফিরে এসে প্রথমে শূন্য ভিটেয় দাঁড়িয়ে কাঁদেনি নূরুদ্দিন। দেখেছিল চারদিক খোলা, আশপাশের ঘরগুলো নেই, যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে। সেদিন মানুষ চোখে পড়েনি নূরুদ্দিনের, চোখে পড়েছিল দূর পাহাড়ের ঝলমলে চূড়া। দেখে থ হয়ে গিয়েছিল ও, আশ্চর্য, এমন করে কোনোদিন ওই পাহাড়ের চূড়া দেখা হয়নি। সেদিন ও বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতার সত্য এমন, অনেককে হারাতে হয়।

এদিকে মানুষের ভিড় জমে ওর শূন্য ভিটায়। তেঁতুলিয়ার ধামনগর তিরনইহাঁটের মুক্তিযোদ্ধা নূরুদ্দিনকে আশপাশের গাঁ থেকে দেখতে আসে মানুষ। ওদের অন্তহীন কৌতূহলী প্রশ্ন। প্রশ্নের শেষ নেই। নারী-পুরুষ ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলায়, ছোটরা বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু নূরুদ্দিনের মাথায় ঘূর্ণি, নদীটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝি ওর মাথায় ঢুকেছে, নাকি পাথুরে জমি, যে জমি চাষ করতে করতে ওর বাবা জীবনীশক্তি ক্ষয় করেছিল। ওর মনে হলো পরিবারের সবার মুখ মনে করতে ওর পাথুরে জমির কথাই মনে হয়েছিল। জমি তো কথা বলে না, কিন্তু জমি ধারণ করে, মানুষের দুঃখ-বেদনা-কষ্ট এবং আনন্দকেও। নূরুদ্দিন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে। একজন এসে মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে দেয়।

একজন প্রশ্ন করে ক্যাংকু করা যুদ্ধ করলু।

ও ছোটদের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে, মৃদু হাসি। কেমন করে যুদ্ধ করলো সে কথা কি বলা যায়। যায় না। বলতে গেলে ভুল হতে থাকবে। নূরুদ্দিন মাথা নিচু করে চুপ করে থাকে। খোলা মাঠের উপর দিকে দূরের দিকে তাকায়। কেমন করে জীবনের চারদিক ঘিরে থাকা বেড়াটা উড়ে গেল।

আবার প্রশ্ন।

তুই কয়জন পাকসেনা খুন করলু?

তোর ভয় করেনি?

হামারা মাঝে মাঝে তোর কথা ভাবিছি।

ওহ রে তোর বাপ একডা সোনার মানুষ ছিল।

তোর মাও ভালো মানুষ ছিল।

এলা হামরা তোর তানে তামাম করিম।

কাল তোক হামরা একডা ঘর উঠায়ে দিম।

আইজ রাইতত তুই হামার এইঠে ভাত খাবু। ভাত খায়ে এইঠে নিন্দাবি, বিহানে উইটে যাস।

তুই কাইল নতুন ঘরত নিন্দাবি।

মোর ঘরত চল ভাত খাবু।

নূরুদ্দিন কারও প্রশ্নের জবাব দেয় না। শুধু বলে, তার বাপের একটা শ্যালো মেশিনের শখ ছিল। বাপ চাইছিল মেশিন দিয়া ক্ষেতে পানি দিবে। ধান ফলাবে। ও বাবা গো–

এতক্ষণে চিৎকার করে কাঁদে নূরুদ্দিন। ওর কান্নায় মানুষজন আরও ঘন হয়ে আসে ওর চারপাশে। ওর দম আটকে আসে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ও নিজের মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে রেখে শরীরে নুড়িপাথরের অস্তিত্ব অনুভব করে, ওকে এমন পাথুরে হতে হবে– শক্ত, কঠিন এবং নিরেট।

তারপরের দিনগুলো দ্রুত পাল্টাতে থাকে নূরুদ্দিনের।

গ্রামের সবাই মিলে ঘর তুলে দেয় ওকে। তাহেরুনের সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করে। ওর মনে হয় দ্রুত অনেককিছু ঘটে যাচ্ছে। উপার্জনের কি ব্যবস্থা হবে ভাবতেই তাহেরুন চোখ বড় করে মাথা নাড়িয়ে বলে, ক্যানে জমি চাষ কর।

নূরুদ্দিন চুপ করে থাকে। ও জানে এখানকার পাথুরে জমি একফসলী। শুধু আমন ধানের আবাদ হয়। বোরো হয় না। বোরো চাষের জন্য সেচের ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা লাগে, কিন্তু শ্যালো মেশিন ছাড়া সেচের ব্যবস্থা হবে না। একফসল দিয়েই কি সংসার চলবে? সামনে তো ঘরে নতুন মানুষ আসবে। তখন কি হবে? সন্তানের কথা ভাবতেই ওর মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়।

তাহেরুন কৌতুহলী হয়ে বলে, তোমরা হাসেন ক্যানে?

এমনি।

কিসের তরে হাসছেন কহেন?

তাহেরুনের জোর দাবি শুনে নূরুদ্দিন হো-হো করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তোর কোলে ছাওয়াল হবে। এতানে মোর খুশি লাগছে।

তাহেরুন গভীর আনন্দে ওকে জড়িয়ে ধরে। নূরুদ্দিনের মনে হয় যুদ্ধ করা মানুষের এমন আনন্দ প্রাপ্য হয় যার কথা ভাবলে জমি অল্প খুঁড়লে যে পাথরের স্তর পাওয়া যায় সেটা আর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজটা করতে ইচ্ছে হয়। তাহেরুন বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে বলে, মুই ছাওয়াল পিঠত লয়ে ধানের বিচন ওকড়াম। ওরা গাড়িব। মোর খুশি লাগতাছে। মোর ছাওয়াল নয়া চালের ভাতে খাবে।

এসব কথা শেষে প্রাণ জড়াজড়িতে দু'জনের ঘরে আলো ঢোকে। নূরুদ্দিনের জীবনের হিসেবে ভুল হবে না বলে ধারণা হয়।

কিন্তু ইচ্ছেমাফিক জীবন চালানো আর হয়ে ওঠে না নূরুদ্দিনের। তাহেরুনের কোল জুড়ে সন্তান আসে ঠিকই কিন্তু একফসলী আবাদে জীবন চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। জমি চাষের স্বপ্ন ভুলে ও ডাহুক নদীতে এক বুক সমান পানির নিচ থেকে পাথর ওঠানোর কাজ শুরু করে। লোহার শিক দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নদীর নিচে কোথায় পাথর আছে তা খুঁজে বের করে বেলচা দিয়ে পাথর ছেঁকে তুলে টুকরি ভরে মাথায় করে ডাঙ্গায় ফেলে।

নুড়িপাথরের স্তূপ জমে ওঠে ডাঙ্গায়– বিভিন্ন ছোট বড় আকারের স্তূপ নদীর পাড়ে পাহাড়ের দৃশ্য তৈরি করে। নূরুদ্দিন এভাবে পাহাড় চিনতে শুরু করে, নিজেদের তৈরি করা পাহাড়, কিন্তু মালিক ওরা নয়। ভাটিয়া মহাজনেরা সে পাহাড় কেনে। আর একদল লোক চালুনি দিয়ে সে পাথরের গা থেকে বালি পরিষ্কার করে। আকার অনুযায়ী ভাগ করা হয় পাথর– বড়, মাঝারী, ছোট– কি সুন্দর দেখতে! কখনও আকার দৃষ্টি কাড়ে, কখনও রং, কখনও সবটা মিলিয়ে সব। পিঠে বাচ্চ বেঁধে রেখে পাথর ভাঙ্গার কাজ করে তাহেরুন।

ফসলের স্বপ্ন ও আর দেখে না। জমি-জিরাত যেটুকু ছিল সংসারে মুখ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু বেঁচে খেতে হয়েছে, এখন বাকি ভিটেটুকু। ক্লান্ত তাহেরুন কাজের ফাঁকে গাছতলায় গিয়ে বসে। নূরুদ্দিনও পাশে এসে বসলে ও বিষণ্ন হাসি দেখে বলে, বীরপত্তিক, মুই পানি খামো।

নূরুদ্দিন ওকে নদী থেকে পানি এনে দেয়। ঢকঢক করে পানি খায় তাহেরুন। ওর বুকটা তৃষ্ণায় বুঝি পাথুরে জমি হয়ে গেছে, পাথুরে জমি তো এক মুহূর্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব পানি শুষে ফেলে। জীবনটা কেমন করে যেন কেমন হয়ে গেল, তবু বিভ্রান্ত হয় না নূরুদ্দিন, ভাবে নিচের পাথরের চেয়ে নদীর পাথর অনেক সুন্দর, তবু তো পাথর তোলার কাজ পেয়ে ও নিজে গ্রামে থেকে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। নইলে দিনমজুর হয়ে শ্রম বিক্রির জন্য যেতে হতো অন্য কোথাও। নিজগ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চায় না নূরুদ্দিন। মনে হয় তাহলে স্বাধীনতার স্বপ্ন অস্পষ্ট হতে থাকবে, যে যুদ্ধটা করেছে তার অনুভব এই পাথুরে জমিতে দাঁড়িয়েই ও বুকের ভেতরে রাখতে চায়– এই নদী, মাঠ-প্রান্তর, পথঘাট এবং মানুষের ঢল ওর সামনে দৃশ্যমান থাকে আপনজনের মতো, যা ও জন্মের পর থেকে দেখেছে, যার মাঝে ওর বাবা-মায়ের ঘরগেরস্থি ছিল, সেটা স্বাধীনতার জন্য দান করতে হয়েছে। এই অমূল্যের বাইরে গিয়ে উদ্বাস্তু হতে চায় না। উদ্বাস্তু হওয়া মানুষকে ও ঘৃণা করে।

ভাটিয়া মহাজন যারা অন্য জেলা থেকে এসে এখানে পানির দরে জমি কিনেছে তারা ওর দু'চোখের বিষ। ওরাও উদ্বাস্তু। নিজের ঠাঁই খেয়ে ফেলে অন্য জেলায় এসেছে মাল কিনতে। এদের একজন আবার ওকে সহ্য করতে পারে না। যখন জেনেছে নূরুদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা, বীরপ্রতীক, সেদিনই বলেছিল, বীরপত্তিক না ছাই, যতসব চালাকি, মোরা এগুলা বুঝি।

একদিন নদীর ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে হাসমতের গলা দু'হাতে চেপে ধরে বলেছিল, আর এই রকম কথা কহিলে মাথাটা ফাটায়ে দিম। শালা, কুত্তার বাচ্চা। মোর জমিনত আসে ভাটিয়া হইছিস। নিজের জমিন নাই তো, পরের জমিত আসে ঘর উডাইছিস। ভাটিয়া শালার পুত তোর কল্লা চাবায়ে খামো।

নূরুদ্দিন গলার রগ ফুলিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, তুই যুদ্ধ করিসনি, স্বাধীন দেশ পাইছিস, এলা হামরা পথের কাঁটা হইছি, না? আরও যুদ্ধ করিম, হয় তুই থাকিবি, নাহয় হামরা থাকিম।

হাসমত সেদিন কথা বাড়ায় নি। ও যুদ্ধের সময় ময়মনসিংহে রাজাকার ছিল, টাকা-পয়সা লুটপাট করে ভয়ে পালিয়ে এসেছে এখানে। ওকে পথ দেখিয়েছে হযরত রাজাকার, ওর আত্মীয়। এখন ওরা দলে ভারী হতে যাচ্ছে।

এভাবেই তো দিন পার হয়। কখনও মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়ে, কখনও আরেকটি যুদ্ধের কথা ভেবে। এর মাঝে জীবিকার জন্য পাথরের পাহাড় বানিয়ে অন্যদের ডেকে বলেছে, দেখ মুই হিমালয় পব্বত বানাইছু।

ইদানীং হাসমতের বাড় বেড়েছে। ওর দলের মানুষ মন্ত্রী হয়েছে। নূরুদ্দিনের সামনে বুক টান করে বলে, ওই সব যুদ্ধ ফুদ্ধ ভুলে যাও। বীরপ্রতীক লেবাস পরে কাজ হবে না।

এখনকার বয়সী নূরুদ্দিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, যারা ওকে সেই সময়ের কথা ভুলতে বলে তারা কি এই দেশের মানুষ? নতুন করে বিষয়টি ওকে ভাবাচ্ছে। ওর বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। ও ডাহুক নদীর ধারে বসে থাকে। আর তাহেরুন প্রতিবেশী গেদুর মাকে বলে, বেলা গেল, মুই ভাত চড়ামো, মোর ভাতার এলা বাড়ি আসিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা য্যান লোকটারে কি কয়া ডাকেন?

বীরপত্তিক। তাহেরুনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে যায়। এই তো দুপুর বেলা পর্যন্ত দু'জনে পাথর ভেঙ্গেছে। ট্রাক বোঝাই পাথর চলে গেছে শহরে। তাহলে লোকটা আসছে না কেন? তাহলে কি হাসমত ওকে আবার বলেছে, এলা হামরা ক্ষমতা পাইছি। তুই বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোর ঘাড় মটকায়ে দিম, হালার পুত।

ভাত রান্না শেষ হলে নূরুদ্দিন ঘরে ফেরে না দেখে তাহেরুন ওকে খুঁজতে বের হয়। ডাহুক নদীর ধারে এসে দেখতে পায় নূরুদ্দিন একা একা বসে আছে। ও কাছে গিয়ে বসে। মৃদু স্বরে বলে, বীরপত্তিক।

ও তাহেরুনের দিকে ফিরে না তাকিয়ে বলে, আর একটা যুদ্ধ করিম।

কি কহিলেন?

ঠিকই কহিলাম।

তোমরা বাড়িত চলেন ভাত খাবেন।

হ ভাত খামো, ভোক নাগছে। মোক বেশি করে ভাত দিবু। য্যান শরীরের শক্তি শ্যাষ না হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার এক অদৃশ্য আনন্দে সে রাতে নূরুদ্দিন গভীর ঘুমে রাত পার করে দেয়।

কয়েকদিন পর পাথর ভাঙ্গার সময় কয়েকজন যুবক ছেলে নূরুদ্দিনের কাছে এসে দাঁড়ায়। ও পাথর ভাঙ্গা থেকে নিজেকে নিবৃত করে না। কারণ মজুরির হিসাব হবে ফুট হিসেবে মেপে। কাজ বন্ধ রাখা লস। তাহেরুন ওর পাশে বসে কাজ করছে। ওর হাতের হাতুড়ি থেমে গেছে। একজন পিঠের ব্যাগটা নামিয়ে বলে, আপনি এ গাঁয়ের মুক্তিযোদ্ধা, বীরপ্রতীক নূরুদ্দিন?

তাহেরুন ত্বরিত উত্তর দেয়, ঠিক কহিছেন।

নূরুদ্দিনও চোখ তুলে তাকায়। ছেলেটি বলে, আমি বিবিসিতে কাজ করি। আপনার একটা সাক্ষাৎকার নেব।

ক্যানে?

আপনি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। এখন আপনি কেমন আছেন?

যুদ্ধ তো শ্যাষ হয়নি। নূরুদ্দিনের নির্বিকার কণ্ঠ।

হয়নি?

না। ও দৃঢ় কণ্ঠে বলে। কোনোদিকে তাকায় না।

আমতা আমতা করে সাংবাদিক। ওর বিস্ময় ফুরোয় না। কি বলছে মুক্তিযোদ্ধা নূরুদ্দিন তা বুঝতে ওর সময় লাগছে। এলাকার নানাজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে ও একটি রিপোর্ট করবে বলে এসেছে। গাঁয়ের লোকজন দূর থেকে নূরুদ্দিনকে দেখিয়ে দিয়েছে। নূরুদ্দিনের মুখের সামনে ছোট ক্যাসেটটা ধরে রাখা যুবক বলে, আপনি যেন কি বলছিলেন?

কি কইছিলাম? কইছিলাম যে হামরা এলা সিজ ফায়ারে আছু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিজ ফায়ার?~তরুণ সাংবাদিক চিৎকার করে ওঠে। নূরুদ্দিন মৃদু হেসে আবার পাথর ভাঙ্গায় মনোযোগী হয়। সাংবাদিকদের বিস্ময়কে ভ্রুক্ষেপ করে না। পাথর ভাঙ্গার ঠুক ঠুক ধ্বনি চারদিকে বাজতে থাকে।

সাংবাদিক আবার বলে, আপনি কি বললেন? আমরা এখন সিজ ফায়ারে?

যুদ্ধের ট্রেনিংয়ের সময় এই কথাটা শিখছু। এলা এইটার মানে বুঝছু? আরেকটা যুদ্ধ লাগিবে।

বিমূঢ় সাংবাদিক অপার বিস্ময়ে নূরুদ্দিনকে দেখে– সব চুল পেকে গেছে, হাতের মোটা রগ দৃশ্যমান, বুকের হাড় গোনা যায়। ছেঁড়া গেঞ্জি সব হাড় ঢাকতে পারেনি। একটু পরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাহেরুনকে কি যেন বলে ওরা তা বুঝতে পারে না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চাশ

আজ কদম রসুলের মন খুব খারাপ।

মন খারাপ ওর কাছে নতুন বিষয় নয়। ওর মন যখন-তখন খারাপ হয়। মন খারাপ হলে ও ঘরে থাকতে পারে না। বেরিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। আজও তেমন অবস্থা হলে ক্রাচটা ভর করে রাস্তায় চলে আসে। কান্তা ওর বেরিয়ে আসার খেয়াল করেনি। ও রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ওর মন ভালো হয়ে যায়। কদম রসুল জানে আজ বাম দল হরতাল ডেকেছে। রাস্তায় দু'চারটে রিকশা চলছে মাত্র। কখনো কখনো একদমই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। যেটা অন্যদিনের তুলনায় একদমই অস্বাভাবিক দৃশ্য। ওর বেশ ভালো লাগছে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে। বাতাসে কালো ধোঁয়া নেই, এটাই ওর এখনকার স্বস্তি। কিন্তু বেশিক্ষণ রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা হয় না। দূর থেকে দেখতে পায় পুলিশের গাড়ি আসছে। কদম রসুল ফুটপাতের ওপর চলে আসে। দূরে অস্পষ্ট মিছিলের স্লোগান শোনা যাচ্ছে।

কদম রসুলের বয়স এখন সত্তর। পঞ্চাশ বছর আগে সে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশ নিয়েছিল। ওই মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে ওর একটি পা গুলিবিদ্ধ হয়। দু'মাস হাসপাতালে থাকার পর বাম পায়ের হাঁটুর কাছে কেটে ফেলতে হয়। তখন ও ছিল ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সে মিছিলে অংশগ্রহণের পরে কদম রসুল কখনো নিজেকে একা ভাবে না, সমষ্টির অংশ ভাবে। নিজের কথা বলার সময় আমি না বলে আমাদের বলে। যেমন বলে, আমাদেরকে এক গ্লাস পানি দে বাবলু। কিংবা আমাদের ঘুম পেয়েছে। বাবলুর বিয়ের পর নতুন বউ কান্তাকে বলেছিল, আমাদের এক কাপ চা খাওয়াবে বৌমা?

কান্তা শ্বশুরের পাশে আর কাউকে না দেখেও দু'কাপ চা বানিয়ে আনে। সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, আর এক চা কাপে দেব আব্বা?

কদম রসুল মৃদু হেসে বলে, আমাকেই দেবে। শোনো বৌমা–

তারপর কদম রসুল নিজের মিছিলে যাওয়ার গল্পটি বলে কান্তাকে। মিছিলে গিয়ে তার জীবন থেকে আমি শব্দটি মুছে যায়।

কদম রসুল এখন মিছিলের স্লোগান শুনতে পাচ্ছে। ও দাঁড়িয়েই থাকে। ভাবে, মিছিল কাছে এলে ওদের সঙ্গে হাঁটবে। পরক্ষণে ক্রাচটার দিকে তাকায়। এই পঞ্চাশ বছরে ক্রাচটা কয়বার বদলাতে হয়েছে? পঞ্চাশবার কি? হবে হয় তো। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেব করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। একটি ওর তাজা পা, অন্যটি কাঠের তৈরি ক্রাচ। বড় অদ্ভুত সম্মিলন। রক্ত মাংসের শরীর আর কাঠ? কাঠ তো প্রাণহীন। যদিও গাছের প্রাণ থাকে। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বলেছিলেন গাছের প্রাণ আছে। কিন্তু কাঠ তো গাছ নয়। এখন এই কাঠই ওর সম্বল। ক্রাচটা নাড়াচাড়া করে কদম রসুল নিজের দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থান ঠিক করার সময় ওর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। যেন হাসির নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য আছে, কিন্তু এ হাসির শব্দ নেই। কদম রসুল ঠোঁটের কোণে হাসি ধরে রেখে সামনের দিকে তাকায়। কালো কালে মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে। চেহারা স্পষ্ট নয়। মিছিলটা এগিয়ে আসছে। ও শক্ত করে ক্রাচটা ধরে। যেন মানুষের সমবেত নিঃশ্বাসের ধাক্কা ওকে আঘাত করতে না পারে। তখন ওর স্বর্গের তুবা গাছের কথা মনে হয়। গাছটি যাবতীয় সুখের আধার। যারা এমন গল্প করতে ভালোবাসে তারা কথা বলার সময় চেহারা উজ্জ্বল করে তোলে। যেন স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা ওদের বুকের ভেতর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ওরা বলে, স্বর্গে যারা বাস করে তাদের সবার গৃহে এই গাছের শাখাপ্রশাখা নুয়ে আছে। হাত বাড়ালে ছোঁয়া যায়। যে কোনো ফল খেতে ইচ্ছে করলে ওই গাছেই সেই ফল পাওয়া যায়। শুধু ইচ্ছের প্রকাশটাই প্রয়োজন। কদম রসুল ক্রাচটার ওপর নিজের শরীরের ভার শিথিল করে দিয়ে বলে, হায় তুবা বৃক্ষ তোমার কাঠ দিয়ে যদি আমাকে একটি ক্রাচ বানিয়ে পাঠাতে! আমার জীবনে কোনো পাপ নেই। শুধু ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য আমি একটি পা দিয়েছি। আর কোনো পাপ করিনি। সত্যি বলছি আর কোনো পাপ করিনি।

কদম রসুল আবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় ওর পিপাসা পেয়েছে। এক গ্লাস পানির অভাবে ওর ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। ও চারদিকে তাকায়। আবার ওর শোনা গল্পের কথা মনে হয়। ভাবে মানুষ গল্প বলতে ভালোবাসে। পৃথিবীর গল্প বলার চেয়ে স্বর্গের গল্প বলতে ওরা বেশি পছন্দ করে। ও অনেকবার স্বর্গের আল কাওসার নদীর কথা শুনেছে। এ নদীর জল সুগন্ধপূর্ণ ও সুস্বাদু। এমন একটি নদী নাকি দ্বিতীয়টি নেই। এ প্রবাহিত স্রোত যে আজলা ভরে পান করে তার আর কোনোদিন তৃষ্ণা পায় না। একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকিয়ে ওঠে কদম রসুলের মাথা। বলে, আমি তৃষ্ণা নিবৃত করতে চাই না। যার তৃষ্ণা নিবৃত হয়ে যায় সে কি আর মানুষ থাকে! আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতে চাই। কদম রসুলের মনে হয় শরীরে কোথাও যেন ব্যথা করছে। হয় পায়ে নাহয় ঘাড়ে। ও চারদিকে তাকায়। কোথাও দু'দণ্ড বসতে চায়। কিন্তু বসার জায়গা নেই। ওর ব্যথা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ওর কষ্ট বাড়ে। তখন ও মনেপ্রাণে হুরীদের কথা ভাবতে থাকে। হুরীরা পৃথিবীর মানুষের মতো মাটির তৈরি নয়, তারা মৃগনাভি দিয়ে তৈরি। হুরীদের কথা ভেবে হা-হা করে হাসে কদম রসুল। আজ কেন যে স্বর্গের গল্প ওকে পেয়ে বসেছে কে জানে। তবে হুরী প্রসঙ্গে আমোদ উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের ব্যথা চলে যায়। ও নড়েচড়ে দাঁড়ায়। নিজেকে এখন বেশ যুতসই মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্গের হুরীদের ভাবনা ওর শরীরের ভেতর সঞ্চারিত করে সত্যি। মনে মনে বলে, বেশ তো আছি। পঞ্চাশটা বছর এই কাটা পায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল এত ঘটনা, কত ওলটপালট! পাশ দিয়ে চলে যাওয়া মানুষের দীর্ঘশ্বাস বুঝি এসে লাগছে গায়ে। ওরা কি দুঃখের শ্বাস ফেলছে? ওদের কিসের কষ্ট? ওর সামনে কেউ নেই যাকে ও জিজ্ঞেস করবে। ও শুনতে পায় বাবলুর কণ্ঠ যে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা একদম পছন্দ করে না। বলে, তুমি কি চাও গাড়ি তোমাকে চাপা দিক?

না, চাই না। অপঘাতে মৃত্যু আমার একটুও পছন্দ নয়।

তাহলে ক্রাচে ভর করে বাড়ির বাইরে যেও না।

যাব না?

না। মাও তোমাকে নিষেধ করত। তুমি মায়ের কথা শুনতে বাবা। মা নেই বলে তুমি আমার কথা শোনো না।

তোর মা নেই তো আমার ঘরও নেই। এখন আমার কাছে ঘর আর রাস্তা সমান।

তুমি এভাবে বলতে পারলে?

রেগে যায় কদম রসুল। ধমকের সুরে বলে, মাঝে মাঝে এমন আজগুবি প্রশ্ন করিস যে বিরক্ত লাগে। ভুলে যাস না যে তুই আমার একমাত্র সন্তান।

বাবলু গজগজ করতে করতে চলে যায়। ওর স্ত্রী কান্তা বাবার বাড়িতে। প্রসবের তারিখ ঘনিয়েছে। ও থাকলে কদম রসুল খানিকটা ঠাণ্ডা থাকে। কান্তার কথা শোনে। এই মুহূর্তে মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে কান্তার জন্য দুঃখ হয় কদম রসুলের। বিয়ের দশ বছর পরে কান্তা সন্তানসম্ভবা হয়। প্রথম সন্তান বাঁচেনি। পরপর চারটি সন্তান জন্মের পরই মারা যায়। এত মৃত্যু নিয়ে একজন মা কি সুস্থির থাকতে পারে? কান্তা আছে। সব দুঃখ বুকের বাক্সে আটকে রেখে দিন কাটায়। এখন কান্তারও বয়স হয়েছে। ওই মিছিল দেখে কদম রসুলের মন ভালো হয়ে যায়। ওর বাড়ি ফেরার কথা মনে হয় না। ওর তৃষ্ণাও পায় না। ও পুনরায় বুকের ভেতর উৎফুল্ল ভাব নিয়ে হুরীদের কথা ভেবে হা-হা করে হাসতে হাসতে জাগতিক বোধ উড়িয়ে দিতে চায়। যেন পৌঁছে যায় বায়ান্নতে, যে সময়টাই ওর কাছে পরিপূর্ণ স্বর্গের ধারণার আমেজ। ওর আর অন্য কোনো সময়ের দরকার নেই। এই পঞ্চাশ বছরই ওর কাছে গভীর সত্য। পা হারানোর পঞ্চাশ বছর কি ওর জীবনে আর একটি ফুল ফোটাবে? ও আবার সামনে তাকায়। মিছিলটা এখনো অনেক দূরে। এগিয়ে আসছে। তখন ওর পাশে একজন পথচারী এসে দাঁড়ায়। ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, আপনি একা একা হাসছেন যে, কী ভাবছেন?

কদম রসুল লোকটিকে দেখে। হরতালের অলস দিনের আমেজ মাখানো চেহারা। পান খাচ্ছে। কত বয়স হবে ওর? কদম রসুল হিসেব করে ভাবল যে চাকরিতে থাকলে লোকটি এখনো রিটায়ার করেনি। আর যদি ব্যবসায়ী হয় তাহলে যে কারণে আজ হরতাল ডাকা হয়েছে তার জন্য ওর কোনো মাথাব্যথা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্য হরতাল দিন মানে ওর কাছে বেআইনি ছুটি। ও এই বেআইনি কাজটি উপভোগ করছে। এমন লোক ওর পছন্দ হয় না। ও কেন সঙ্গত কারণের জন্য মিছিলে যাবে না? কদম রসুলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটি আবার একই প্রশ্ন করে। কদম রসুল মৃদু হেসে বলে, পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জীবনে একটা সময় ছিল সেটা স্বর্গের বর্ণনা যেমন শুনি তেমন সময়।

সত্যি, তেমন সময় হয় নাকি?

হয়, হয়েছিল।

আপনি হুরী দেখেছিলেন?

হা-হা করে হাসে কদম রসুল। হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ, দেখেছিলাম। আমাদের সঙ্গেই মিছিলে ছিল।

ও তাই! লোকটি হাসে।

এখন লোকটিকে বেশ লাগে কদম রসুলের। মনে হয় ওর ভেতরে মানুষকে বুঝবার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি আছে। ও সেই ভঙ্গিতে এগিয়ে এসেছে কদম রসুলের পাশে। তখনই কদম রসুল ওকে জিজ্ঞেস করে, মিছিলে কি স্লোগান দিচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। না, পাচ্ছি বললে ভুল বলা হবে। কি স্লোগান দিচ্ছে সেটা আমি জানি।

কদম রসুল উদগ্রীব কণ্ঠে বলে, কি বলছে বলুন না?

বলছে, রান্নাঘরের চুলা বন্ধ করে দিয়ে গ্যাস রপ্তানি চলবে না।

লোকটি হাত উঁচিয়ে স্লোগানের ভঙ্গিতে কথাটা বলে। দু'বার-তিনবার বলে। কদম রসুল ওর সঙ্গে গলা মেলায়। আশ্চর্য, দীর্ঘদিন পর রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে ওর বেশ লাগছে। ওর কোনো শারীরিক কষ্ট নেই। ওর পা একটা নয়, দুটো। ও একজন সক্ষম মানুষ। তখন লোকটি বলে, আপনি বাড়ি যাবেন না?

আমাদের বাড়ি যেতে ভালো লাগছে না। রাস্তায় থাকতেই ভালো লাগছে।

আপনার সঙ্গে আর কে আছে?

দেখতে তো পাচ্ছেন কেউই নেই।

আপনি কেমন করে যেন কথা বলছেন।

কদম রসুল মৃদু হেসে নড়েচড়ে দাঁড়ায়। লোকটির কথার জবাব দেয় না। মাথা উঁচিয়ে মিছিলের অবস্থান দেখে। মিছিল এগিয়ে আসছে। লোকটি ওকে আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় থাকেন?

আরমানিটোলায়।

নিজের বাড়ি?

না, আমাদের নিজের বাড়ি নেই। আমরা ছা-পোষা মানুষ। এক পা নিয়ে বেশি কিছু করতে পারিনি। ডাকঘরে কেরানির কাজ করে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। বায়ান্নর মিছিলে অংশগ্রহণকারী একজন হুরী আমাদেরকে ভালোবেসে বিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল। ওনার শিক্ষকতার চাকরির কারণে আমরা ঠিকমতো দুটো ভাত খেতে পেয়েছি। মিছিলের মানুষ ছিল বলেই আমাদের মতো পঙ্গু লোককে বিয়ে করেছিল। বুঝলেন, ওই রকম মানুষ আর হয় না।

তিনি এখন কেমন আছেন?

নেই। আমাদের ছেলেদের বিয়ের দিন হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছেন।

তিনি না থাকাতে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?

কদম রসুলের ঠোঁট কাঁপে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে লোকটির মুখের দিকে। তারপর বলে, তিনি যতদিন ছিলেন কখনো মনে হয়নি যে আমাদের একটি পা নেই। এখন রাত-দিন মনে হয় আমরা ল্যাংড়া।

কবে মারা গেলেন?

জানি না। ভুলে গেছি।

কদম রসুল মিছিল দেখতে মনোযোগী হয়ে যায়। বাতাসে ধুলো ওড়ে। কদম রসুল পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক ঢাকে। বুঝতে পারে যে ধুলো মুখে ঢুকে গেছে। দাঁত কিচকিচ করছে। ও ফস করে একদলা থুতু ফেলে মুখের ভেতরটা ধুলোমুক্ত করতে চায়। ভীষণ অস্বস্তিতে ওর বুকে আবার তৃষ্ণা জাগে। তখন পাশের দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বলে, এ বছরে তো ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর হলো। আপনার স্ত্রী বেঁচে থাকলে নিজেরা দিনটা উদযাপন করতে পারতেন।

ধাম করে মেজাজ চড়ে যায় কদম রসুলের। চিৎকার করে বলে, একটু বেশি কথা বলছেন আপনি? কে আপনাকে এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করতে বলেছে? প্লিজ আমাকে রেহাই দিন।

আকস্মিক আক্রমণে লোকটি থতমত খেয়ে চুপ হয়ে যায়। ওর মনে হয় কদম রসুলের শরীরের ভেতরে কোথায় নাটবল্টু ভেঙ্গেছে। ও এখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। কদম রসুল তখনও চিৎকার করে বলেন, কিছু একটা ধরে শরীরটা সোজা রাখতে পারলে আমি ক্রাচটা আপনার মাথায় ভাঙতাম। দেখতাম কিভাবে আপনার মাথাটা দু'টুকরো হয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

কদম রসুলকে ভয় করে লোকটির। বুঝতে পারে না যে কেন কদম রসুল এমন আকস্মিকভাবে রেগে গেল। ও কি কোনো খারাপ কথা বলেছে? নাকি উৎসব উদযাপন কদম রসুলের জীবনে মিথ্যা হয়ে গেছে? নাকি একুশের ভাবনা কদম রসুলকে দিশেহারা করেছে? লোকটি দেখতে পায় কদম রসুল ক্রোধ দমন করে এগিয়ে আসা মিছিলের দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে। তখন দু'জনকে সচকিত করে দিয়ে পুলিশের গাড়ি সশব্দে ওদের সামনে এসে থামে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পুলিশেরা পজিশন নেয়। কদম রসুলের দৃষ্টি প্রথমে পড়ে পুলিশের বুটের উপর। পরে গিয়ে পড়ে রাইফেলের উপর। বুঝতে পারে পোশাকটা এখনকার নয়। যেন অদৃশ্য পোশাকে আবৃত হয়ে আছে মহানগরের পুলিশ বাহিনী। খাকি রঙের শার্ট এবং হাফপ্যান্ট পরে ওরা বীরদর্পে এগিয়ে আসছে। গুলিবিদ্ধ কদম রসুলকে বুটের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাথি দিয়ে চিৎ হওয়া অবস্থা থেকে উপুড় করে দেয়। ঠিক উপুড় নয় মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে কদম রসুল। ওর চোখে অন্ধকার। দেখতে পায় রোদ ঝকঝকে দুপুরের রাজপথে নেমে এসেছে শকুনের ছায়া। উপুড় হয়ে পড়ে থাকার জন্য দৃষ্টি এখন রাজপথের কালো পিচের উপর। কদম রসুল মাথা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলে, দৃশ্যপট এমন বদলে গেল কেন ওর সামনে? আহ বায়ান্ন! ও পুলিশের উঁচিয়ে রাখা রাইফেলের মাথার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে। লোকটি তখন কাছে এসে ওর হাত টেনে ধরে বলে, আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

কেন?

গণ্ডগোল হতে পারে। পুলিশের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওরা বোধহয় মিছিল আক্রমণ করার হুকুম পেয়েছে। আপনি আর এখানে দাঁড়াবেন না।

এতক্ষণ ধরে কথা বলছি কিন্তু আপনার নামই জানা হয় নি। আপনার নাম কি?

আবুল বরকত।

বাবার নাম?

আবুল কাশেম।

দেশের বাড়ি কোথায়?

বরিশালে। কিন্তু আপনি এত কথা জিজ্ঞেস করবেন না। চলে যান। গণ্ডগোল লাগলে তো আপনি দৌড়াতে পারবেন না।

আপনাকে তো আমি বলিনি যে আমি দৌড়াতে চাই।

কদম রসুল ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়। চেঁচিয়ে বলে, আপনি ভয় পেয়ে থাকলে চলে যান।

আমি ভয় পাইনি।

তাহলে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন কেন?

ইয়ে মানে–

আমাদের পা নেই, তাই তো?

লোকটি পুলিশের দিকে তাকায়। মিছিল এগিয়ে এসেছে। কদম রসুল লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে, আবুল বরকত শুনুন, আপনি আমাকে সাহায্য করলে আমি আমার ক্রাচটা পুলিশের পিঠে ভাঙতে পারি। বায়ান্নোর পঞ্চাশ বছর বয়সে এটা ভেঙ্গে ফেলার সময় হয়েছে।

আবুল বরকত ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আসুন তাই করি।

তখন গর্জে ওঠে মিছিল : রান্নাঘরের চুলা বন্ধ রেখে গ্যাস রপ্তানি চলবে না।

ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশ বাহিনী। এলোপাতাড়ি পিটাতে থাকে। রাস্তাটা কুরুক্ষেত্র হয়ে যায়। অসংখ্য ইট এসে পড়তে থাকে পুলিশের গায়ে। আহত হয় অনেকে। তখন আবুল বরকত কদম রসুলের একটা হাত নিজের ঘাড়ের ওপর উঁচিয়ে নিয়ে বলে, আসুন। এখনই সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনে নেমে যায় রাস্তায়। একজন পুলিশ আবুল বরকতের চুলের মুঠি ধরে বলে, শালা গাদ্দার। কুত্তার বাচ্চা। লাথি মেরে পাছা ফাটিয়ে ফেলব।

তখন কদম রসুলের ক্রাচটা আকাশসমান উঁচু হয়ে ওঠে। ধাম করে পড়ে পুলিশের পিঠে। দু'বার পড়ার পরই ক্রাচটা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায়। আর পুলিশের গুলিতে বিদ্ধ হয় কদম রসুলের অপর পা'টি। ও মুখ থুবড়ে পড়ে যায় পিচঢালা রাস্তার ওপরে। ওর চারদিকে অন্ধকার। পায়ের দিক থেকে রক্ত এসে ওর মুখটা ভিজিয়ে দেয়। ও অনুভব করে ওর আশপাশে অনেকে পড়ে আছে। গোঙানির শব্দ ওর দু'কানে বাজে। ও অস্ফুট শব্দে বলে, আবুল বরকত আপনি কোথায়?

মার খেয়ে দূরে ছিটকে পড়েছে আবুল বরকত। ও কদম রসুলের ডাক শুনতে পায় না। চারদিকে গালিগালাজের শব্দ। পুলিশের মুখে খিস্তি খেউড়ের তুবড়ি ছুটেছে। মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। যারা রাস্তার ওপর পড়ে গেছে তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে অন্যরা। আবুল বরকত মার খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। খানিকটা স্থির হয়ে উঠে দাঁড়াতেই কদম রসুলের কথা মনে হয়। দেখতে পায় ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে পড়ে আছে কদম রসুল। আবুল বরকত দৌড়ে কাছে গিয়ে বসে দু'হাতে টেনে তোলে ওকে। আর্তনাদ কদম রসুলের কণ্ঠে।

কোথায় লেগেছে আপনার?

পায়ে।

হা হা করে হেসে ওঠে আবুল বরকত। বলে, ভালোই তো। পঞ্চাশ বছর পরে আবার দ্বিতীয় পা'টি দিলেন।

কদম রসুল আবুল বরকতের হাত জড়িয়ে ধরে। যন্ত্রণায় কুঁচকে থাকে মুখ। তারপরও চোখ বড় করে বলে, যদি বেঁচে থাকি দরকার হলে শরীরের অঙ্গ একটি একটি করে খুলে দেব। দুঃখ নেই।

চারদিক থেকে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ছুটে আসে ওর কাছে। সবার মুখে নানা ধরনের কথা। নানা অভিব্যক্তি।

হাসপাতালে নিয়ে চলুন। আর দেরি করবেন না। রিকশা নেই তো কি হয়েছে, ঘাড়ে উঠিয়ে নিয়ে চলুন। আসুন, ধরুন ওনাকে। আহা রে, প্রচুর রক্ত ঝরেছে।

অল্পক্ষণে কদম রসুলকে চার-পাঁচ জনে ঘাড়ে তুলে নেয়। ওর গুলিবিদ্ধ পা'টাকে যত্নে কাঁধের উপর রাখে আবুল বরকত। যে কদম রসুল কোনোদিন নীলিমা দেখেনি সে আজ মানুষের ঘাড়ের উপর শুয়ে নীলিমা দেখতে দেখতে হাসপাতালে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধবা

খাঁ খাঁ রোদ্দুরে প্রকৃতির মাথায় ঘাম জমে না, ও হাঁসফাঁস করে না, ছায়া খোঁজার চেষ্টা করে না, রোদ ওকে ভীত করে তোলে। ওর মনে হয় কেমন ঝনঝন শব্দ চারদিকে, ও বুঝতে পারে না সেটা কান্না নাকি হাসির শব্দ। ওর চুলের ভেতরে হাত ঢুকাতে চায়, ওর চুল ছোট করে ছাঁটা, ওর চুলের ভেতরে হাত ঢোকে না, ও চুলের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নেয়। কপালের উপর হাতটা থেমে থাকে, ও মধ্য রাজপথে নিজেকে আবিষ্কার করে। ভুলে যায় যে কোনো সময় একটি গাড়ি ছুটে এসে লাশ বানিয়ে ফেলতে পারে।

সময়টা এখন এমনই। জীবনের দৈর্ঘ্য একটা চায়ের চামচের সমান এবং একজন মানুষের জীবন কখনো কখনো আর একজন মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ ইচ্ছে করলেই তাকে ভেঙ্গে মাটির নিচে গাদিয়ে দিতে পারে। এমন একটা ঘটনাই তো ও গতকাল দেখল, যখন প্রেরণা জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়ল, আর ওর মা বলল, হায় আল্লাহ, দেশটা কি আর মানুষের বাসের উপযোগী নেই? চারদিকে এত মৃত্যু কেন? আমার মেয়েটি সংসার করার আগেই বিধবা হলো!

বিধবা শব্দটি প্রকৃতিকে খুব নাড়া দেয়। ও একবার ভেবেছিল ওর মাকে জিজ্ঞেস করবে, একটি মেয়ের স্বামী মরে গেলে তাকে কেন আর একটি শব্দ দিয়ে আলাদা করা হয়?

কিন্তু মাকে এমন একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়নি। কেন হয়নি তা প্রকৃতি বুঝতে পারে না। কখনো খুব একটি সহজ প্রশ্ন ওর কাছে ভীষণ কঠিন হয়ে যায়। ও নিরেট কঠিনের খোলসের থেকে বেরোতে পারে না। প্রকৃতি নিজেকে বলে, আমার যে কি হয় বুঝতে পারি না। শুধু বুঝি প্রেরণা আমার খালাত বোন। গতকাল ওর স্বামী খুন হয়েছে। দুপুরের বিয়ের উৎসবটা হওয়ার পরে ওদের বাসর হওয়ার আগেই খুন।

প্রকৃতির মনে হয় এই খুন হওয়ার ব্যাপারটিও ও বুঝতে পারছে না। কোথায় যে ওর গোলমাল সেটা ধরা ওর পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। শুধু বোঝে মানুষ যে চায়ের চামচের সমান আয়ু নিয়ে বেঁচে আছে সে আয়ুটুকু নিয়েই চলে গেল প্রেরণার স্বামী। এই ঘটনার ফলে ও কি ভাষা নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কি বলবে? কিছু বললে প্রেরণাকে কি তা খুব সাহায্য করবে? নাকি প্রেরণার কাছে তার কোনো অর্থই থাকবে না? এসব ভেবে খুব বিপন্ন বোধ করে প্রকৃতি। ভাষা ওকে এই মুহূর্তে অদৃশ্য করে ফেলেছে বলে অনুভব করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরা মা-ছেলে একটা বাড়িতে থাকে। বছর দুয়ের আগে ওর বাবা সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হয়েছে। ব্যবসা সংক্রান্ত জটিলতায়। ভাগাভাগিতে গরমিল। মালিকানার প্রশ্ন ইত্যাদি নানা কিছুর জটিলতায় খুন হয় ওর বাবা। তারপর থেকেই এ শহরটা ওর কাছে বিশাল পোড়ো জমি। এখনকার মানুষের আয়ু একটা চায়ের চামচের সমান– যারা বেশি বয়স নিয়ে বেঁচে আছে সেটা ঠিক বাঁচা নয়, ওটা তো মৃত্যুর গহ্বরে ঢুকে বাতাসহীন, আলোহীন অবস্থায় থাকা। কেবল টেনে টেনে নিঃশ্বাস ফেলা, খেতে ইচ্ছে না করলেও বেঁচে থাকার জন্য জোর করে একটু খেয়ে নিদ্রাহীন রাতযাপন। এমন একটি অবস্থা এই শহরের।

প্রকৃতি একটি বাদামী চাদর মুড়ি দিয়ে এই শহরেই হেঁটে যায়। মা অদৃশ্য কণ্ঠে বলে, খোকা কোথায় যাচ্ছিস?

একটি গাছ খুঁজতে।

গাছ কি আছে এই শহরে?

খুঁজেই দেখি না।

প্রকৃতি একটি নীল চাদর মুড়ি দিয়ে হেঁটে যায় এই শহরে। মা অদৃশ্য কণ্ঠে বলে, খোকা কোথায় যাচ্ছিস?

একটি পাখি খুঁজতে।

তুই কয়টি পাখি চিনিস খোকা?

কবুতর চিনি, যেটা তুমি পোষো এবং যেটা তোমার হাত থেকে সরষে খায়। তোমাকে ভয় পায় না। আবার উড়ে যেতে পারে।

আর কোনো পাখি চিনিস না?

চিনি মা। ছোটবেলায় তুমি আমাকে অনেক পাখি চিনিয়েছিলে। কিন্তু এই শহরে ওই পাখি আর নেই।

তাহলে কোথায় পাখি পাবি?

খুঁজেই দেখি না। যদি ছোট একটি টুনটুনি কোথাও বাসা বেঁধে থাকে।

এভাবে প্রকৃতি চাদর মুড়ি দিয়ে হেঁটে গেলে মায়ের অদৃশ্য কণ্ঠস্বর ওর সঙ্গী হয়। মা ওর বন্ধু। ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো মেয়ের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক তৈরি হয়নি যাকে ও ভালোবাসার কথা বলতে পারে।

খালাত বোন হলেও ওদের দেখা সাক্ষাৎ তেমন হয়নি। প্রেরণা বিদেশে লেখাপড়া করেছে। ওর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। পড়ালেখা শেষ করে ফিরলে একদিন আকস্মিকভাবে ওর মনে হয়েছিল প্রেরণা দারুণ মেয়ে। ভীষণ সপ্রতিভ, জানেশুনে ভালো। ও যখন কথা বলে তখন ওর দিক থেকে দৃষ্টি ফেরানো যায় না। ওর মেধা আর মাধুর্য পাশাপাশি চলে। একদিন বাড়ি ফেরার পথে রিকশা ছেড়ে দিয়ে ফুটপাতে নামলে পাশের রিকশা থেকে প্রেরণা ডাক দিয়ে বলেছিল, প্রকৃতি ভাই আপনাকে কেমন বোকা বোকা দেখাচ্ছে। এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ও গম্ভীর হয়ে বলেছিল, নেমে আয়। তোর সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার জরুরি কথা? আমি তো ভাবতেই পারি না যে আপনার এমন কোনো কথা থাকতে পারে।

পাকামো করিস না প্রেরণা।

ও রিকশা ছেড়ে দেয়। বলে, চলুন ওই শাল গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াই। দেখেছেন কেমন ফুলের গুঁড়ি বিছিয়ে আছে গাছের নিচে।

প্রেরণা, তোকে আমার ভীষণ দরকার।

আমাকে? কেন?

বোকার মতো প্রশ্ন করছিস কেন?

প্রেরণা থমকে যায়। সরাসরি প্রকৃতির দিকে তাকায়। বুঝতে চেষ্টা করে ওর দৃষ্টি। প্রকৃতি ওর হাত ধরলে প্রেরণা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, ভুলে যাচ্ছেন নাকি যে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি!

প্রেরণা–

প্রেরণা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, আপনি কি ভালোবাসার কথা বলবেন? আমি অমৃতকে ভালোবাসি। দিল্লিতে পড়ার সময় ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। বিয়েও হবে।

ঠিক আছে, আমি তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

শিউরে উঠেছিল প্রেরণা।

কি বলছেন আপনি? আপনি কি আমার জন্য আমৃত্যু অপেক্ষা করবেন?

হ্যাঁ, তাই তো। তুই অমৃতকে বিয়ে করে সুখী হ।

প্রেরণা রেগে বলেছিল, বোকার মতো কথা বলছেন।

পোড়া শহরে মানুষ তো বোকাই থাকে প্রেরণা। আমি বোকামি এনজয় করি।

খালাম্মা আপনাকে একা থাকতে দেবেন কেন?

দেবে, মায়ের ভালোবাসাই দেবে।

একথা শুনে প্রেরণা বোকার মতো প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, প্রকৃতি যে ওয়েস্ট ল্যান্ডের কথা বলে সেখানে নিজেও তো বোকার মতো আচরণ করছে। এই শহরের মানুষের নিয়তি কি বোকা হয়ে যাওয়া? পরমুহূর্তে ওর মনে হয় প্রকৃতি ভীষণ এলিয়ট প্রেমিক। ও সারাক্ষণ হতাশায় ভোগে। ও ওর চারদিকের সবখানে ওয়েস্টল্যান্ড দেখতে পায়। প্রেরণা অনেকবার শুনেছে প্রকৃতি বলে, এলিয়ট তুমি ম্যাজিক। আমার কল্পনাতেও স্বপ্ন নেই। আমি পোড়া জমির পোড়া দেয়ালের গায়ে নিজের ছবি ফুটে উঠতে দেখি।

চল তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি একাই যেতে পারব।

আমি গেলে তুই কি রাগ করবি?

ঠিক আছে চলেন।

প্রেরণা হাঁটতে শুরু করে। পাশাপাশি প্রকৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু পরে প্রেরণা একটি রিকশা ডেকে উঠে পড়ে। বলে, আমার হাঁটতে ভালো লাগছে না। আপনি যাবেন?

না। প্রকৃতি মাথা নাড়ে। রিকশা চলে যায়। বাড়ি ফিরতে ওর অনেকক্ষণ সময় লাগে। ও হাঁটে। থামে। ইতস্তত দাঁড়ায়। ভাবে। ভাবনা আকাশে উড়িয়ে দেয়। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দঁড়ায়। কেউ কেউ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও ভ্রুক্ষেপ করে না। মানুষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সামনে ও নিজের বিস্তার দেখে। ও মৎস্যকন্যাদের গান শুনতে পায়। তাদের সাথে কল্পনার সাগরজলে ভাসবে যতক্ষণ না মানুষের কণ্ঠস্বর তাকে সমুদ্রের তলে ডুবিয়ে দেয়। একটি ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি অসুস্থ?

অসুস্থ? ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকায়।

মনে হচ্ছে আপনার কিছু হয়েছে।

তোমার মনে হতে পারে। কিন্তু আমার তো হচ্ছে না।

একটু আগে যে মেয়েটি রিকশায় করে চলে গেল আপনি তাকে ভালোবাসেন?

ভালোবাসা?

শব্দটা আপনি কি বোঝেন না?

না।

প্রকৃতি আগুন চোখে ছেলেটির দিকে তাকায় এবং তারপরে হনহন করে সামনের দিকে হেঁটে যায়। ছেলেটি ওদের অনেকক্ষণ ধরে দেখেছে এবং দেখা থেকে ওর মনে প্রশ্ন জেগেছে। প্রকৃতির নিজের ওপরেই রাগ হয়। বুঝতে পারে রাগটার সূত্র প্রেরণার প্রত্যাখ্যান এবং মানুষ প্রত্যাখ্যাত হলে মূল থেকে ছিটকে পড়ে। তার উপর যে ঘটনা, যদি কেউ কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দেখে সেটা আরও ক্রোধ উদ্রেককারী হয়।

তখন ও শুনতে পায় মায়ের কণ্ঠ।

খোকা কোথায় যাচ্ছিস?

নদী খুঁজতে।

নদী তো নেই। সব বালু পড়ে বুঁজে গেছে।

আমি ঠিকই একটি নদী খুঁজে পাব মা।

খোকা ঘরে আয়।

তুমি ভেব না, আমি ঠিকই ঘরে পৌঁছে যাব। দেখবে তোমার ছেলের গায়ে বালুচরের গন্ধ।

ও একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ে, দ্রুত বাড়ি ফেরে, মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলে, মা কি করছ? আজ যে হিন্দি ছবিতে ডুবে নেই তুমি?

তুই তো জানিস আমি ভীষণ টায়ার্ড থাকলে হিন্দি ছবি দেখি। নইলে আমার তো রাজ্যের কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, বাবার ব্যবসাটা তো তুমিই সামলালে। নইলে আমাদের যে কি হতো! মাগো আমি তোমার ভীষণ অপদার্থ ছেলে।

সোনা আমার চা খাবি?

তুমি কাজ কর। আমিই তোমাকে চা বানিয়ে দিচ্ছি।

প্রকৃতি রান্নাঘরে যায়, কিন্তু ওকে চা করতে দেবে কেন কাজের লোকেরা। সোজা কথা সাহারার, আপনি খালাম্মার কাছে যান ভাইয়া। খালাম্মার খুব মন খারাপ।

কেন?

প্রেরণা আপুর বিয়া ঠিক হইছে যে।

তাতে মায়ের মন খারাপ কেন?

আমি হুনছিলাম খালাম্মা চাইছিল যে প্রেরণা আপুরে আপনার লগে বিয়া দিব।

চুপ, আর একটা কথা না বুয়া।

আপনে যান।

প্রকৃতি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের সামনে বসে দু'হাত কাগজের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বলে, চলো দু'জনে হিন্দি সিনেমা দেখি।

আমার অনেক কাজ খোকা।

তুমি কি কাজের আড়ালে নিজেকে লুকাচ্ছ?

পাগল! তোর সঙ্গে চালাকি কিসের আমার! তোর কি হয়েছে বল তো?

কিচ্ছু হয়নি। একদম ভালো আছি।

আজ কতটা রাস্তা হেঁটেছিস?

অনেক, হাজার খানেক মাইল তো হবেই।

কারোর সঙ্গে দেখা হয়নি?

হয়েছে।

কে তারা?

প্রথমে ভুতু। তারপরে কালি। তারপরে আষাঢ়। শেষে শুকতারা।

ফাজলামি করছিস আমার সঙ্গে?

একদম না। আমি তো এমন করে সবার নাম রাখি।

সাহারা পায়েস আর চা দিয়ে যায়। প্রকৃতি বাটিটা টেনে দু'চামচ মুখে দিয়ে বলে, দারুণ হয়েছে।

হ্যাঁ, চমৎকার রেঁধেছে সাহারা।

তোমার এই রান্নার ম্যানেজারটি দারুন। তবে আমাদের ব্যাপারে বেশি নাক গলায়।

ও নিজেকে এই পরিবারের একজন ভাবে যে।

হ্যাঁ, তাই হবে। সে জন্য ওর এমন বাড়াবাড়ি।

হয়েছে, আর সমালোচনা করতে হবে না। খেয়ে শেষ কর।

আচ্ছা মা একটা প্রশ্ন করব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল।

বাবাকে যারা মেরে ফেলল, সেই সন্ত্রাসীদের তুমি ধরিয়ে দিলে না কেন? তুমি তো জানো খুনী কে।

ভয়ে।

কিসের ভয়?

ওরা যদি তোকে ধরে নিয়ে যায় এই ভয়ে। সম্পত্তির চেয়েও তুই আমার কাছে বেশি মূল্যবান। তোর বাবার হত্যাকারীর বিচারের চেয়েও তোর জীবন আমার কাছে অনেক বেশি বড়।

তুমি আপোস করলে মা?

হাসিনা আক্তার ছেলের অভিযোগে চুপ করে যায়।

আপোস তো বটেই, ওর তো উচিত ছিল খুনীকে চ্যালেঞ্জ করা। মৃত্যুভয় কি খুব একটা বিশাল ব্যাপার? হাসিনা আক্তার ছেলের মুখের দিকে তাকায়। ও একদৃষ্টে মাকে দেখছে। মায়ের চোখে চোখ পড়তে মৃদু হেসে বলে, তুমি চিন্তায় পড়েছ মা? ভাবছ কাজটি ঠিক করনি? হাসিনা আক্তার কথা বলে না। ছেলের কথায় মৃদু হলেও কোথায় যেন প্রতিবাদ আছে, সে প্রতিবাদে ও আক্রান্ত হয়েছে। সত্যি কি ও কাজটা ঠিক করেনি? হত্যার বিচার দাবি করা উচিত ছিল?

মা কি ভাবছ?

হত্যার বিচার না চেয়ে আমি কি ভুল করেছি?

করেছ। কাজটা ঠিক করোনি। তুমি যেভাবে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছ এই বাঁচা আমাকে সুস্থ পথ দেখায়নি।

এই তোর কথা?

চলো হিন্দি সিনেমা দেখি। তুমি আর আমি অনেকদিন একসঙ্গে সিনেমা দেখি না।

আজ থাক।

কাল আমার সময় হবে না।

পরশুদিন আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। আমি সারাদিনই বাড়িতে থাকব না।

সন্ধ্যায় তো ফিরবে?

তাও বোধহয় হবে না। মিটিং ফলোড বাই ডিনার।

তাতে কি, যত রাতেই আসো না কেন আমরা রাত জেগে সিনেমা দেখতে পারি। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব মা। কোন ছবিটা বেছে রাখব বল?

বেশি টায়ার্ড হলে আমার ঘুম পায়।

আসলে তুমি আমাকে পাশ কাটাচ্ছ।

হাসিনা আখতার আর কথা না বাড়িয়ে নিজের শোয়ার ঘরের দিকে যায়। প্রকৃতি মায়ের পিছু পিছু গিয়ে বলে, আমি যে সত্যি কথাটা বলেছি সেটা তোমার পছন্দ হয়নি মা। আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি এটাও জানি তুমি বাবাকে খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসতে। তোমার অনেক কথা-হাসি এখনও আমার চোখে লেগে আছে। তুমি আমাকে ভীষণ ভালোবাসো। তোমার একমাত্র সন্তান তো। তারপরও আমি মনে করি আমি যে সত্যি কথাটা বলেছি তা অন্যায় নয়। তোমাকে সত্যটা মানতেই হবে মা।

আমি মানছি। তবে এটাও ঠিক, যা করিনি সেটাকেই আমি ঠিক মানছি। আমি নতুন করে বিচারের দাবি তুলব না। তোকে আমি কিছুতেই হারাতে পারব না খোকা।

আকস্মিক কান্নায় ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে থাকে হাসিনা আখতার। সে রাতে দু'জনের কেউই ঠিকমতো ঘুমুতে পারে না। বারবার ঘুম ভেঙ্গে যায়– একজনের সামনে ভেসে ওঠে স্বামীর স্মৃতি, অন্যজনের সামনে বাবার, জীবনের কোন পরতে একজন মানুষ আড়ালে থেকে আবার দৃশ্যমান হয়, বড় কঠিন এই দৃশ্য সঙ্গে নিয়ে চলা। রাত ফুরিয়ে গেলে দু'জনের ঘরে দিনের প্রথম আলো ঢোকে– সাদা, স্নিগ্ধ আলো। এক সময় এমন দিন ছিল ওদের জীবনে, এখন নেই। একজন মানুষ সব শুষে নিয়েছে– এমন প্রখর রৌদ্রালোকে নেমে আসে আকস্মিক অন্ধকার, মরুঝড় এবং উড়িয়ে নিয়ে যায় সবটুকু সবুজ। তবু দু'জনের আপ্রাণ চেষ্টা থাকে সবটুকু ধরে রাখার জন্য। দু'জনেই প্রবল তৃষ্ণায় দিনের প্রথম আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এর মাসখানেকের মধ্যে খুন হয় প্রেরণার স্বামী অমৃত। সরাসরি বিয়ের আসরে। রিভলবার উঁচিয়ে বাড়ির লোকজনের সামনে দিয়ে হেঁটে চারজন যুবক বীরদর্পে হেঁটে মাইক্রোবাসে গিয়ে ওঠে। সাদা রঙের মাইক্রোবাস যেন ওদের উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। যেন অদৃশ্য ঘণ্টা বাজে রাস্তায়, আর গাড়িগুলো ছেড়ে দেয় পথ, ট্রাফিক পুলিশের সিগনাল সরে যায় এবং মুহূর্তে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় মাইক্রোবাস। বিয়েবাড়িতে অবস্থানরত অন্যরা যখন সম্বিত ফিরে পায় তখন তারা একটি লাল রঙের মাইক্রোবাসে অমৃতকে উঠিয়ে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটতে থাকে। ট্রাফিক জ্যামে পরিপূর্ণ শহরে লাল মাইক্রোবাস ঠিকমতো এগুতে পারে না। পথে পথে আটকে যায়। ট্রাফিক পুলিশের সামনে এলে জ্বলে ওঠে লালবাতি। অনেকক্ষণ পরে যখন সবাই হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে অমৃতকে নিয়ে যায় তখন ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। বিমূঢ় আত্মীয়স্বজনের বিলাপের মাঝে সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় অমৃতকে। তারপর ও চলে যায় মর্গে।

এর সবটুকুই সামনে দাঁড়িয়ে দেখে প্রকৃতি। তারপর সবার অলক্ষ্যে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায়। সোজা বাড়ি ফিরে এসে ধুমধাড়াক্কা একটি হিন্দি সিনেমা ভিসিডিতে লাগিয়ে বসে থাকে। মাথার ভেতর দিয়ে ছায়াছবির মতো দৃশ্যগুলো চলমান হয়, সিনেমার গান রিভলবারের গুলির মতো ছুটে আসে ওর দিকে। সাহারা ওকে চা আর হালুয়া দিয়ে গেছে। খাওয়া হয়নি। বমি পাচ্ছে। বাথরুমে যাওয়া দরকার। পোশাক খুলে গায়ে পানি ঢাললে মনে হতে পারে এভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাফিকের বাতিগুলো ধুয়ে দেয়া যায়, যে বাতিগুলোর সামনে দাঁড়ালে ওগুলো আর কোনোদিন লাল হয়ে জ্বলবে না। বাথরুমে ঢুকে কাপড় খোলার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেকে বলে, তোমাকে তো এখন প্রেরণার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে স্মৃতি। তুমি ওকে তেমনই বলেছিলে।

হ্যাঁ বলেছিলাম। আমি তো সেখান থেকে ফিরে আসিনি। আমি ওর জন্য অপেক্ষাই করব।

ও সাওয়ারের নিচে দাঁড়ালে ধুয়ে যায় ময়লা। ও ভাবে এটা হয়তো গোসল নয়, এটা পরিচ্ছন্নতার অংশ, যে পরিচ্ছন্নতা দিয়ে জীবনের নতুন নির্মাণ সম্ভব হয়।

ও জলের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতেই থাকে।

দু'দিন পরে বাড়ি ফিরে হাসিনা আখতার ছেলেকে বলে, তুই কি কিছু জানিস যে কেন এই হত্যাকাণ্ডটা ঘটল?

না মা।

প্রেরণাও কিছু বলতে পারছে না।

তাহলে ও অমৃতকে ঠিকমতো চিনতে পারেনি।

প্রেরণা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে। ওর না জানার কথা নয়।

কেউ কি থানায় গেছে?

হ্যাঁ, এজাহার করা হয়েছে।

হাসিনা আখতার নিজের ঘরে যায়। প্রকৃতি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। আকাশটা চমৎকার দেখাচ্ছে, ঝকঝকে নীল, বাতাসও স্নিগ্ধ এবং মৃদু। বেশ তো সুন্দর পৃথিবী, তাহলে বেঁচে থাকা এত কষ্টের কেন? আমি প্রেরণাকে অমন নীল দিয়ে ভরিয়ে দেব, স্নিগ্ধ বাতাসও দেব, যেন সবকিছু ওর বুকের ভেতর ঢুকে কষ্ট মুছে দেয়। প্রকৃতি নিজের সঙ্গে কথা বলে মায়ের ঘরে আসে। দেখতে পায় মা ঘুমুচ্ছে। ও দরজায় দাঁড়িয়েই থাকে। বলে, আহা বেচারা, ভীষণ টায়ার্ড। অমৃতের খুনের হত্যার প্রতিবাদ করবে আর কোনোদিন হিন্দি সিনেমা না দেখে, যতদিন বিচার না পাবে। দায়টা নিজের ওপরই নিল মা। বেচারা! প্রকৃতির ইচ্ছে করে মায়ের পাশে গিয়ে শুয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু এগোয় না, মায়ের এমন সুন্দর ঘুমটা ভেঙ্গে যাবে এই ভেবে। টানা দু'দিন বোনের বাসায় থেকে বিশাল মানসিক ধকলে পরিশ্রান্ত হাসিনা আখতার একটি খুনের সূত্র ধরে আর একটি খুন দেখতে পায়, এ যন্ত্রণা নিয়ে নিঃসাড় ঘুমের ভেতরে আশ্রয় পাওয়া ভাগ্য ছাড়া আর কি। ভাগ্যবতী হাসিনা আখতার তুমি ঘুমোও!

প্রকৃতি মায়ের ঘরের দরজা থেকে সরে আসে। ওর ভীষণ মন খারাপ হয়। ড্রয়িংরুমে রাখা বাবার বড় ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে চোখ মোছে।

অমৃতের মৃত্যুর বছর পূর্তির আগেই একদিন নিজের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতি প্রেরণাকে বলে, বিধবা শব্দটি তোমার জন্য নয়। আমি তোমার জীবন থেকে এই শব্দ মুছে দেব। আমরা ভালোবাসার ঘর বাঁধব প্রেরণা।

ঘর! বিস্ফারিত হয় প্রেরণার দু'চোখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পেয়ো না।

প্রকৃতি ভাই আপনি না বলেন এই শহরে জীবনটা চায়ের চামচের সমান।

সমানই তো, অমৃতকে তো মরতেই দেখলে। তুমি, আমি, আমরা খানিকটুকু দৈর্ঘ্য পেয়েছি, এটুকুকে ভরিয়ে তুলব। হারব কেন? খালাআম্মা যখন তখন বলেন, আমার বিধবা মেয়েটা। আমার শুনতে খুব খারাপ লাগে।

আপনি কি আমাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছেন?

আহ প্রেরণা বাজে কথা ভেব না। আমি একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে তোমার জন্য আমৃত্যু অপেক্ষা করব।

মনে আছে, ভুলিনি।

তাহলে তোমার হাতটা বাড়াও, আমি ধরি।

প্রেরণা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকৃতি মৃদু হেসে বলে, তুমি না বাড়ালে আমি ধরব না। আমি তোমাকে জোর করব না প্রেরণা। দেবে?

প্রেরণা ওর হাত বাড়িয়ে দিলে প্রকৃতি সে হাত ধরে বলে, পুরুষের শরীরের অভিজ্ঞতা কি তোমার হয়েছে প্রেরণা?

না, কখনো না।

ও দু'হাতে প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরে। প্রকৃতি দীর্ঘ চুমুতে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, তাহলে সে অভিজ্ঞতা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে কেন, এটাও তো তোমার প্রাপ্য।

ছোট বারান্দার ক্ষুদ্র পরিসরে রাতের আবছা অন্ধকারে রাস্তার লাইটের ক্ষীণ আলোয় প্রেরণা অনুভব করে প্রকৃতির স্পর্শ দিয়ে ওর সামনে ভিন্ন দরজা খুলবে। সে দরজা দিয়ে অন্দরমহলে প্রবেশের প্রাপ্যটুকু ও বুঝে নেবে না কেন?

এর পরে কোনো এক বৃষ্টিমুখর সন্ধ্যায় দুই পরিবারের আনন্দঘন পরিবেশে ওদের বিয়ে হয়। সেদিন প্রকৃতির জ্বর ছিল। তার কিছুদিন আগে থেকেই ওর সামান্য জ্বর হচ্ছিল। ও গুরুত্ব দেয়নি, মাকেও বলেনি। প্যারাসিটামল খেয়ে ভেবেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু বিয়ের সন্ধ্যায় সেটা প্রবল হলো, ও কাউকে কিছু বলল না।

বাসরঘরে প্রথম টের পেল প্রেরণা।

তোমার জ্বর প্রকৃতি? তুমি তো কাউকে বলোনি!

ভাবলাম জ্বর আর কি অসুখ, ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ে পড়ানোর সময় শরীরটা যখন পুড়ছিল ভাবলাম তোমার সঙ্গে অসুখটা ভাগাভাগি করে নেব।

তুমি আমাকে এত ভালোবাসো, এটা আমি আগে বুঝতেই পারিনি।

আমি প্রকাশ না করলে কেমন করে বুঝবে?

আসলেই তুমি একটা জিনিয়াস। কত অনায়াসে নিজের ওপর সব দায় টেনে নাও।

এসো আনন্দ করি। আজ উৎসব।

নিভে যায় ওদের ঘরের আলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির জ্বর কমে না। গায়ে গায়ে লেগেই থাকে। হাসিনা আখতারের বুকে ধস, ভয় ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ-ডাক্তার ও-ডাক্তার দেখানোর পরও কিছুই ধরা পড়ে না।

মাস গড়ায়। শরীর খারাপ হতেই থাকে। প্রকৃতির ধূসর দৃষ্টিতে ছায়া নামে, মনে হয় চোখ তো নয় যেন নিবু নিবু প্রদীপ। ক্লান্ত চেহারায় জীবনের উত্তাপ কমতে থাকে। একদিন বাড়িতে বিস্ফোরিত হয় ডাক্তারের রিপোর্ট, লিউকোমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে প্রকৃতি।

রিপোর্ট হাতে নিয়ে চিৎকার করে কাঁদে হাসিনা আখতার, আর ওরা দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। এক সময় প্রকৃতি প্রেরণাকে বুকে নিয়ে বলে, জীবনের দৈর্ঘ্য আসলেই চায়ের চামচের সমান।

যারা বেঁচে থাকে এটা তাদের জন্যও সত্য।

প্রেরণা কাঁদতে শুরু করলে প্রকৃতি চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, কান্না নয়, যে ক'দিন বাঁচব সেটা জীবনকে বোঝার জন্য সত্যিকার অর্থেই বাঁচব।

তারপর শুরু হলো বেঁচে থাকার সাধনা– আনন্দে, উৎসবে, সঙ্গীতে, সিনেমায়, চিত্রশিল্পে, বইয়ে এবং শুশ্রূষা-পরিচর্যায় প্রেরণা ওকে নতুন ভুবন গড়ে দেয়। হাসিনা আখতার ওর ধৈর্য্য-সহনশীলতা দেখে বলে, মা তুই ছেলেটাকে এত ভালবাসিস! আমার বুকটা ভরে গেছে। আমার কোনো দুঃখ থাকবে না ওর জন্য। ও তোর মতো এমন একটি জীবনসঙ্গী পেয়েছে।

মা, আপনি আমাকে দোয়া করবেন। আমি বিয়ের দুঃখ কি বুঝিনি। প্রকৃতি আমাকে তা বুঝতে দেয়নি। এখন আমি বিয়ের মধ্যে না থাকার জীবনকে মোকাবেলা করব। মা আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

আমি তো আমার কাজ তোকে দিয়ে সংসার থেকে মুক্তি চাই। আর পারব না এই জীবন টানতে।

আমি তো আছি। আমরা একসঙ্গে–

প্রকৃতি আর কথা বলে না। ওর গলা ধরে যায়। যেদিন প্রকৃতি মারা গেল সেদিন বাড়িসুদ্ধ শোকের মাঝে কেউ কেউ জোরে জোরে বলল, মেয়েটা আবার বিধবা হলো।

বিধবা!

শব্দটি শুনে প্রেরণা মাথা তোলে। নিজেই বিড়বিড় করে বলে, বিধবা! এই শব্দটি প্রকৃতির অভিধানে নেই এবং আমারও না। আমার জীবনে প্রকৃতির না থাকাটা সত্য নয়, ও আছে এবং আমার একাকিত্ব নেই। একাকিত্ব বাদ দিয়ে কীভাবে চলতে হয় তা আমি প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছি।

তখন ও প্রবলভাবে কেঁদে উঠলে পাশ থেকে কেউ বলে, আহারে এই বয়সে মেয়েটা আবার বিধবা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবমূর্তি

শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছাড়ে ইলা। মা বলে দিয়েছে, বিয়ে হবে না।

গতকালই মেয়ের চুলের মুঠি ধরে মুখের উপর আঙুল নাড়িয়ে তাহেরুন্নেসা বলেছে, আমি বেঁচে থাকতে ওই ভ্যাগাবন্ডের সাথে তোমার বিয়ে হবে না। তুমি আমার সংসারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাও।

রাগে দপদপিয়ে ইলাকে এক ঝটকায় ফেলে দিলে টেবিলের কোনায় ধাক্কা খেয়ে ওর কপাল কেটে যায়। দরদরিয়ে রক্ত পড়ে। তাহেরুন্নেসা ভ্রুক্ষেপ না করে বেরিয়ে যায়। লীলা আর মিলা মিলে বোনকে টেনে তুলে। মেঝেতে শুইয়েই তুলা দিয়ে ডেটল লাগিয়ে রক্ত বন্ধ করে। তারপর পুরনো কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দেয়। দু'বোনে ধরাধরি করে বিছানায় ওঠায় ইলাকে। বিছানার কোনায় বসে থাকা ইলার প্রিয় বিড়াল মিশি শব্দ করে, মিঁউ।

তিনজনে চমকে ওর দিকে তাকায়। মিশির এই মুহূর্তের ডাকটা একদম অন্যরকম। শব্দ ঘরময় আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয় এবং তিন বোনের বুকের ভেতর সেই আতঙ্ক বরফের মতো জমাট বাঁধতে থাকে। হিম বোধে ওরা আক্রান্ত হয়। ওরা পরস্পরের হাত চেপে ধরে। বিড়ালের মিঁউ শব্দ তখন তাহেরুন্নেসার অগ্নিমূর্তির সঙ্গে লেপ্টে যায়। শব্দ এবং চেহারার এমন যুগল সম্মিলনের দৃশ্যে ইলা বলে, রূপকের এমন একটি সৃষ্টি আছে। ও নাম দিয়েছে ভয়ঙ্করতা ও আতঙ্ক।

লীলা মৃদু হেসে বলে, পটভূমি কি আমাদের এই ঘর?

ফাজলামি করছিস কেন? ছবিটি আমি দেখেছি। ছবিতে আছে একজন নারী, কয়েকটি বাচ্চা ও একটি বেড়াল।

তাহলে তো ছবিটা আমার দেখতে হবে।

আমিও দেখব লীলা আপু। মিলু উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

দেখবি, আগে ইলা আপুর সংসার হোক।

সংসার হবে কি, মা তো রাজি না। তুমি কি বলো ইলা আপু?

ইলা কথা না বলে অন্যদিকে মুখ ঘোরায়। ও বুঝতে পারে যে আতঙ্ক একটু আগে বরফ হয়ে বুকের ভেতর জমছিল সেটা আর নেই। ওই জায়গা দখল করে নিচ্ছে কঠিন পাথর। না শুধু কঠিনই নয়, রহস্যময় পাথর। পুরনোকালে যে পাথরগুলো দিয়ে স্টোনহেঞ্জ নামের স্মৃতিসৌধ বানিয়েছিল প্রাচীনকালের মানুষেরা। বিশাল বিশাল পাথরখণ্ডের কথা পড়ে ইলার খুব সাধ হয়েছিল স্টোনহেঞ্জ দেখার– না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধ নয় স্বপ্ন। কীভাবে যে এমন অলৌকিক রহস্য তৈরি করেছিল মানুষেরা, কেমন করে বিশাল বিশাল পাথরখণ্ড একটার ওপর আর একটা ওঠানো হয়েছিল সে রহস্য এখন পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি। দক্ষিণ ইংল্যান্ডে সলসব্যারি সমভূমি অঞ্চলে কি কোনোদিন যাওয়া হবে ওর? বইয়ে পড়া সেই পাথরগুলোর অস্তিত্ব আজ এই মুহূর্তে নিজের মধ্যে টের পাচ্ছে।

কি ভাবছিস আপু?

বুকটা পাথর হয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত নিবি?

নিতেই হবে।

বিড়ালটা ডাকে, মিঁউ।

তিনজনে হো-হো করে হাসতে থাকে।

ও ইলার বুকের ভেতর ঢোকে। তখন ইলা মিশির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, মা যদি রূপককে আর একদিন ভ্যাগাবন্ড বলে সেদিন কাটাকাটি হবে। রূপক এই বয়সেই শিল্পী হিসেবে নাম করেছে। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। ওদের নিজেদের বাড়ি আছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকলে আমার আর কিছু চাই না। বাকিটা আমার রোজগারে চলবে। আমি কেয়ার করি না। আমার বাবা তো এখনো বাড়ি করতে পারেনি। আমার মায়ের পায়ের নিচে মাটি নেই।

তিন বোনে হো-হো করে হাসতে গিয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায়। হাসি আটকে থাকে ঘরে। বাইরে তাহেরুন্নেসার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

তাহেরুন্নেসার মনে শান্তি নেই। সাতটি ছেলেমেয়ে ওর। সবগুলো ওর বিপক্ষে। সুযোগ পেলে কথা শোনাতে ছাড়ে না। অথচ তিনি তো সারাক্ষণ এই সংসারের জন্য পরিশ্রম করেন। তিনি চান সবাই তাঁর বশে থাকবে– কেউ চোখ গরম করে কথা বলবে না। অক্ষরে অক্ষরে হুকুম পালন করবে। সংসারের ভাবমূর্তিকে বড় করে দেখবে। সংসারের ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না হয় সেটা দেখাই হবে সবার লক্ষ্য। কিন্তু কই তা হচ্ছে? প্রথম ঘটনা ঘটাল ইলা। মেয়েটাকে বশে রাখাই মুশকিল হচ্ছে। তাহেরুন্নেসা রান্নাঘরের হাঁড়িকুড়ি ঝমঝম শব্দে ওঠায়-নামায়, কি করে না করে সে নিজেই বুঝতে পারে না। ইচ্ছে করল ইলার বেড়ালটাকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলতে। সেই উদ্দেশ্যে সে ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। বেড়ালটা তাহেরুন্নেসাকে দেখেই লাফ দিয়ে নেমে খাটের নিচে কোনায় চলে যায়।

তাহেরুন্নেসা চেঁচিয়ে বলে, শয়তানটা আমাকে দেখে পালিয়েছে। আজ দুপুর থেকে ওটার ভাত বন্ধ। কাঁটাকুটোও পাবে না। যে ওটাকে লুকিয়ে ভাত দিবে আমি তারও ভাত বন্ধ করে দেব।

লীলা ফিক করে হেসে বলে, তাহলে তোমার সংসারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে মা। আপুকে মেরে তুমি অলরেডি ভাবমূর্তি নষ্ট করে ফেলেছ।

মোটেই না। তোমাদেরকে বশে রেখে আমি সংসারের ভাবমূর্তি ঠিক রাখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই দুপদাপ পা ফেলে চলে যায় তাহেরুন্নেসা। তিন বোন চুপচাপ বসে থাকে। নিজেদের চারপাশে একটা দৃশ্য শেকল অনুভব করে ওরা সবাই। ভাবে বড় দু'ভাই বাড়ি ফিরলে ব্যাপারটি আরও জটিল হবে। মায়ের সঙ্গে বিরোধ তীব্র হয়ে উঠবে এবং মা কোনো কিছুই শুনবে না। এই সংসারে মা নিজের সিদ্ধান্তের বাইরে কোনোকিছুই মানে না।

ইলা বাড়ি ছাড়ার পরদিন মেয়ের চিঠিটি হাতে পেল তাহেরুন্নেসা। চিঠিটার গোটা অক্ষরগুলোর দিকে দু'চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে থাকে। মনে হয় বিশাল বিশাল পাথরের নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তবু চিঠিটা পড়ে।

মা,

আমি চলে গেলাম। আর কখনো এ বাড়িতে আসব না। এ বিয়ের জন্য তোমার মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি সেটা করতে রাজি নই। রূপকের সঙ্গেই আমার বিয়ে হবে। নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পেরে ভালো লাগছে যে তোমার মতো আমিও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারি। রূপক শিল্পী। অন্য আরও অনেকের চেয়ে ওর রুচিবোধ ভালো, সহনশীল এবং মানবিক। ও কোনোভাবেই তোমার ধারণা অনুযায়ী ভ্যাগাবন্ড নয়। তুমি এই শব্দটি আর ব্যবহার করবে না। তুমি নিজের হাতে তোমার সংসারকে পুড়িয়ে মারছ, শুধু শুধু অন্যদের দোষ দিও না। ভালো থাকো।

ইতি

ইলা।

ইলার চিঠিটা বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটায়। তাহেরুন্নেসা সমানে চিৎকার করতে থাকে। বড় দুই ছেলে সোহেল আর সুমন বাড়িতে নেই। লীলা কলেজে। ছোট তিনজনের স্কুল বন্ধ। ওরা নিজেদের ঘরে ঘাপটি মেরে আছে। সারাক্ষণ খুনসুটি করে সেই মিলাও হিম হয়ে গেছে। আতঙ্ক পুরো বাড়িতে। কাজের মেয়ে হুসনা মার খেয়েও কাঁদতে পারছে না। একবার ওদের ঘরে ঢুকে চোখ ফুটে গেছে। দাঁড়াবার সাহস হয়নি। মিলার মনে হয় মা এতক্ষণ চিৎকার করছিল, এখন আর তা চিৎকার নেই। মা এখন হুংকার দিচ্ছে।

একটু পরে লীলা ফিরে আসে। ঘরে ঢুকেই ও বুঝতে পারে কিছু একটা হয়েছে। প্রায়ই মায়ের মেজাজ এমন খারাপই থাকে। তাই ও মাথা ঘামায় না। ভাই-বোনগুলোর দিকে তাকিয়ে ও ভ্রূ উঁচিয়ে বলে, বিদ্রোহ করতে হবে, বুঝলি? এমন মুখ শুকিয়ে বসে থাকা চলবে না।

বিদ্রোহ কি?

আট বছরের অপুর মিনমিনে কণ্ঠস্বর। লীলা কণ্ঠ চড়িয়ে বলে, প্রতিবাদ।

মায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ?

মায়ের বিরুদ্ধে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুপ চুপ, আস্তে বলো।

লীলা কাঁধের ব্যাগ, হাতের বই-খাতা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে বাথরুমে ঢোকে।

একটু পরে সোহেল ফেরে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সুমনও।

ওরা এখন ছয়জনের পরিপূর্ণ বাহিনী। বড়দের পেয়ে ছোটরা নড়েচড়ে বসে। সোহেল মিলার মাথায় চাটি দিয়ে বলে, ঘটনাটা কি?

ইলা আপু মাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

তাহলে তো এটা মায়ের জন্য একটা বিরাট ইস্যু। সংসারের ভাবমূর্তির জন্য ভয়াবহ হুমকি।

আমরা এখন কি করব?

আমার ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

চুপ। মঙ্গা আক্রান্ত লোকের মতো কথা বললে মা আরও রেগে যাবে। মায়ের ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে। আমাদের ক্ষিধে পাবে কেন, অ্যাঁ?

সোহেল অপুর মাথায় টোকা মেরে বলে, থুতু গিলতে থাক, ক্ষিধে কমে যাবে।

এসব ঘেন্নার কাজ আমি করতে পারব না।

জানিস না এদেশের গরিবরা এভাবেই বেঁচে থাকে।

আমি কি গরিব নাকি?

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে লীলা।

তখন সবাই কানখাড়া করে শোনে বেড়ালটা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

মিশির কি হলো? আপু বেড়ালটাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারত।

ওর চেঁচামেচিতে ছয় ভাই-বোন দরজায় দাঁড়িয়ে দেখে তাহেরুন্নেসা বেড়ালটাকে পা দিয়ে চেপে ধরে আছে। হুসনা ওর গলায় চেন লাগিয়ে বারান্দার কোনায় বেঁধে রাখছে। পায়ের চাপে বেড়ালটার প্রাণান্ত অবস্থা। মরেও যেতে পারত। বাঁধা হয়ে গেলে তাহেরুন্নেসা পা সরিয়ে নিলেও ওটা নড়ে না। নেতিয়ে পড়ে থাকে।

প্রতিদিনই তাহেরুন্নেসা সকাল থেকে ব্যস্ত থাকে। তার নানা কাজ থাকে। সঙ্গে সমানে মুখ চলে। ছেলেমেয়েরা বলাবলি করে, মায়ের ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই। যেটুকু ছুটোছুটি সেটা লোক দেখানো। নিজের ভাবমূর্তি গড়ার চেষ্টা। আসলে দেখাতে চান যে তিনি ভীষণ কাজের মানুষ।

তাহেরুন্নেসা ছেলেমেয়েদের এমন মনোভাবের কথা নানাভাবে টের পান। তাতে তার রাগ আরও বাড়ে। তিনিও কৌশল অবলম্বন করেন। ওদের সামনে বসিয়ে আঙুল উঁচিয়ে বলেন, তোমাদের অনেক বাড় বেড়েছে। আমি কোনো সমালোচনা সহ্য করব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোহেল সাহস করে বলে, সমালোচনা ছাড়া কি গণতন্ত্র হয় মা? তুমি না বলো–

খামোশ। আর একটা কথা বলবে কি তো ভালো হবে না। আমার কথাই শেষ কথা।

তাহলে তো দেখছি তুমি জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্বাস করো না!

এই সংসার কি রাষ্ট্র নাকি যে তুই গণতন্ত্র, জনগণ এসব কথা বলছিস? থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। বদমাশ ছেলে কোথাকার।

তাহেরুন্নেসা ধপধপ করে পা ফেলে চলে যায়। একটু পরে আবার ফিরে এসে বলে, ইলা বাড়ি থেকে চলে গেছে, ভেবেছিস তাতে আমি কিছু কাবু হয়ে গেছি? মোটেই না।

বলতে বলতে তাহেরুন্নেসা চলে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়ে বলেন, আসুক তোদের বাবা। সবাইকে মজা দেখিয়ে ছাড়ব। তাহেরুন্নেসা চলে যেতেই ওরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলে, আমাদের পরিবারের প্রেসিডেন্টের ওপর মায়ের এমন ভরসা কেন বল তো?

কারণ বাবা এই সংসারে চোখ বুজে শ্বাস বন্ধ করে দিনে কাটায়।

সুমনের কথার ভঙ্গিতে সবাই হা-হা করে হাসতে থাকে।

অপু ভয়ে ভয়ে বলে, আমাদের হাসি মা শুনতে পাবে। আস্তে হাস।

সবাই অবাক হয়ে অপুর দিকে তাকায়। পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য ও। কিন্তু বিষয়টা পুরোই বোঝে। মায়ের কর্তৃত্ব কীভাবে ওদের দমিয়ে রেখেছে সেটা ওর ধারণায় এসে গেছে। বলে, বাবাকে তুমি প্রেসিডেন্ট বলো কেন ভাইয়া?

রাষ্ট্রে যেমন প্রেসিডেন্ট থাকে তেমন সংসারেও প্রেসিডেন্ট দরকার হয়, সেজন্য।

লীলা হাসতে হাসতে বলে, বাবা হলো আমাদের সংসারের ডামি প্রেসিডেন্ট।

মায়ের সামনে কথা বলবে কে? বাবার অত সাহস নেই।

তখন দরজায় খটখট শব্দ হয়। শিপু দৌড়ে গিয়ে দরজা খোলে। মূর্তিমতী তাহেরুন্নেসা মোটাসোটা থলথলে চেহারা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, দরজা বন্ধ করেছ কেন তোমরা?

কেউ কোনো কথা বলে না।

তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ, না?

ষড়যন্ত্র!

ষড়যন্ত্রই তো, না হলে দরজা বন্ধ করে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর কি?

মা, মাথা ঠাণ্ডা করো।

আমার মাথা ঠাণ্ডাই আছে।

তুমি একটুও ভেব না মা। ইলা গেছে তো কি হয়েছে, আমরা সবাই তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী বিয়ে করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের নিজেদের পছন্দের কেউ থাকবে না।

সোহেলের কথার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হি-হি করে হাসে।

বুঝেছি এটাও তোমাদের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা। তোমরা অত সহজে আমাকে কাবু করতে পারবে না।

মোটেই আমরা তোমার বিরুদ্ধে কিছুই করব না। তুমি যা বলবে তাই শুনব।

ভাত রেডি। খেতে এসো সবাই।

হুররে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে।

তাহেরুন্নেসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, লঙ্গরখানা?

ইয়ে মানে, ক্ষিধে পেয়েছিল তো। তখন মনে হয়েছিল আমরা মঙ্গার এলাকায় আছি।

তাহেরুন্নেসা নিজেকে সামলাতে পারে না। ঠাসঠাস করে চড় মারে অপুকে। সোহেল ওকে দু'হাতে বেড় দিয়ে ধরার পরও অপুর হাফপ্যান্ট ভিজে যায়। লীলা ওর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়।

কারোই ঠিকমতো খাওয়া হয় না। সবাই ভাত নাড়াচাড়া করে। শুনতে পায় বেড়ালটা অনবরত ডেকে যাচ্ছে। ঠিক স্বাভাবিক ডাকা নয়, কঁকাচ্ছে ওটা। বোঝাই যায় যে একটা কিছু হয়েছে। ওর খারাপ লাগছে, নয়তো ক্ষিধে পেয়েছে, নয়তো ইলা নেই দেখে ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। শিপুই প্রথমে বলে, আমার ভাতগুলো বেড়ালটাকে দিতে চাই।

অপু সঙ্গে সঙ্গে থালা ঠেলে দিয়ে বলে, আমিও খাব না। বেড়ালটাকে দেব।

খবরদার এসব করিস না। আমরা ভাত না খেলে মায়ের সংসারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। মা বলবে আমরা ইচ্ছা করে ডাইনিং টেবিলের শৃংখলা নষ্ট করেছি।

আয়, আমরা আমাদের ভাত খেয়ে শেষ করি।

তখন ওরা দেখতে পায় তাহেরুন্নেসা বেড়ালটাকে কষে একটা লাথি মারেন।

এত মিঁউ মিঁউ কিসের। আমার মেয়েকে শোনাতে চাও যে আমি তোমার ওপর নির্যাতন করছি। ভেবেছ এই করে আমাকে শিক্ষা দেবে? তা হবে না। বলেই আবার একটা লাথি মারেন।

বেড়ালটা করুণ স্বরে ডাকতে থাকে। পুরো বাড়িতে বেড়ালের কান্নার শব্দ চার দেয়ালে গুমরে মরে। চোখ মুছতে থাকে অপু, শিপু, মিলা। শেষ পর্যন্ত দু'লোকমা খেয়ে ভাতের থালা নিয়ে উঠে দাঁড়ায় লীলা। রান্নাঘরে গিয়ে হুসনাকে বলে, মিশির ভাত খাওয়ার বাটিটা দে।

হুসনা চুপিচুপি বলে, খালাআম্মা ওটা ফেলে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো মিশি ভাত খাবে কিসে?

খালাআম্মা ওটাকে আর ভাত দিবে না।

লীলা অদ্ভুত চাউনিতে হুসনার দিকে তাকায়। বলে, তাহলে মিশি আজ থেকে আমার থালায় ভাত খাবে।

আপনি কিসে খাবেন?

কলাপাতায়। আর মনে রাখবি ও আমার ভাত খাবে। আমি যেটুকু খাই তার চেয়ে কম খাব।

খালাআম্মা কিন্তু খুব রাগ করবেন।

তার রাগের আমি ধার ধারি না।

লীলা বেড়ালটার জন্য ভাত মাখিয়ে ওটার পাশে গিয়ে বসে। টেনে তুলে ভাতের থালা সামনে ধরে। বেড়ালটা মাথা ওঠায় না। খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে না। লীলা চেষ্টা করেও একমুঠো ভাত খাওয়াতে পারে না বেড়ালটাকে। শেষে ভাতগুলো ছড়িয়ে দেয় কাকদের উদ্দেশ্যে। তাহেরুন্নেসা বাথরুমে গোসল করছিলেন। বেরিয়ে লীলার কাণ্ড দেখে তার রক্ত মাথায় ওঠে। ছুটে এসে মেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, কি হচ্ছে এসব?

তোমার স্বেচ্ছাচারিতায় পানি ঢালার চেষ্টা করছি।

লীলা! তাহেরুন্নেসা চিৎকার করেন।

এমন করে চেঁচিও না মা। চেঁচালে শরীর খারাপ করবে।

তোমাদের উৎপাতে আমি সংসারটাকে ঠিক রাখতে পারছি না।

আমরা কি করলাম?

ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকাও। দেখো তোমরা প্রত্যেকে ভাত না খেয়ে উঠে গেছ।

আমাদের খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না।

তোমরা একের পর এক সংসারের শৃংখলা নষ্ট করে চলেছ। আমি এত কিছু বরদাস্ত করতে পারছি না।

তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর মা।

উপদেশ দিও না বেয়াদব মেয়ে।

তাহেরুন্নেসা পুনরায় বেড়ালটাকে লাথি মেরে ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের না খাওয়া ভাতের থালাগুলো ছুঁড়ে ফেলতে থাকে। পুরো ঘরে ভাত ছড়িয়ে যায়। তরকারি, ডালের বাটি গড়াতে থাকে।

হুসনা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। কি করবে বুঝতে পারে না। সামনে এগোতে ভয় পায়। লীলা দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, মিশি যদি মরে যায় তাহলে এই সংসারে আগুন জ্বলবে। আমরা বিদ্রোহ করব। ঘরের সব জিনিস একটা একটা করে ভাঙব।

তাহেরুন্নেসা চোখ গোল করে লীলার দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেমেয়েরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর বিরুদ্ধে এমন করে অবস্থান নিতে পারে তা ভাবতেও পারেন না তিনি। ছেলেমেয়েদের জন্য কি না করেছেন! তার পুরস্কার এই! তাহেরুন্নেসার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয়, কান্না পায় না, দুঃখ হয় না, কেন ওরা এমন করছে তাও ভেবে পান না। তাহেরুন্নেসা আত্মসমালোচনা করতে শিখেন নি। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন লীলার ওপর। চড় মেরে, চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলে লাথি দেন। ছুটে আসে অন্য ছেলেমেয়েরা। সোহেল মাকে জড়িয়ে ধরে থামায়। বলে, তোমার কি হয়েছে মা?

আমার কি হবে? আমি তোমাদের শাসন করছি।

শাসন? একে কি শাসন বলে?

তোমরা একটা বেড়ালের জন্য আমাকে অপমান করছ।

একটা নিরীহ প্রাণীর ওপর তুমি অত্যাচার করছ মা। খুব অন্যায়।

তোমরা আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাতে এসো না। তোমাদের জন্য খাটতে খাটতে আমি জীবনপাত করছি। তোমাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নিজে বাজার করি। নিজের হাতে রান্না করি। ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করি। কাপড়-চোপড় ধুই। অসুখে সেবা করি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। আর কি চাও তোমরা?

আমরা তোমার কাছে গণতান্ত্রিক আচরণ চাই। সুশাসন চাই। নিজে সংসারের ভাবমূর্তি নষ্ট করে অন্যের ওপর ভাবমূর্তি নষ্ট করার ধারণা ছাড়তে হবে। তুমি ইলাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছ। তুমি তোমার জেদের কারণে বেড়ালটাকে শাস্তি দিচ্ছ। তুমি সংসারের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রেখে নানা কারণে আমাদের গায়ে হাত তোলো। মানসিক নির্যাতন করো। তুমি এই সংসারের স্বৈরাচারী কর্ত্রী।

লীলা ততক্ষণে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, তুমি সন্ত্রাসীর মতো আচরণ করছ। আসলে তুমি নিজে সন্ত্রাসী এবং সন্ত্রাসীদের গডফাদার। ছোট চাচার বখাটে ছেলেটা তোমার কাছে প্রশ্রয় পায়। খালা, মামা, ফুফু, চাচাদের সংসারেও তোমার সন্ত্রাসের নেটওয়ার্ক আছে। তুমি বাড়ির বড় বউ বলে কেউ তোমার বিরুদ্ধে কথা বলতে সাহস পায় না।

তোরা আমাকে এভাবে বলছিস?

তুমি নিজের আচরণ ভেবে দেখ মা। আমাদের নিরীহ বাবা তোমার ভয়ে ছুটির দিনেও বাড়িতে থাকে না।

আমি এত খারাপ!

তাহেরুন্নেসার হুংকারে ছেলেমেয়েরা চুপ মেরে যায়। যে যার ঘরে গিয়ে ঢোকে। তাহেরুন্নেসা রাগের চোটে হুসনাকে মারে এবং বেড়ালটাকে লাথি দেয়।

বাড়ি ফিরে আসে আজমত আলি। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। বাড়ির বাইরে থেকেই বেড়ালের আর্তনাদ শুনতে পায়। সকালে ইলা তার অফিসে গিয়েছিল। বলেছিল, বাবা আমি জানি তুমি আমার ওপর রাগ করোনি। তুমি তেমন মানুষই নও। বলো বাবা রাগ করেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, মা, একটুও না। তুই তোর পছন্দে জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছিস। আমি খুব খুশি হয়েছি।

বাবা আমি আমার মিশিকে আনতে ভুলে গেছি। তুমি কাল সকালে মিশিকে নিয়ে আসবে। আমি এখান থেকে বেড়ালটা নিয়ে যাব।

আজমল আলি মেয়েকে কথা দিয়েছে। মেয়ের উজ্জ্বল চকচকে চোখ দেখে ওর খুশি যে কত বেশি সেটা বুঝে আজমত আলি নিজেও খুশি হয়। কাল সকালে অফিসে যাওয়ার সময় একটা ব্যাগে করে বেড়ালটা নিয়ে যাবে, এমন চিন্তা নিয়ে আজমত আলি বাড়ি ঢোকে। কিন্তু বারান্দায় বেড়ালটাকে পড়ে থাকতে দেখে তার বুকটা ধক করে ওঠে। ওই শেকল থেকে উদ্ধার করে বেড়ালটা নিয়ে যেতে পারবে তো? হঠাৎ করে নিজের ভেতর অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হয়। বলে, পারতেই হবে। ভয় কিসের? ভয় কাকে?

বিকেলে একটি ব্যাগ কিনে আনে আজমত আলি। তাহেরুন্নেসাকে ভুরু চকে বলে, বেড়ালটা ইলা চেয়েছে। অফিসে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব।

কি বললে?

শুনতে পাওনি? জোরে জোরেই তো বলেছি।

আমরা শুনেছি বাবা।

হ্যাঁ, আমরা সবাই শুনেছি।

অসম্ভব। আমি এটা হতে দেব না।

তো কি করবে?

দেখো কি করি, বলে তাহেরুন্নেসা চলে যায়।

থ্যাঙ্ক ইউ বাবা, তুমি আজ কাজের মতো কাজ করেছ।

ছেলেমেয়েরা বাবাকে ঘিরে ধরে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গে লীলার। ও খেয়াল করে বারান্দায় শেকলটা পড়ে আছে, কিন্তু বেড়ালটা নেই। ওটা কি কোনোভাবে পালিয়ে গেল নাকি? ও চারদিকে খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোথাও পেল না। কলেজে যাওয়ার তাড়া ছিল বলে ও তৈরি হতে গেল।

একে একে সবাই দেখল বেড়ালটা নেই। আজমত আলির মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। বেড়াল না পেলে ইলা মন খারাপ করবে, এ চিন্তায় সে নিজেও বিব্রত বোধ করছে।

শুধু তাহেরুন্নেসা স্বাভাবিক। নাস্তা রেডি করে টেবিলে দিতে ব্যস্ত। সোহেল খেয়াল করে হুসনা মাঝে মাঝে চোখ মুছছে। আচমকা ওর মনে হয় বেড়ালটা বোধহয় মরে গেছে। ও মায়ের মুখোমুখি হয়।

মিশি কই?

তাহেরুন্নেসা প্রথমে কিছু বলে না। পরে বলে, খুঁজে দেখ না কোথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি দেখেছি কোথাও নেই। লীলা দৃঢ় কণ্ঠে বলে।

তখন আজমত আলি রুটি-ভাজির প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, আমি জানতে চাই ইলার বেড়ালটা কোথায়? আমি ওকে কথা দিয়েছি যে বেড়ালটা আজ ওকে দেব।

দেবে? তাহেরুন্নেসার কণ্ঠে বিদ্রূপ।

আমি জানতে চাই বেড়ালটা কোথায়? আজমত আলির নিশ্চুপ কণ্ঠ আজ ভীষণ তীক্ষ্ণ।

এসো দেখবে কোথায়।

তাহেরুন্নেসার সঙ্গে সবাই বাথরুমের পেছনে গিয়ে দেখে বড় গামলার নিচে মিশির মরা দেহটা দিয়ে রাখা হয়েছে।

সোহেল চেঁচিয়ে বলে, এভাবে লাশ গুম করে রেখে তুমি সংসারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে চাও মা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নো ক্লু

এক মধ্যরাতে ফজর আলি পেসাব করতে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলে চাঁদের আলোয় দেখতে পায় তার বাড়ির সামনের ঘাসজমিতে পাহাড়ের মতো কিছু একটা গড়ে উঠেছে।

যে জমির ওপর দিয়ে তাকালে দৃষ্টি ধানক্ষেত পেরিয়ে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে গাছের মাথা ছুঁয়ে পাতানি গ্রামের সীমানায় পৌঁছে যেত, আজ এই মধ্যরাতে সেই দৃষ্টি আর এগোয় না।

ভয়ে ফজর আলির বুক ধুকপুক করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে ওঠে। তবু ও মাথা ঝাঁকিয়ে দ্বিতীয়বার তাকায়।

হ্যাঁ ওটা পাহাড়ই। পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছ গজিয়েছে। অন্ধকারেও ফজর আলি স্পষ্ট দেখতে পায় ভীষণ সবুজ দেখাচ্ছে চারপাশ। সেই সবুজের ফাঁকে একটি অপূর্ব গুহা আছে। গুহাটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিমূঢ় হয়ে যায় ও। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে পেসাব বন্ধ হয়ে যায় ওর। নিজের বয়সের কথা ভুলে এক দৌড়ে ঘরে ফিরে আসে। চিৎকার করে তাহেরন নেসাকে ডাকতে থাকে।

ফজর আলি বউকে খুব ভালোবাসে। তাহেরন নেসাও বত্রিশ বছরের সংসারে স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন সম্পর্ক। সুতরাং এমন একটি আশ্চর্যের খবর তো তাহেরন নেসারই আগে শোনা উচিত। কিন্তু তাহেরন বাতের রোগী। কোমর ব্যথায় অর্ধেক রাত কুঁকিয়ে মাঝরাতের দিকে ঘুমিয়েছে মাত্র। স্বামীর ডাকাডাকিতে সহজে উঠতে পারে না। কিন্তু বড় ছেলে, তার বউ এবং বাকি ছয় ছেলেমেয়ে বিছানা ছেড়ে বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়। মুরাদ আলি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, কি হইছে বাজান?

আল্লাহর কি কুদরত আসো দেখবা।

ফজর আলি থরথর করে কাঁপে। তবুও ছেলেমেয়েদের পাহাড় দেখানোর জন্য বাইরে আসে। ততক্ষণে তাহেরন নেসাও বিছানা ছাড়তে পেরেছে। সবার পেছনে পেছনে সেও উঠোন পেরিয়ে বাইরে আসে। প্রত্যেকে দূর থেকে ফকফকে চাঁদের আলোয় সমতল ভূমিতে পাহাড়ের অবয়ব দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

তোফায়েল তেমন ঘাবড়ায় না। বরং ঘটনার আকস্মিকতা ওর উত্তেজনা বাড়ায়। সাহসের সঙ্গে বলে, বাজান আমি যাই। দেইখা আসি ঘডনাটা কি!

না, যাইবা না। ওর স্ত্রী মাজেদা সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানায়। কি না কি ঘটছে কে জানে। জান লইয়া ফেরত আসতে পারবা কি-না কে জানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহেরন কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। স্ত্রীর কথায় তোফায়েল যে যেতে চাইছে না এতে সে আশ্বস্ত হয়। স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরে। বুঝতে পারে না যে ভয়ে ফজর আলির পেসাব বন্ধ হয়ে গেছে। পেসাবের কথা ও ভুলেও গেছে। এমন অলৌকিক দৃশ্যের সঙ্গে এই অপবিত্র কাজটির কোনো সম্পর্ক নেই, এমন একটি ধারণা ওদের ভাবনায় স্থির হয়ে যেত যদি ওরা সবাই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকত। এই মুহূর্তে ওদের তো স্বাভাবিক অবস্থা নেই। তাহেরনও কোমরের ব্যথার কথা ভুলে যায়। সে সবার উদ্দেশ্যে বলে, চলো আমরা নামাজ পড়ি। না জানি কি গজব নামবে এই গেরামের ওপর।

ক্যান, গজব নামবে ক্যান? ভালোও তো কিছু হইতে পারে।

কি আর অইবে?

মেজ মেয়ে হুসনা বানু নিরাশ কণ্ঠে বলে।

এইবার গেরামে মেলা ধান হইতে পারে। এমুন ধান যে আমাদের জীবনে আর কনুদিন অভাব থাকবে না। অন্য গেরামের মানুষেরা আইসে দেখবে যে আমাগো থালা উপচাইয়া ভাত পইড়া যায়।

হ, থো। আর কথা কওন লাগবো না।

ক্যান, এমুন তো হইতে পারে আমাগো খালবিলে বেসুমার মাছ থাকবে। আমাগো গেরামে কনুদিন মাছের অভাব হইবে না।

হ, থো। মেলা প্যাঁচাল পাড়িস না।

মা ঠিক বলছে। চল আমরা নামাজ পাড়ি। আল্লাহরে ডাকি।

ছেলেমেয়েরা অজু করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফজরের নামাজের সময় হয়নি। তবু ভয়ে-আতঙ্কে সকলে মিলে নামাজ পড়ে।

সে রাতে ফজর আলির পেসাব করতে হয় না। পেসাবের বেগ কমে গেছে। পেসাব নামক কোনো পদার্থ শরীরের ভেতর গড়াতে পারে এমন বোধ ফজর আলির মধ্যে আর কাজ করে না। নামাজ পড়া হয়ে গেলে সে অবসন্ন বোধ করে এবং শুয়ে পড়ে।

সকাল হয়। কিন্তু রোজকার মতো নিয়মমাফিক সকাল হয় না। কখনো কখনো মানুষের চিন্তা, কল্পনা কিংবা অনুধাবনের সীমা বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোনো একটি বিষয় নিয়ে ভাবনার দৌড় থেমে যায়। বুকের ভেতর স্তব্ধ হয়ে যায় বাতাস। সেটা আর প্রবাহিত হওয়ার জায়গা খুঁজে পায় না। ঘুম ভাঙ্গার পরে ঘর থেকে বের হওয়ার শুরু হলেই তেমন ঘটনা ঘটতে থাকে আটাকুটি গ্রামবাসীর মধ্যে।

এক রাতের মধ্যে কেমন করে এমন ঘটনা ঘটল তা মানুষ ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এই মুহূর্তে গ্রামবাসীর বুকের ভেতরে বিস্ময়ের আর কোনো সীমানা নেই। চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে থাকে গুহা দেখতে। বেলা যত বাড়ে মানুষের ভিড়ে আটাকুটি গ্রামের বাতাস তত ভারী হয়ে ওঠে। শুধু আটাকুটি গ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, আশাপাশের অসংখ্য গ্রাম থেকে, এমনকি কাছের মফস্বল শহর থেকেও মানুষ আসে।

মানুষের ভিড়ে পায়ের নিচে চাপা পড়ে শিশু। লাঞ্ছিত হয় কিশোরী, যুবতী মেয়েরা। ধাক্কাধাক্কিতে উল্টে পড়ে বৃদ্ধরা। তারপরও মানুষের চৈতন্যে মৃত্যু বা পরবর্তী শোকের অনুভব নেই। গুহা এবং সেটিকে কেন্দ্র করে কথার ফুলকি হাওয়াই বাজির মতো আটাকুটি গ্রামের আকাশে জ্বলে আর নেভে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। গুহা দেখা শেষ করে বাড়ি ফিরলে তাহেরন নেসা দেখতে পায় ফজর আলি একইভাবে শুয়ে আছে। মানুষটা যে প্রথমে গুহাটা দেখেছিল সে কথা কেউ মনে রাখেনি। তাহেরন নেসার ভীষণ মন খারাপ। অবসন্নও বোধ করে। ভিড়ের মধ্যে ও অনবরত শুনেছে কে প্রথম গুহাটা দেখেছে সেই উত্তেজনার কাহিনী। শুনতে শুনতে ওর কান্না বন্ধ হয়ে গেছে। শ্রবণশক্তি কি বিষয় এ কথা ওর চেতনা থেকে বিলুপ্ত হয়। ও বুঝতে পারে যে ফজর আলি ওকে গুহার বিষয়ে প্রশ্ন করলে ও কিছুই শুনতে পাবে না এবং ও উত্তর দিতে পারবে না। স্বামীর জন্য এবং নিজের জন্যও ভীষণ মায়া হয় ওর। তাহেরন হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘর থেকে এক থালা পান্তা আর মরিচপোড়া নিয়ে আসে ফজর আলির বিছানার পাশে।

আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে বলে, উঠো, ভাত খাওগো বানুর বাপ। বানুর বাপ।

সাড়া নেই ফজর আলির।

তাহেরন আবার ধাক্কা দেয়।

সাড়া নেই।

কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারে ফজর আলি মারা গেছে। ফজর আলির শরীর ঠাণ্ডা এবং শক্ত।

ও আল্লাহরে– তাহেরন বিলাপ শুরু করে। এমুন একলা ঘরে মানুষডা মইরা পইড়া থাকল ক্যান–

বাতাসে ছুটে যায় তাহেরনের বিলাপ, কিন্তু সে বিলাপ কারো কানে পৌঁছে না। বিলাপ করতে করতে তাহেরন অজ্ঞান হয়ে যায়। গ্রামবাসী গুহা নিয়ে উত্তেজিত থাকার কারণে ছেলেমেয়েরা মায়ের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার খুঁজে পায় না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য কোনো রিকশা বা ভ্যান দেখতে পায় না। বাবার দাফনের কি ব্যবস্থা করবে সেটা ভেবে কুলিয়ে ওঠার আগেই ছেলেমেয়েরা দেখতে পায় মায়ের জ্ঞান আর ফিরে আসে না। শোকের মাতম ওঠে বাড়িতে।

ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকে। ওদের কান্নার ধ্বনি বিচলিত করে গ্রামবাসীকে। পুলিশের হাতে একসঙ্গে চারজন একবার গুলিবিদ্ধ হয়ে মরেছিল। সে ঘটনার কারণ ছিল রাজনীতি। কিন্তু এমন শান্ত, সুন্দর জোড়া মৃত্যুর ঘটনা এর আগে কখনো এ গাঁয়ে ঘটেনি। তাই ফজর আলির প্রতিবেশীরা ভয়ে কুঁকড়ে যেতে থাকে। তারপরও তারা কয়েকজন এগিয়ে এসে লাশ দাফনের ব্যবস্থা করে। ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি, অনুনয়-বিনয় এবং শেষ পর্যন্ত পায়ের ওপর হুমড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়ে পড়ার বিষয়টি লাশ দাফন কাজে সহায়তা করে। মানুষকে এমন শক্ত, নিরেট, অনুভূতিহীন হতে এর আগে কখনও আটাকুটি গ্রামে দেখা যায়নি।

রাত শেষ হওয়ার আগেই ছেলেমেয়েরা মা-বাবাহীন ঘরের বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে-বসে থাকে। হুসনা বানু ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, গেরামডা আর গেরাম নাই। গেরামডার গায়ে সাপের খোলস চড়ছে। সামনে আরও খারাপ দিন আছে।

তুমিও মায়ের মতো কথা কইলা বুবু!

কমুই তো। মা ঠিক কথাই কইছে।

না কইবা না। কইলে তুমিও মায়ের মতো মইরা যাইবা।

মরতেই চাই। বাঁচার সাধ আর নাই।

সবাই মিলে গুনগুনিয়ে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে যায়।

পরদিন ঝলমলে রোদ ওঠে। দূর থেকে গুহাটাকে বেশ উজ্জ্বল দেখায়। তবে সে রাতে গুহাটাকে যেমন ফজর আলির বাড়ির খুব কাছে মনে হয়েছিল আসলে তা নয়। গুহা গড়ে উঠেছে আটাকুটি গ্রামের প্রান্তসীমায়। সুতরাং আশপাশের মানুষই এর দখলদার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামের মাতব্বর গোছের একজন ছেলে বলে, বাজান এই গুহাডা মুই দখল দিমু।

দখল দিবি? ক্যামনে?

বেবাক মানুষের গুহা দেখনের হাউস মিটে গেলে রাইতের বেলা গুহার মুখে একডা সাইনবোর্ড দিমু।

সাইনবোর্ড? কি লেখা থাকব?

লিখমু... লিখমু... লিখমু... চানতারা পার্টি অফিস।

গেরামের মানুষ তোমার টেংরি ভাইঙ্গা ফালাইব। এমুন কামও করবা না বাজান।

তুমি কিছু বুঝ না। তুমি এমুন বোকা ক্যান!

খবরদার, খারাপ কথা কবি না। মানুষের চোখের চাউনি দেইখা বুঝতে পারস না যে কামডা সহজ অইব না!

অইব, অইব। সহজ অইব। আমি তোমার কথা হুনুম না। আমার লগে চাঁদ মিয়া মেম্বারের পোলা থাকব। সুরুজ আলি–

চুপ কর ছেমড়া।

ছেলেটি বাপের ধমকে ঘাবড়ায় না। সে শূন্য গুহাটাকে কাজে লাগানোর মতলব আঁটে। একটি গুহাকে ঘর বানিয়ে মতলব হাসিলের জন্য ওর নিঃশ্বাস দুর্গন্ধে ভরে ফেলে। ওর গায়ের চামড়া পুরো হয়ে যায়। মগজের ফাঁকা জায়গা গোবরে ভরে থাকে। ও বিজ্ঞ মানুষের চিন্তায় নিজেকে জাহির করার জন্য ঘর থেকে বের হলে শুনতে পায় আটাকুটি গ্রামবাসীর কিছু কিছু মানুষের স্বপ্নের কথা। ও থমকে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান খাড়া করে রাখে। দাঁত কিড়মিড় করে। রুক্ষ চোয়ালে ফুটিয়ে তোলে দানবের ছবি।

লোকেরা বলাবলি করছে, আমাগো গেরামে সারের গুদাম নাই। চলো গুহাডারে সারের গুদাম বানাই। তাইলে চাষের মৌসুমে আমরা আর সারের জন্যি মারামারি করমু না। আর একজন বলে, আসেন মুষ্ঠিচাইল দিয়া ভইরা রাখি গুহাডারে। তাইলে অভাবী মানুষগুলা না খাইয়া মরব না।

এভাবে মানুষেরা নিজেদের স্বপ্নপূরণের কেন্দ্র করে তোলে গুহাটাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। মানুষের স্বপ্ন আটাকুটি গ্রামের বাতাসে উড়তে থাকে। যারা গুহাটাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ওরা টের পায় যে তাদের বুক ভারী হতে থাকে। প্রয়োজনীয় শ্বাস টানলে সেটা ঠিকমতো ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছায় না। তবু প্রতিদিন স্বপ্ন দেখা মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

একদিন খুব ভোরে তমিজউদ্দিন আর রাহেলা খাতুন কাজের খোঁজে শহরে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। বড় রাস্তায় গিয়ে বাস ধরতে হবে ওদের। ওরা দূর থেকে দেখতে পায় গুহাটা আর ফাঁকা নেই। ওটা কী সব দিয়ে যেন ভরে ফেলা হয়েছে। থমকে দাঁড়ায় রাহেলা খাতুন। তমিজউদ্দিনের হাত টেনে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, দেহো দেহো আমাগো বোধহয় শহরে থাঅন লাগব না।

মনে হয় গুহাডা একডা চাইলের গুদাম অইছে।

লগে ডাইলও আছে।

একখানে নুনও থাকতে পারে।

এক কোনায় শুকনো মরিচ আছে বোধহয়।

আলুও থাকতে পারে, ও আমার রাহেলা। তমিজউদ্দিন আবেগে-উত্তেজনায় থরথর করে ওঠে। খোলা প্রান্তরে হু হু বাতাস ছুটে বেড়ায়। আটাকুটি গ্রাম প্রশান্ত স্নিগ্ধ ভোরের নরম আলোয় ভরে আছে। উত্তেজিত তমিজউদ্দিন রাহেলা খাতুনকে জড়িয়ে ধরে। বলে, অহনই, অহনেই একবার। দোহো ঘাসগুলো কি সোন্দর। বউ আমাগো আর দুঃখ নাই।

ঠিক কইছ, কামের খোঁজে শহরে যাঅন লাগব না।

তাইলে আসো।

দু'জনে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে। কিন্তু ওদের শরীরকেন্দ্রিক আবেগ এগোয় না। ওদের নিঃশ্বাস উত্তপ্ত হয় না, হিম জমাট হয়ে থাকে। গত রাতে যখন উত্তেজনা ভর করেছিল দু'জনকে তখন তো খুব অনায়াসে কাজটি শেষ করতে পেরেছিল। এখন কি হলো! নিজের ওপর রাগ হয় তমিজউদ্দিনের। রাহেলা খাতুন বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, আমাগো শরীলে খারাপ বাতাস লাগছে। গুহাডায় বোধহয় চাইল নাই। চলো দেইখা আসি।

তমিজউদ্দিনের রাগ দপ করে পড়ে যায়। এমন একটি চিন্তা ওর মাথায় আসেনি। দেখতে পায় রাহেলা খাতুনের দৃষ্টিতে কিছু একটা খুঁজে দেখার প্রভা। রাহেলা তমিজউদ্দিনের হাত টান দিয়ে দ্রুত পায়ে গুহার দিকে এগিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুহাটা লাশে পরিপূর্ণ। চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে পড়ে আছে আটাকুটি গ্রামের স্বপ্ন দেখা মানুষেরা। গুলিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। রক্ত থিকথিক করছে। হাজার হাজার মাছির ভনভন শব্দে চারদিকে ভৌতিক নিস্তব্ধতা।

ও মাগো–

ও আল্লাহরে–

দু'জনের আর্তচিৎকারে আবার আটাকুটি গ্রামের প্রান্তর ভরে ওঠে। গুহাটি প্রথম দেখে অবিকল এমন একটি চিৎকার বের হয়েছিল ফজর আলির কণ্ঠস্বর ফুঁড়ে। ভয়ে-আতঙ্কে তমিজউদ্দিন আর রাহেলা খাতুন চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে থাকে। ওরা ক্লান্তিহীন দৌড়ায়। ওরা থামার কথা ভুলে গেছে। ওরা ক্লান্তিহীন চিৎকার করে। ওদের কণ্ঠস্বর যন্ত্রের মতো কাজ করে। আটাকুটি গ্রামবাসী এমন অভাবনীয় দৃশ্য দেখে ওদের পেছনে ছুটতে থাকে। একসময় ছুটতে ছুটতে ওরা থানায় আসে।

স্যার হত্যা।

স্যার খুন।

মেলা মানুষরে খুন করা হইছে।

কে কার আগে কথা বলবে, ঘটনাটি বর্ণনা করবে, সে উত্তেজনায় থানা প্রাঙ্গণ বাজারে পরিণত হয়। মানুষের আহাজারি থানার এসআইকে স্পর্শ করে না। ধমক দিয়ে বলে, খুন-হত্যা থানার দেখার ব্যাপার। তোমরা বাড়ি যাও।

গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে তমিজউদ্দিন আর রাহেলা খাতুন থানায় মামলা দায়ের করে। 'গণহত্যার বিচার চাই, বিচার চাই' স্লোগান দিতে দিতে গ্রামবাসী সাময়িকভাবে নিরস্ত হয়।

দিন গড়ায়, মাস গড়ায়। গ্রামের মানুষ থানায় যাতায়াত করে। ফিরে যায়। বিচারের আশা দেখতে পায় না। মামলার কোনো হদিস নাই। একদিন থানার সামনে অবস্থান নেয় গ্রামবাসী। এসআই প্রচণ্ড ধমক দিয়ে পুলিশদের হুকুম দেয় থানা প্রাঙ্গন থেকে ওদের পিটিয়ে বের করে দিতে। তখন লোকেদের রুদ্র মূর্তি বিশাল আকার ধারণ করে। মারমুখী জনতা স্লোগান তোলে, 'বিচার চাই, বিচার চাই। তদন্ত রিপোর্ট জানতে চাই।'

তখন এসআই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য সামনে আসে।

বলে, আপনারা ধৈর্য্য ধরুন। একবার তদন্ত করা হয়েছে। খুনের কোনো ক্লু পাইনি। তাই কারও বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া যাচ্ছে না।

এতগুলা মানুষরে খুন করা হইল তার কোনো কূল পাওয়া গেল না? মিছা কথা, এক্কেবারে মিছা কথা।

এসআই ক্রূর কণ্ঠে বলে, খবরদার বাজে কথা বলবে না। আমি দরকার হলে আর একজন আইও দিয়ে নতুন করে তদন্ত কাজ চালাব। তবে আমার ধারণা সে ক্ষেত্রেও ফলাফল হবে নো ক্লু।

গ্রামবাসীর বুকের ভেতর শব্দটা গেঁথে যায়। চারদিকে রব ওঠে, নো ক্লু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পা ও গ্রেনেড

সাদা রঙের ওপর বেগুনি লতাপাতা ফুল আঁকা কোটা শাড়িটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয় সামিনা।

বেশ লাগছে দেখতে। মুগ্ধতা তো নিজেকে নিয়ে নিজের উপলব্ধিতেই গাঢ় হওয়া উচিত। অন্যরা কে কি বলে তা নিয়ে আনন্দের রেশ ছড়িয়ে যায়। তার বাইরে গভীর অনুভব তৈরি হয় না। বাতাসের এক ঝটকায় উড়ে যাওয়া কোনো ক্ষুদ্র বস্তুর অনুভব আটকে থাকে কেবল।

সামিনা ছোট ঘরের চারদিকে তাকায়। নিম্নবিত্ত পরিবারের ঘর-ছোটখাটো-প্রায় ছেঁড়া তোষক এবং রঙজ্বলা বিছানার চাদর, দেয়ালে ঝোলানো আয়না, পড়ার টেবিল নিয়ে দুবোনের ঘর। ও তেইশ বছর বয়সের আগেই বুঝে গেছে যে নারীর নিজস্ব ঘর হয় না। জীবনের ক্ষণিকের অনুভব নারীর মতো কে আর উপলব্ধি করে। তারপরও ঘরের জন্য ভীষণ মায়া নারীর। আকস্মিকভাবে মায়ের জন্য প্রবল মমতা অনুভব করে ও। হাঁড়িকুড়ির দিনযাপন। বুঝলই না পৃথিবী কি, বেঁচে থাকা কেমন, জগৎটা কত অন্যরকম হতে পারে একজীবনে। তার মেয়ে হয়ে ও নিজে অনেক কিছু বোঝার চেষ্টা করে। বোঝাটা যেন না হয় সে ব্যাপারেও সচেতন থাকে। এই মুহূর্তে ও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় ঘরের স্বপ্ন। জানে বিষয়টা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ। তারপরও। শাড়ির আঁচলটা বুকের উপর টানাটান করে পিঠের ওপর ব্লাউজের সঙ্গে সেফটিপিন আটকায়। আবারও নিজেকে বলে, বেশ লাগছে দেখতে। পাঁচ কি ছয় ইঞ্চি লম্বা এই শরীরটা নিজের রাখতে পারবে তো? নাকি অন্যের দখলে চলে যাবে? নিজেকে এখন শক্ত করে। ওই ওদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে তো? শুনতে হয় শিসের শব্দ এবং একই সঙ্গে একটি শাণিত বাক্য, শ্যামলা পরী। ওর ফিগারের সঙ্গে এমন গায়ের রঙই তো মানায়।

এসব মন্তব্যে ও ঘুরে দাঁড়ায় না। উপেক্ষা করে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। ও জানে না ওই শিসের পাথরটা খুব ভারী। রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে সমাজ ব্যবস্থা সবই ওই শিসের পক্ষে। আইনও কাজ করে না বহু ক্ষেত্রে। শুধু ওর হাসি পায়। পরী আবার শ্যামলা হয় নাকি? কখনও কেউ তো পরীকে শ্যামলা ভাবে না। ভাবে ফর্সা এবং উজ্জ্বল। সাদা রঙের দাপট তো বোঝা যায় টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে এবং কার্পোরেট বিশ্বের পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ায়। সাদা সাম্রাজাবাদের প্রতিভূ, শ্যামলা নয় কিংবা খুব কালোও না। এসব ও ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় বুঝতে শুরু করেছিল, এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বোঝা আরও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। বিয়ের পাত্রীর বিজ্ঞাপনে ফর্সার আধিক্য শ্যামলা রঙ নিয়ে ন্যাকামি করার সুযোগ দেয় না।

ও মাথা আঁচড়ায় না। মাথাভর্তি লম্বা চুলের খোঁপা বাঁধে। সাদামাটা হাত-খোঁপা।আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে আবার ভাবে, রাস্তার ছেলেদের শিস এবং মন্তব্য গায়ে মাখলে শরীরে ছাতলা পড়বে। ইভ টিজিং নিয়ে যতই চেঁচামেচি হোক না কেন ও নিজের নিয়মে সেটা মোকাবেলা করে। ওর নিজস্ব চিন্তায় জায়গা আছে। ও জানে বয়সের ধর্মে এটা একটি সরল হিসেব। উপেক্ষা করাই ভালো। একে যদি রুখতে হয় তাহলে স্যান্ডেল খুলতে হবে শিস আর মন্তব্যের বাড়াবাড়ি হলে। কাজটা খুব কঠিন নয়। প্রতিরোধের সাহসটাই প্রধান। সামিনা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বাইরে এলে বারান্দায় মায়ের মুখোমুখি হয়। মাকে সব সময় বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত দেখায়। মুখে হাসি নেই। তেলে-ঝোলে শাড়িটা প্রায়ই নোংরা থাকে। নিজের দিকে তাকানোর সময় তার নেই। সামিনা বোঝে সে ইচ্ছেও নেই। বাবার সঙ্গে পারে না। বাবার খেয়াল-খুশির কাছে পরাস্ত নারী। ওকে দেখে মৃদু হেসে বলে, তোকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে।

দেখাবেই তো। আমি যে তোমারই মেয়ে। মামা-খালারা বলে আমি একদম তোমার মতো দেখতে হয়েছি।

আমার মতো? আমি কি জানি যে আমি কেমন?

চলো আয়না দেখি।

আয়না? দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামিনার মা আমিনা বেগম। বলে, আজ ক্লাস আছে?

হ্যাঁ মা।

মিটিং-মিছিল নেই?

আজ নেই।

যাক বাঁচলাম। আমিনা বেগম দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

সামিনা মৃদু হেসে বলে, আমাকে নিয়ে ভেব না। আমি তোমার মতো বাঁচতে পারব না। আমি বেঁচে থাকার জায়গা তৈরি করে বাঁচব। নইলে মরব। কোনোটাতেই আমার ভয় নেই।

আমিনা বেগমের মুখ শুকিয়ে যায়। কথা বাড়ায় না। দৃষ্টি ঘুরিয়ে শূন্য উঠোনে ফেলে। যেন দৃষ্টির শূন্যতা মেয়েটা দেখতে না পায়। সামিনা মায়ের পিঠে হাত রেখে বলে, আসি মা।

আমিনা বেগম ঘাড় নাড়ে। যে ঘাড় নাড়ায় কিছু বোঝা যায় না। ঘাড়টা যন্ত্রের মতো নড়ে। সামিনা জানে মায়ের দুঃখবোধ বুকের গভীরে শক্ত হয়ে আছে। ওটা থেকে মায়ের কোনো মুক্তি নেই। ও উঠোন পেরিয়ে গেট খুলে বের হওয়ার সময় পেছন ফিরে তাকায়। মা ঘরে ঢুকেছে। তবু বারান্দায় অদৃশ্য মায়ের ছায়া লুটিয়ে থাকে। ও জানে মায়ের পোড়খাওয়া জীবনে পুরুষের অদৃশ্য শিস আর মন্তব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। ওর মা সে সবের অর্থ বোঝে না। ঘর আঁকড়ে ধরে জীবনটা পাড়ি দিচ্ছে কেবল।

গলি দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় শুনতে পায় পাড়ার বখাটের মন্তব্য।

মেয়েটার দেমাগ বেশি। রাজনীতি করে তো! রাজনীতি করা মেয়েরা বোঝে বেশি।

সামিনার চোখের সামনে সোনালি আকাশ বর্ণাভ হয়। মনে হয় গলিটা পল্টন ময়দানের জনসমুদ্র হয়ে গেছে। ও তখন নিজেকে আবিষ্কার করে। বড় সংযোগে নিজেকে স্থাপনের আবিষ্কার। নিজেকে বলে, আমার আসমুদ্র হিমাচল চাই।

ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানে অনার্স পড়ে। টিউশনি করে নিজের পড়ার খরচ চালায়, বাবার কাছ থেকে কিছু নেয় না। বাবা তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামী। ওকে যত্ন করে, ভালোবাসে, কিন্তু ওর মনে হয়েছে সামর্থ্য থাকলে নিজেকে অন্যের ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখা নীতিবিরুদ্ধ কাজ। বরং ও মাঝে মাঝে নিজের খরচ বাঁচিয়ে কিছু টাকা ওর পালক বাবাকে দিয়ে আনন্দ পায়। দেখতে পায় লোকটার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোকটা নিজের খুশি আড়াল করে না। করবে কেন, তার কাছে তো টাকাটা মুখ্য নয়, মুখ্য নয় মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া। সে মেয়েটির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজে নিয়েছিল এবং কোনরকম অবহেলা না করে দায়িত্ব পালন করেছে। বরং মেয়েকে খুশি করার জন্য বলে, তোর উপার্জন মা? আহা রে গরিব বাপকে সাহায্য করার জন্য তোর কষ্ট দেখে আমার চোখে পানি আসে।

আমার কোনো কষ্ট হয় না বাবা।

হয়, হয়। তুই আমাকে বুঝতে দিস না।

অথচ এই একই লোক নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে না। কোথায় যেন দূরত্ব তৈরি করে রাখে। সে দূরত্বের স্বরূপ সামিনা ধরতে পারে না। বেশি ভাবলে মাথা এলোমেলো হয়ে যায়।

এখনও তো প্রেমে পড়েনি। যে দু'একজন কাছে ভিড়তে চেয়েছিল তাদের ও সুযোগ দেয়নি। তাই পুরুষ চেনা শুরু হয়নি। কেমন করে বুঝবে যে কোন ফাঁকে কত জল গড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের জানালা দিয়ে দ্রুত সরে যায় দালানকোঠা, দোকানপাট, গাছ-গাছালি, মানুষ আর মানুষ। দৃশ্যটি অলৌকিক মনে হয় কখনো। কারণ ছোটাটা সত্যি হয়ে ওঠে। থামা নিষ্ক্রিয়। পাশে বসে থাকা মেয়েটি ওর দু'বছরের ছোট। ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে কেবল। বলে, সামিনা আপা আপনার নোটগুলো আমাকে দেবেন?

নোট? আমি তো নোট করি না।

নোট করেন না?

একদমই না। আমি মূল বই পড়ি। তারপর পরীক্ষা দেই।

বাব্বা, আপনিতো ভীষণ সাহসী! আমি নোট মুখস্থ না করে পরীক্ষার হলে যেতে পারব না।

সামিনা মৃদু হেসে বলে, দেখো দেখো কি সুন্দর একটা দৃশ্য!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস, আমি দেখতে পেলাম না। কেমন ছিল সেই সুন্দর দৃশ্য?

ওই দৃশ্য বলার না, শুধুই নিজের চোখে দেখার।

আমি আপনার মতো করে দেখতে শিখব সামিনা আপু।

সামিনা শব্দ করে হাসে। আশপাশের ছেলেমেয়েরা ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখে। ও বিব্রত হয় না। হাসতে থাকে। ছেলেমেয়েদের কৌতূহলী দৃষ্টি ওকে ঘিরে ধরে। ওর মনে হয় ওর পেছনে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে। ও একটি বিশাল মিছিলের নেতৃত্বে আছে। অধিকার আদায়ের লড়াই। গুমগুম শব্দটা আকাশ-পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। বাসের চাকার ঘর্ঘর শব্দ সেই ধ্বনিকে ছাপিয়ে বড় হতে পারছে না। পুরো বাস আশ্চর্য নিশ্চুপ। কারও মুখে কথা নেই। এক সময় ও কোলের ওপর রাখা বইয়ের পাতা ওল্টায়। সাঁই সাঁই সরে যায় ধান ক্ষেত, জলাভূমি, কারখানার দালান কিংবা বিলবোর্ড। ও প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়া মেয়েটির থুতনি নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে, রাজনীতির অর্থ নিজের অধিকার বোঝা এবং সমাজকে চেনা। একই সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থাকেও। রাষ্ট্র গণতন্ত্রের চর্চা না করলে জনগণের মিত্র হতে পারে না। আর যে রাষ্ট্র জনগণকে উপেক্ষা করে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয় সে রাষ্ট্র জনগণের শত্রু।

সামিনার কথা শুনে ছেলেমেয়েরা নড়েচড়ে বসে। প্রত্যেকের চোখ ফেরানো থাকে ওর মুখের দিকে। সামিনা হাসতে হাসতে বলে, আমরা এসে গেলাম। তখন প্রথম বর্ষে পড়া মেয়েটি ওর হাত চেপে ধরে বলে, বোমা কি সামিনা আপু? হো-হো করে হেসে ওঠে বাসের ভেতরে বসে থাকা ছেলেমেয়েরা। কে যেন ব্যঙ্গের স্বরে বলে, বোমা বোঝ না কচি খুকু?

তুমি বোমা খেতে চাইলে তোমাকে আমরা বোমা খাইয়ে দেব। তখন বুঝবে বোমা কি!

আবার হাসির তোড়ে ভেসে যায় বাসের পেট। মেয়েটি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, আমি জানতে চেয়েছি যে বোমা কীভাবে বানায়।

এসো। নামতে হবে।

সামিনা ওর হাত ধরে। বাসটা গেটের সামনে সশব্দে থামলে ছেলেমেয়েরা হুড়মুড়িয়ে নামে। ছোট মেয়েটি বিড়বিড় করে বলে, এদের কোনো ধৈর্য নেই। এরা আচরণ শেখেনি।

সামিনা ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখে।

তোমার নাম কি?

রোদেলা।

বোমার কথা মনে এলো কেন?

আসবে না কেন?

বোমা খেতে হবে বলে?

হ্যাঁ।

মেয়েটি দ্রুত পায়ে চলে যায়। ওর লম্বা বেণী পিঠের ওপর দুলতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামিনার চারপাশে আরও অনেকে জড়ো হয়। ওরা কথা বলতে বলতে এগোয়।

রাষ্ট্রের নানা অপরাধ ওর কাছে স্পষ্ট হয় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াঘেরা পথে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে হেঁটে যাওয়ার সময় শুনতে পায় ছেলেরা তারস্বরে চেঁচিয়ে বলছে, যুদ্ধটা শেষ হয়নি। আর একটি যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

যুদ্ধ কি? শান্তা ব্যঙ্গ করে। ওর ধারালো কণ্ঠে হিসহিস ধ্বনি।

যুদ্ধ কি? জুবায়েরও একই কণ্ঠে স্তব্ধ করে দেয় সময়।

আর সামিনা সময়ের টুটি চেপে ধরে বলে, যুদ্ধ হলো বোমা আর গোলার মহোৎসব। মানুষের রক্ত আর জীবন এবং সবশেষে সিজ ফায়ার। বিরতির পরে আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি। মাঝের সময়টুকুতে শিশুদের বেড়ে ওঠা দেখা। একদল মানুষের কালো টাকা বানানোর মেশিনে কয়লা গুঁজে দিয়ে অপলক সে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে পুড়ে মরার জন্য নিজেদের ডানা গজাতে দেখা।

সামিনার কথা বন্ধ হলে হা-হা করে হাসতে থাকে ছেলেমেয়ের দল। গাছের ফাঁকে বাতাসের সরসর শব্দ ওঠে। কারা যেন প্রেতাত্মা কণ্ঠে বলছে, দারুণ রঙধনু সময় আমাদের চারদিকে। এত রঙ আমরা কখনো দেখিনি। আগুনের এমন অপরূপ শিখাও।

তখন ওরা শুনতে পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে অদ্ভুত ঘন্টাধ্বনি। কিছুতেই থামে না সে শব্দ। এ কিসের সংকেত? থামে না কেন? চারদিকে ছুটোছুটি। সব ছেলেমেয়েরা ক্লাসরুম ছেড়ে বাইরে চলে এসেছে। শিক্ষকরাও। যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি গাছের পাতা ঘন্টা পেটাচ্ছে। ভবনের ইটগুলো ঘন্টা হয়েছে। ঝিলে ভেসে থাকা পাখির ঝাঁক, পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, পিঁপড়ে ঘন্টা হয়ে গেছে। চারদিকে অদ্ভুত শব্দে বিমূঢ় মানুষেরা স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। সামিনা বিড়বিড় করে বলে, আমাদের জীবনে একটা কিছু ঘটবে। আমাদের পাপে ডুবে গেছে দেশ। পরিত্রাণের জন্য আবার যুদ্ধ।

বিকেলে বাড়ি ফিরলে আমিনা বেগম ভ্রু কুঁচকে তাকায় ওর দিকে। বলে, কি হয়েছে মা?

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছেলে খুন হয়েছে।

খুন তো হামেশাই হচ্ছে। তোর মন খারাপ কেন?

তোমার খারাপ লাগছে না মা?

আমিনা বেগম চুপ করে থাকে। মেয়ের ঝাঁঝালো কণ্ঠ টের পায়। কিন্তু তারপরও খুনের ঘটনা তাকে তেমন তাড়িত করে না। হরহামেশার ঘটনায় উতলা হওয়ার কি আছে।

চা খাবি?

না। চিৎকার করে না বলে সামিনা নিজের ঘরে ঢোকে। ছেলেটি ওরই দলের ছেলে। মৃত্যুটা ওর কাছে সহজ নয়। আমিনা বেগম পিছে পিছে এসে ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। সামিনার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। দু'হাতে চোখ মুছে বলে, কিছু বলবে?

আজ তোর বাবার মৃত্যুবার্ষিকী।

আমার মনে আছে মা।

মানুষটার কবরটাও এদেশে নেই।

বাবা মারা যাওয়ার সময় আমার বয়স ছিল তোমার পেটে ছয় মাস। বাবা এদেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ মুক্তিযোদ্ধা।

আমিনা বেগম দরজা ছেড়ে সরে যায়। সামিনা জানে এই দিনটি ওর মায়ের বিশেষ স্মৃতি। ওরা দু'জন ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ এ দিনের খবর জানে না। সামিনা নিজের বাক্স খুলে একটি পুরনো ছবি কাপড়ের ওপর রেখে ব্যাগ থেকে কয়েকটা বকুল ফুল বের করে ছবিটা ঢেকে দেয়। তারপর বাক্সের ডালা বন্ধ করে। ভারতের কোন জায়গায় যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে ওর বাবা সে খবর ওর পাওয়া হয়নি। বাবার জন্য এখন আর ওর কান্না নেই। ও শুনতে পায় রান্নাঘরে ভাইবোনদের হৈচৈ। আমিনা বেগম ছেলেমেয়েদের খাবার দিতে ব্যস্ত। একটু পরেই বকুল ফুলের মৃদু গন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে যায়। সামিনা বড় করে শ্বাস নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়।

সে সময় কলেজ থেকে ফেরে রুবিনা। দু'বোন পরস্পরের দিকে তাকায়। রুবিনা হাতের মুঠি খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, আমিও তোমার শহীদ বাবার জন্য একমুঠো বকুল এনেছি। এবারও বুঝি তুমি ছবিটা বাক্সে রেখেই ফুল দিয়েছ?

বলতে বলতে রুবিনা বাক্সের ডালা খোলে। ছবিটা বের করে দু'বোনের পড়ার টেবিলের ওপর রাখে।

এখন থেকে ছবিটা এখানে থাকবে। যদিও আমি জানি আমার বাবা পছন্দ করে না। আর আমার বাবার ভয়ে তুমি তোমার শহীদ বাবাকে আড়াল করে রাখো।

সামিনা কথা বলতে পারে না। রুবিনার আচরণ ওকে হতবাক করে দেয়। কবে রুবিনা এত বড় হয়ে গেল!

হাঁ করে দেখছ কি? এখন থেকে ছবিটা এখানে থাকবে। আমি স্টুডিওতে নিয়ে এর একটি বড় সাইজ করে বাঁধিয়ে নিয়ে আসব। আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কি জানো, আমিও যদি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে হতাম!

রুবিনা!

দু'বোন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে। দু'বোনের জড়াজড়ির মধ্যে যুদ্ধের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যে যুদ্ধ ওরা দু'জনে কেউই দেখেনি। সামিনার মনে হয় রুবিনার রাজনীতি অনেক শক্ত। অনেক জোরালো। রুবিনা মিছিলে না গিয়েও রাজনীতি বোঝে। আজ থেকে এই বাড়ির প্রতিপক্ষের সাথে রুবিনার লড়াই।

সামিনা যে পারিবারিক শান্তির ভয়ে বাবাকে বুকের ভেতরে পুরে রেখেছিল তার এমন প্রকাশ্য হয়ে ওঠাটাই তো সবচেয়ে ন্যায্য পাওনা ছিল। এতদিন হয়নি। এবার হয়েছে। একজন রুবিনা দায়িত্বটা কাঁধে নিয়েছে। লড়াইটা এখন ওর নিজেরও এবং ওর মায়েরও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে লড়াইটা বেশ জমে উঠেছে। রুবিনা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। অন্য ভাইবোনেরা রুবিনার পক্ষে। বাবা একা। তর্জন-গর্জন সার। কেউ পাত্তা দেয় না। আমিনা বেগম একদম চুপচাপ। নির্বাক হয়ে আছে। সামিনা বেশ ফুর্তিতে আছে। এত বড় একটা বিজয় দেখা হবে এই জীবনে এই স্বপ্ন নিয়েই তো ওর রাজনীতি। সামনে পল্টনে জনসভা। শুক্রবার বিকেলে।

সেদিন বিকেলে সভায় যাওয়ার আগে মুশফিক ওর পথ আটকায়। সামিনা বুঝতে পারে মুশফিক আশপাশে কোথও ছিল। ওর অপেক্ষায়। একটু দ্রুত কণ্ঠেই ও বলে, সামিনা তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

এখন যে সময় নেই। জরুরি তাড়া।

জানি। আমিও তোমার সঙ্গে জনসভায় যাব।

আমি তো মিছিল নিয়ে যাব।

আমি ওই মিছিলে থাকব।

সামিনা বুঝতে পারে মুশফিক ছাড়বে না। ও বুঝতে পারে মুশফিক কি বলতে চায়। মুশফিকের দৃষ্টিতে সোনালি আকাশ। ওখানে স্বপ্ন এবং ভালোবাসার রঙ আছে। কেন মুশফিক আজকের দিনটি বেছে নিল? ওর নিজেরও তো প্রস্তুতি আছে মুশফিকের জন্য। ও মুশফিককে হ্যাঁ বলবে। বাবার ছবির সামনে শুকিয়ে যাওয়া দুটি বকুল এনে হাতে দিয়ে বলবে, এটা আমার ভালোবাসা। আর একদিন হবে। আজ সে সময় নেই।

পল্টনে জনসমুদ্র। মাথার ওপর গনগনে সূর্য। প্রবল রোদ। মুশফিক ঈগলের মতো আকাশে হারিয়েছে। সামিনা ওর খোঁজ রাখতে পারেনি। তখন নেতাদের উদ্দীপক বক্তৃতা হচ্ছে। ও ওর দল নিয়ে মঞ্চের কাছাকাছি বসেছে। কতটা সময় চলে গেছে ও জানে না। ওর ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে। যার যার হাতে পানির বোতল ছিল তা শেষ। অকস্মাৎ মনে হয় পানির পিপাসা নয়, আসলে ও মুশফিককে খুঁজছে। মুশফিক কাছে থাকলে এই জনসমুদ্রে আস্তে করে বলতে পারত, আমি তোমার হৃদয়টা দেখতে পাচ্ছি। তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি।

তখন প্রচণ্ড শব্দে জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরিত হয়। কিছু বোঝার আগেই আর একটি। সামিনার একবার মনে হয় কেউ ওকে উপরে উঠিয়ে ফেলল। মানুষের আর্তনাদ শুনতে শুনতে ও দেখতে পায় ওর শাড়ি রক্তে ভেসে গেছে। ও নড়তে পারছে না। ওর কোনো অনুভূতি নেই। পায়ের দিকটা কেমন শূন্য মনে হচ্ছে। ও'দুহাতে শাড়ি টেনে ধরে চেঁচিয়ে বলে, আমার পা কোথায় গেল জুলিয়া। আমার দুই পা-ই উড়ে গেছে। ওর আর কিছু মনে থাকে না। ওর সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার আগে ও প্রাণপণে অদেখা বাবার মুখ স্মরণ করার চেষ্টা করে। এত বছর ধরে ও নানাভাবে বাবার চেহারা কল্পনা করেছে। মা ওকে বলেছিল, একাত্তর সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে রণক্ষেত্রে গ্রেনেড বিস্ফোরণে ওরা বাবার দু'পা উড়ে গিয়েছিল। প্রবল রক্তক্ষরণে...। বুঁজে আসে সামিনার চোখ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মইরম জানে না ধর্ষণ কি

জসিম যেদিন ওকে ঢেঁকিঘরে কাজটা করল তখনই ওর মনে হয়েছিল, মরণ।

ভালোবাসার রেশ জেগে ওঠার আগেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যায়। ও তেমন করে কিছু উপভোগ করে না। রবং ওর ভেতরে ক্রোধ জন্মায়। শুধু বুঝতে পারে জসিম ওকে জোর করেছে। তা জোর তো ও করতেই পারে, জসিম যে ওকে ভালোবাসে, নিজেকে এভাবে সান্ত্বনা দেয় ও। কিন্তু ভেবে পায় না 'মরণ' শব্দটি কেন ওর মাথায় এলো। কত দিন যায় শব্দটি ও মাথা থেকে তাড়াতে পারে না। জসিমকে ওর ভাবনার কথাটি জানালে জসিম বলে, আমি তো তরে ভালোবাসি। বাসি না মইরি?

মইরম মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত দেয়। মুখে কিছু বলে না। মুখে কিছু বলতে ওর ইচ্ছে হয় না। ভাবলে হাসি পায়। গা ঘিনঘিন করে। মনে হয় শরীরে কোনো লোমকূপ নেই, ওগুলো সব পোকা। ধুত, এটা কি ভালোবাসা। ভালোবাসা বোঝার আগেই ভালোবাসার ব্যাপারটি কেমন জানি হয়ে গেল। কি হয়ে গেল এর কোনো ব্যাখ্যা আর মইরম করতে পারে না। ফলে ওর মুখ ভরে থুতু জমে। সেই থুতু ও চারদিকে ছিটাতে ছিটাতে অনুভব করে ওর শরীরটা আর ওর নেই- ওটা জসিমের হয়ে গেছে। ওকে কেউ জসিম করে ডাকলে ও সহজে উত্তর দিয়ে দেবে। বলবে, ডাকেন ক্যান? আমি তো অহন চা বানাই। চায়ের লগে দুধ মিশাই। চিনি মিশাই।

পরক্ষণে ও থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভাবে, ওর শরীরটাও চা। জসিম ওকে চায়ের মতো একটু একটু করে খেয়েছে। জসিম যতক্ষণ খেয়েছিল, ততক্ষণ ও চায়ের মত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। ওর শরীরটা যদি কাপ হয় তাহলে সেই কাপের তলানীতে জমেছিল–। ও বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নিজের দিকে তাকায়। তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকে। ওর ভীষণ কান্না পায়।

খবরটা প্রথমে চাউর করে জসিম।

গাঁয়ের বসতি এবং বাজারের মাঝামাঝি যে বিশাল বটগাছটা দিন-রাত ডালপালা বিস্তার করছে তার মোটা শেকড়গুলোকে কেন্দ্র করে ও একটি চায়ের দোকান খুলেছে। বেশ কষ্ট হয়েছে দোকনটা গড়তে। ধারদেনা হয়েছে, এর-ওর সঙ্গে দেন-দরবার করতে হয়েছে, বিভিন্ন জনের বাড়ি থেকে ভাঙাচোরা মোড়া বা চায়ের পাতিল, কাপ জোগাড় করতে হয়েছে। এমনকি দুটো পিঁড়িও কারো কারো কাছ থেকে নিয়েছে। নসিরণ খালা তো তার দুটো কুপির একটি দিয়েছে। বলেছে, মাঝে মাঝে কুপিতে কেরোসিন ভরে দেবে। মানুষের ভালোবাসা পেয়ে ও ভীষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি। একদম নিঃস্ব অবস্থা থেকে যে জায়গাটি জমিয়ে তুলতে পেরেছে এটাইবা কে পারে! ইট দিয়ে চুলো বানিয়েছে। শুকনো কাঠে একটু কেরোসিন ঢেলে গুঁজে দিলে দাউদাউ জ্বলে চুলো। চা বানানো হয়। চারপাশে মোড়া আর জলচৌকি পাতা আছে। বসার ব্যবস্থা একটুই। তাছাড়া বটের শেকড়-বাকড়গুলোয় বসতে বেশি পছন্দ করে জোয়ান ছেলেরা। ওরা অনায়াসে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে পারে। ওদের পিঠে ব্যথা লাগে না, যেন শেকড়গুলো ওদের পিঠের নিচে সমতল তক্তা। কেউ কেউ উপুড় হয়ে গালে হাত দিয়েও সময় কাটায়। আর একদম দিনমজুর যারা ওরা আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইটের ওপর বসে পা মেলে দেয়। লুঙ্গির কোচড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে ভালোবাসে ওরা। গাঁয়ের লোকে জসিমের বুদ্ধির প্রশংসা করে বলে, পোলাডা কইরা খাইতে শিখছে।

অন্য একজন বলে, বোধহয় জাউরা পোলা হইবো। হের লাইগা এত বুদ্ধি। অন্যজন, ঠিকই কইছে। জাউরা না অইলে বাপ-মায়ের ঠিকানা নাই ক্যান? বাজারে ঘুইরা খুদকুঁড়া খায়।

হা-হা করে হাসে একদল মানুষ। জসিম এসব কথা শোনে, কিন্তু গায়ে মাখে না। ও নিজেও জানে না বাপ-মায়ের কথা। কবে এতিম হয়েছে এমন কথা কেউ ওকে বলে না। কবে মারা গেছে তাও জানে না। এসব নিয়ে ও আর মাথা ঘামায় না। বেঁচে আছে এটাই তো সবচেয়ে বড় আনন্দ।

সেদিন জসিম যখন খবরটা বলে দশ-বারো জন মানুষ চায়ের কাপ হাতে নিয়েছে মাত্র। তখন বিকেলের রোদ বটের পাতার ফাঁকফোকর গলিয়ে বেড়াহীন চা-ঘরের ভেতরে গলতে শুরু করেছে। কারও কারও মুখের ওপর রোদের ছায়া নেতিয়েছে, বেশ দেখাচ্ছে ওদের। রোদ ওদের ক্লান্তি ঘুচিয়ে সতেজ করেছে। রোদের চৌকো ছায়া মাটিতেও গড়াচ্ছে। যেন কোনো কিশোরী আলতো হাতে আলপনা এঁকেছে বটের মূলে। জসিমের দাড়ি- গোঁফহীন মুখে রোদ লাগেনি। বটের একটি ঝাঁকড়া ডাল ওর মুখটা রোদ থেকে আড়াল করে রেখেছে। ওর চ্যাপ্টা-থ্যাবড়া মুখটার জন্য বটগাছের আলাদা মায়া আছে বলে মনে হয়। জসিম একে একে সবার মুখের দিকে তাকায়। তারপর দৃষ্টিটা সামনে ঝুলে থাকা বটগাছের কচি পাতার ওপর নিবদ্ধ করে বলে, সত্তর বছেরের নূরালী হাওলাদার সতেরো বছরের মইরমরে গর্ভবতী কইরেছে।

উপস্থিত সকলে প্রথমে হকচকিয়ে যায়। ওদের হাতে ধরা চায়ের কাপ ঠোঁট পর্যন্ত ওঠে না। যারা খানিকটুকু উঠিয়েছিল তারা সেটা আবার নিচে নামিয়ে আনে। তারপর কেউ একজন খ্যাঁক করে হাসে। যেন এমন একটি হাসি হাসবে বলে সে জন্মের পর থেকে অপেক্ষা করেছিল। সবার দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ে। সবাই অনুভব করে লোটির চেহারায় শয়তানের হাসি ফুটে উঠেছে। ও গাঁয়ের হামেদ মোললা। হাটে দালালি করে। গরুর দালাল। হেসে ওঠার পরে হামেদ মোললা মুখটি অন্যদিকে ঘোরায়, যেন নিজেকে এভাবে আড়াল করলে হাসির কোনো কারণ ওকে দেখাতে হবে না। কিন্তু কেউ ওর দিকে তাকায় না। ওকে গুরুত্ব দেয়ার কিছু আছে বলে মনে করে না। সকলেই বুঝে যায় যে কোনো কোনো মানুষ বিকৃত আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেতে ভালোবাসে। হামেদ মোললা মুখ বাঁকিয়ে বলে, তুই খবরটা পাইছস কোনহান থাইকা জসিম্যা?

জসিমের ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। ও নিজেকে আড়াল করে রেখেই বলে, আমি জানতি পারি। জানার কত পথঘাট আছে। ওর ঠোঁট ওল্টানোর ভঙ্গি, হাত নাড়া, চোখের পলক ফেলা ইত্যাদি অনেক কিছুর মধ্যে রহস্যের অনুভব গাঢ় হয় বলে কেউ ওকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করে না। তবে ওর জেঠামিতে বয়স্করা বিরক্ত হয়। বিরক্তি কাটানোর জন্য সবাই একসঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দেয়। জসিম জোরে হাসতে হাসতে বলে, গিয়া দ্যাহেন মইরম অহন বমি করতাছে। কিছু খাইবার পারতাছে না। ওর মা অহন মাইয়ারে লইয়া দিশেহারা। একলা মাইয়ামানুষ কত কিছু যে একলা একলা সামলাইতাছে। আহারে!

একজন রাগত স্বরে বলে, মইরম কি তোর মাগ যে তুই সব খবর একলাই পাইতাছস? গাঁয়ের মানুষ আর কেউ কিছু জানে না। ছ্যামড়াটা বেশি ফাজিল।

জসিম আর কথা বাড়ায় না। বুঝে যায় যে কথা বড়ালে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের হবে। নিজেকে আড়াল করার জন্য বিদ্রুপের খ্যাঁকখ্যাঁক হাসিতে ভরিয়ে তোলে চায়ের আসর। যেন হাসির ওপর রোদের ছিনাল স্পর্শ লেগেছে, তাই হাসি তরঙ্গের মতো দুলছে। এই মুহূর্তে হাসি জীবিত কোনো প্রাণী কিংবা একটি বস্তু যার ভৌতিক অবয়ব ছমছম করে দেয় বটগাছের তলা। কেউ বিষণ্ন হয়ে জায়গা ছেড়ে চলে যায়। কারণ তারা খুব কাছ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা দেখছে মা-মেয়ের। শুধু যুবকেরা গাছের শেকড়ে হেলান দিয়ে জসিমকে বলে, আমরা জানি তোর সাতে মইরমের পিরিত আছে। তয় মাইয়াডা বোকা। মাথডা খোলাসা না।

জসিম চায়ের কাপগুলো বালতির পানিতে ডোবাতে ডোবাতে বলে, মিছা কতা না। ঠিকই বলতাছো তোমরা। মাইয়াডা একডা মাল।

আবার সেই খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি। তবে এবার সেই হাসির সঙ্গে খানিকটুকু পরিতৃপ্তি যুক্ত হয়।

এবার কুরবানের তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা, তাইলে বুড়াডা মইরমরে পায় ক্যামনে?

তুই কি ছাগল!

সবই ঈশ্বরের লীলা।

জসিম নির্বিকার উত্তর দেয়। ভঙ্গিতে আবার সেই রহস্যের প্রলেপ। ছেলেরা ওকে এমন অচেনা হয়ে উঠতে কখনো দেখেনি। যে ছেলে জীবনে কোনো দিন স্কুলে যায়নি। তার আচরণ একজন শিক্ষিত মানুষের মতো বলে ওরা নিজেরা বিপন্ন বোধ করে। জসিমের ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকিয়ে, যুবকরা অবাক হয়। তারপর ওরা আবার বলে, মইরমের সাতে কত দিন ধইরা ভাবসাব চালাইতাছস?

মাস চারেক হইতে পারে।

তাইলে তো হিসাব মিলা যায়।

এবার যুবকেরা খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে, শিস দেয়। জসিমের মুখের ওপর শেষ বিকেলের আলোর ছায়া। পাতার ফাঁক-ফোকরে দিনের আলো বরফি কাটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহারে কি সুন্দর এই গেরামটা! সবার ভাবনার ভেতরে বিষণ্নতা ঘনিয়ে ওঠে। বিষণ্নতা জীবনের অন্য নাম হয়ে ওদেরকে নিজেদের শরীরের মুখোমুখি করে। এই মুহূর্তে শরীরের তাগিদ রহস্যের অতীত অন্য কিছু। জসিম চায়ের দোকান গোটাতে থাকে।

দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে।

তারপরও সেই ঝিমধরা আলোতে জসিমের দু'চোখ জ্বলে উঠতে দেখে ওরা। যেন চোখজোড়া কোনো বাতিঘর বুঝি। কাউকে আলো দেখাচ্ছে। যুবকরা একসঙ্গে মনে মনে ওকে গালি দেয়, জাউরা। একজন মরিয়া হয়ে বলে, তুই মইরমরে বিয়া করবি না?

করুম। করুম না কেন? মইরমরে ছাড়া তো আর কাউরে বিয়াই করতে পারুম না।

যুবকেরা ওর উত্তর শুনে ভিমরি খায়। বটতলায় অন্ধকার নেমে এলে জসিম কেরোসিনের কুপি জ্বালায়। দমকা বাতাসে কুপিটা নিভে যায়। ও আবার সেটা জ্বালিয়ে সুপুরির খোল দিয়ে বানানো ঘেরটোপের ভেতর বসিয়ে দেয়। কুপিটা জ্বলে ঠিকই কিন্তু তেমন আলো হয় না। অন্ধকার মিশে থাকে ওদের চোখে।

নবীন বলে, কাইল বিষ্টি হইতে পারে। তোর চুলা জ্বলবে বইলে মনে হয় না। খাবি কি?

জসিম হাসতে হাসতে বলে, পানি খামু। ছোটবেলা থাইকা আমার পানি খাওনের অভ্যাস আছে। না খাইয়া থাওনের অভ্যাস আছে। কোনো কিছুতে আমি ঠেহি না।

নবীব আবার জোর দিয়ে বলে, মইরমের মা আর মইরমের ঢেঁকিঘরে পানি ঢুকতে পারে। চাল ফুডা। ছনের চালে আকাল লাগছে। বুঝছস ঘরের ভালা চালের আকাল!

আবার হাসিতে চারদিক ভাসিয়ে দেয় জসিম। বলে, ফুডা চালের ঘরে জ্যোৎস্না দাপায়। খেলা জমে। কানামাছি ভোঁ-ভোঁ খেলা। আমি জ্যোৎস্নার আলোয় পরী ধরতে পারি। তোরা তো খেলতে পারস না। খেলা শিখতে হইলে মাঠঘাটের মানুষ অইতে হয়।

শালা!

যুবকেরা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গালি দেয়। ওদের দাঁতের নিচে ঈর্ষা কিড়মিড় করে। ওরা বুঝতে পারে যে এই বয়সেই জসিম সতেরো বছরের মইরমকে দখলে পেয়েছে। দখলের বেড়িটা লোহার চেয়েও কঠিন। জসিম নিজের হাতে বেড়ি বানাতে পারে। ছেলেটা নিঃসন্দেহে ঘাগু।

ওরা চায়ের আসর ছেড়ে উঠে পড়ে। জসিম চটের বস্তায় দোকানের হাঁড়িকুড়ি ঢুকিয়ে নেয়। অন্য ছেলেরা যে যার পথে চলে গেছে। ও পিঠের ওপর বস্তা ফেলে মইরমের মা সকিনার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন সন্ধ্যা উতরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোর আমাবস্যা। আকাশে চাঁদ নেই। মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে। অন্ধকার চোখে সওয়া। পথঘাট চিনতে অসুবিধে হয় না। জসিমের তো নয়ই। অন্ধকারে ওর দুটো চোখ দশটা হয়ে যায়। জীবনের প্রতি জসিমের কোনো বিতৃষ্ণা নেই। অভিযোগও না। ও মৃদু শব্দে ঘরের দরজায় টোকা দেয়।

তখন মা-মেয়ে ধান কুটছিল। স্বামী বেঁচে থাকতে সকিনা নিজের ঘরে এই ঢেঁকি পেতে ধান কোটার ব্যবস্থা করে। এখন এটাই জীবিকার একমাত্র পথ। যা আয় হয় তা দিয়ে দু'জনের কোনোরকমে দিন কেটে যায়। জসিম দু'বার টোকা দেয়ার পর সকিনা দরজা খেলে। ও নিঃশব্দে ঠেলে ঢোকে। পিঠের বস্তাটা এক কোণে নামিয়ে রাখে। কোনো ভূমিকা না করেই বলে, সারা গাঁ জানে মইরমের গর্ভে নূরালি হাওলাদারের সন্তান।

ঢেঁকির পাশে বসে থাকা মইরম কিছু একটা বলার জন্য মুখ খোলার আগেই ক্যাঁক করে ওঠে। কথা বলার ভূমিকার শব্দ মাত্র। সকিনা সঙ্গে সঙ্গে ওকে তর্জনি তুলে শাসায়। কড়া কথা বলে, চুপ। ধান ভান শেষ কর। ধান ভানলে চাল হবে। কুঁড়া হবে। চাল গিলবে নূরালি। কুঁড়া গিলবি তুই।

আর জসিম কি গিলবে? মইরমের উত্তরে কোনো সরলতা যে নেই সেটা সকিনা এবং জসিম দু'জনেই বোঝে। সকিনা ওর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে, জসিম কিনবে ধান আর কুঁড়া সব।

আপনে কি গিলবেন আম্মা?

আমার দুইন্যা আরও বড়। সেইখানে আমার মাইয়া আছে, মাইয়ার জমি আছে, ঘরের ভিটি, চুলা, খড়ি, ঘরের পেছনের কলাগাছ, কবুতর...।

হইছে, হইছে থামেন। আপনে অনেক বড় গিলনদার। গিলনের শখ আছে, মুরোদ নাই।

হি-হি করে হাসে মা-মেয়ে। হাসে জসিম। যে এদের পরিবারের সঙ্গে মিশে নিজের জীবনে পরিবারের ধারণা গড়ে তুলতে চায়। সকিনা চাল ঝেড়ে কুলার মাথা থেকে কুঁড়া উড়িয়ে দেয় ঘরের ভেতর। এ যে কেমন খেলা তিনজনের কেউই তা বুঝতে পারে না। সবচেয়ে কম বোঝে মইরম। যদিও এই মুহূর্তে পৃথিবী ওকেই কেন্দ্র করে ঘুরছে।

জসিম ওর নিজস্ব ঢঙের খ্যাঁকখ্যাঁক হাসি হাসতে হাসতে বলে, মইরম বাইরে আয়।

পারুম না।

ক্যান?

ক্যান আবার, ইচ্ছা নাই। ভালা লাগে না।

তাইলে থাক। যাই গা। ক্ষিদা লাগছে।

কেমুন ক্ষিদা?

হি-হি করে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে মইরম। ওর হাসি জসিমের শরীরে জ্বালা ধরায় না। হাসির আনন্দ উপভোগ করে। মইরম যে ওকে কখন কীভাবে আনন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয় সেটা মইরম জানে না। জানে না। জানে জসিমের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ও একটুক্ষণ দাঁড়ায়, সকিনা যদি ওকে কিছু বলে এই আশায়। কিন্তু সকিনা কথা না বলে কাজ করতে থাকে। ও বুঝে যায় আজ আর সুবিধা হবে না। ও বেরিয়ে আসে। আবার অন্ধকারে নামা। অন্ধকারেই ওর পথ চেনা সহজ। জসিম গাছগাছালির আড়ালে মিলিয়ে যায়।

খোলা দরজায় বাতাস ঢোকে। সকিনা দরজা বন্ধ করে দেয়। ও জানে জসিমের থাকার জায়গা নেই। বাজারে এর-ওর দোকনে ঘুমায়। সকিনার ঠোঁটের কোণে শিকারির হাসি। এমন একটি ছেলের জন্য ও জাল ফেলেছে। মাছটা ধরতে পারবে এমন একটি বিশ্বাস ওর হয়ে গেছে। ও এখন নিশ্চিত। যার কেউ নেই তেমন একটি ছেলেকেই জামাই করে নেয়ার ইচ্ছা ওর। তাহলে সবাই মিলে একটি সংসার গুছিয়ে নিতে পারে। স্বামী মরে যাওয়ার পরে সংসারটি ভেঙেছে। মেয়ের ঘর হলেই তো সংসারের পালে বাতাস লাগে। আর একটি সংসার গুছিয়ে নেয়ার বড়া সাধ সকিনার। এ জন্য ঘর দরকার, জমি দরকার। আরও অনেক কিছু চাই। স্বপ্ন দেখতে কার না ভালো লাগে। বুকের ভেতর স্বপ্ন থাকলে দিন ভালো কাটে।

স্বপ্ন দেখতে দেখতে হেঁটে যায় জসিম। ও সকিনার ঢেঁকিঘরের ঢেঁকির ওপর বসে সকিনাকে বলেছে, আমাদের সংসারের লাইগা মাটি চাই। আমরা মাটির মানুষ। ক্ষ্যাত আর আবাদ নিয়ে মাটি কামড়ে থাকতে চাই। আমাদের নিজের ভূমি থাকবে না ক্যানে?

আমারে দিয়ে ভুমি কামাইতে চাও?

মইরম খেঁকিয়ে ওঠে।

যার যা ক্ষ্যামতা তার সেইটে করা উচিত।

আমারে উচিত শিখাইও না। বেশি কিছু শিখতে আমার ভালা লাগে না।

মইরম একমুঠি কুঁড়া হাতে উঠিয়ে নেয়।

খবরদার কুঁড়া ছিটাবি না।

সকিনা ধমক দেয় মইরমকে। আরও বলে, কুঁড়া বেইচে পয়সা আনতি হবে। ত্যাল-নুন কিনতি হবে।

আমি ডিমভাজা খাব। পান্তার পানিতে ডুবায়ে রাখব ডিমভাজা।

দিমু। তোরে আমরা ডিম কিনা দিমু।

জসিম পাছা টেনে মইরমের কাছে গিয়ে বসে। সখিনা কুঁড়া-ভর্তি টুকরিটা উঠিয়ে নিয়ে বলে জবালের মায়ের ধারে কুঁড়া বেইচা আসি। বুড়ির মেলা হাঁস। দুইডা ডিমও কিনতে পারুম তার কাছ থাইকা।

সকিনা বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে মইরমের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জসিম। বলে, তুই রাজি হইয়া যা মইরম।

ওই বুইড়াটার সাতে?

বুইড়াটা তোরে ঘর তোলার জমি দিবে। জমিটুকু পাইলে আমাদের সংসারে কাকটা ডিম পাড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই বুইড়াটার সাতে? আমার পথম কাপ-

না, পথম না। পথম তুই আর আমি। অহনই-

তারপর উন্মাতাল সময়ে হাজার হাজার কাক ডাকে ঢেঁকিঘরে। যেন এটা বজ্রপাতে আলোকিত কোনো মুহূর্ত নয়। অন্ধকার নিঃশব্দে তাড়িত সন্ত্রাসীর পদচারণায় কন্টকিত নয়– অন্ধকার প্রস্ফুটিত কুসুম। করবীর রক্তাভ বর্ণচ্ছটায় ফুটে উঠেছে ধ্যানী প্রমথেশ। তার কম্বুকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, মৃত্তিকা খোলো দরজা।

মৃত্তিকা দরজা খোলে। মৃত্তিকার এখন গ্রহণের সময়। মৃত্তিকা তৈরি। পথের দু'পাশে দন্ডায়মান শিশুদের কলহাস্য বিপুল বেগে সমতলের দিকে ধাবিত। ওদের কেউ পৃথিবী দর্শনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল। মৃত্তিকার ধমনিতে তারই আগমনী বার্তা।

তখন ধড়মড় করে উঠে বসে নিজের কাপড় ঠিক করে মইরম। প্রবল বিরক্তি ওর শরীরকে সংকুচিত করতে থাকে। কোনো কিছু বোঝার আগেই পুরুষের শরীর গায়ের ওপর চেপে যায়। এই অনুভবে ওর প্রবল বিতৃষ্ণা জাগে। জসিম ওর হাতটা ধরে কাছে টানার চেষ্টা করে বলে, দূরে গেলা ক্যান এইখানে আসো।

না। মইরমের কণ্ঠের তিক্ত ঝাঁঝ জসিমের কানে বাজে। তারপর ও মোলায়েম কণ্ঠে বলে, তোমার ভালা লাগে নাই মইরি?

মইরম মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, মরণ!

ভাবনার এই মুহূর্তে কাঠ হয়ে যায় জসিমের শরীর। মইরমের এই তিক্ততা ওকে খুশি করেনি। নিজের ব্যর্থতা নয়, আনন্দের উপভোগ নয় শুধু মইরমের ঝেড়ে ফেলার ভঙ্গি ওকে ম্রিয়মাণ করে। ভাবনার এই মুহূর্তে ও মেঠোপথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। নিজের ভেতরে মইরমের তিক্ততার ক্রোধ সত্বেও ওর এই প্রথম ভালো লাগে নিজের ভিতরে লালন করে নিজের শারীরিক কম্পন অনুভব করে। কতক্ষণ যে ও শিহরিত হয় ও নিজেও জানে না। সেদিন একটু পরে মইরম প্রশ্ন করেছিল, তোমার লগে যে কামডা অইলো, তা কি ঠিক অইলো? আমরা তো বিয়া করি নাই।

জসিমের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর, বিয়া করি নাই তো কি হইছে! আমরা তো বিয়া করমু।

ও আচ্ছা। তাইলে ঠিকই আছে। কিন্তু শ্যাষ পর্যন্ত যদি বিয়া না হয়?

মইরমের প্রশ্নের উত্তর জসিমের জানা। কিন্তু ও মুখ ফুটে মইরমকে বলতে পারে না যে, তাহলে এটা ধর্ষণ হবে। ও শুধু মইরমের পুরুষ্ট শরীরটা দেখেছিল। ওর শরীরে অভাবের ছায়া নেই। ও কেমন করে এমন তরতাজা মেয়ে হলো? সেজন্যইতো বুড়া নূরালী ওর কাছে একটি পুত্র সন্তান চায়। মইরমের হাত ধরে

একদিন খাড়া দুপুরবেলা এমন প্রস্তাবটা তো বুড়া দিয়েছিল। বলেছিল, আমারে পোলা দিবি, আমি তোরে ভিটের জন্য জমি দেব।

মইরম সেদিন বুড়োর হাত চাপ দিয়ে ধরে বলেছিল, জাউরা পোলা দিয়া কি কইরবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো খেঁকিয়ে বলেছিল, পোলা অইলো ধন। পোলা বংশ। মাইয়া অইলে জাউরা হয়। মাইনসে বিয়া করতে চায় না। পোলা অইলে কোনো জ্বালা নাই। পোলা মাথার মুকুট।

বুড়োর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে জ্বলে উঠেছিল মইরমের দু'চোখ। বুড়ো সে দৃষ্টি হজম করে বলেছিল, পোলা অইলে ঘরে ফেরেশতা আহে।

থুঃ, এই পোলার লাইগা মাইয়া মানুষের পা ধরন লাগে। আচ্ছা দিমু আপনেরে পোলা। বংশের বাত্তি।

খিলখিল হাসিতে গড়িয়ে পড়া মইরম হাসির রেশ কাটাতে পারে না। ওর কাছ থেকে এমন একটা আজব কথা শুনে জসিম আর সকিনা জমির স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। মা আর জসিমের সঙ্গে গল্প করতে করতে মইরম সতর্কভাবে ঢেঁকির উপর পা ঝুলিয়ে বসে। বলে, পানি খামু।

জসিম কলসি থেকে পানি ঢেলে আনে। ওর পায়ের কাছে বসে গ্লাসটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়। মইরমের পানি খাওয়া হলে বলে, বুড়াটা আটকুঁড়া। নইলে চারডা বউয়ের সন্তান হয় না ক্যান?

সকিনা চুলোয় ভাত চাপাতে বেরিয়ে যায়। আজ ও ভীষণ খুশি। আজ প্রথমে মেয়েটার থালা ভর্তি ভাত দেবে। তারপরে জসিম পাবে। সকিনা বুঝে গেল জসিম একটা পোলা হলেও এই মুহূর্তে মইরমের ক্ষমতাই অনেক বেশি। সকিনার চুলোয় দাউদাউ আগুন জ্বলে।

মইরম জসিমের কাছ থেকে খানিকটুকু দূরে সরে গিয়ে আবার বলে,ওই বুড়াডার সাতে?

কি হইবি? তুই বুইঝা গেলি না যে কি হয়? কিছু হবি না।

কিছু হবি না কেডা কইল? আমার ঘিন্না হয়। মইরমের দৃষ্টি ঝলসে ওঠে।

ভাইবা দ্যাখ মইরি আমরা মাটি পামু। ঘর পামু। ভাইবা দ্যাখ পরের বাড়ির ঢেঁকিঘরে থাকা লাগবি না। তুই রাজি?

মইরম কথা বলে না। জসিমের চুলের মধ্যে দু'হাত ঢুকিয়ে টেনে ধরে বলে, ব্যাতা লাগে?

জসিম ওর হাত ছাড়িয়ে নেয়। মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখে। মনে হয় মইরমের শরীরে বজ্রপাতের শব্দ। জসিমের মাথার ওপর সেটা কড়কড় শব্দে পড়ে। তখন আকস্মিকভাবে মইরম জিজ্ঞেস করে, আমাগো বিয়া কবে?

তুই যেইদিন কবি হেইদিন।

হাঁছা? মিছা কতা কও নাতো?

এক্কেবারে হাঁছা।

মাইয়াগো কতায় বিয়া অয়? তাইলে মাইয়া গো এত দাম?

আবার প্রাণখুলে হাসতে থাকে মইরম। জসিম হাসতে পারেনা। শক্ত হয়ে যায় বুকের পাটাতন। ও বুঝে যায় মইরমের কেন এত দাম। নূরালী হাওলাদার মইরমের কাছে ছেলে চায়। আর ও নিজে মইরমের কাছে জমি চায়। যে জমি ওকে দেবে বলে নূরালী কথা দিয়েছে। জসিমের বিশ্বাস নূরালী কথা রাখবে। আর ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে বিছানায় যাওয়ার আগে জমিটা লিখিয়ে নিতে পারলে আর পায় কে। নুরালী গায়ের ধনী কৃষক, কিন্তু বাপ হতে না পারার দুঃখ বয়ে বেড়ায়। নূরালী মইরমের হাত ধরে বলেছিল, আমি তোরে ভালোবাসি মইরম। তোর আমি সতীনের ঘরে নিমু না। আলাদা দাম দিমু।

মইরম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে, বুড়া শিয়াল।

আমি বুড়া হই নাইরে মইরম।

না, বুড়া হন নাই। লোকে কয় সত্তর বছর বয়স হইছে আপনের।

তোমারে আমি জমি দিমু। তুমি আমারে পোলা দিবা।

মইরমের ঘোর কাটে না। বিপুল বিস্ময় ওর সামনে গোলকার বৃত্ত তৈরি করে। সেই বৃত্তটি ফুটো হয়ে যায় বিশাল এক লাঠির গুঁতোয়। মইরম নিজের ভেতর কোনো ভাবান্তর অনুভব করে না। কিন্তু নূরালীর এমন কথা শুনে সকিনা আর জসিম যখন ওকে প্ররোচিত করে তখন খেলাটা ও বেশ উপভোগ করে। বুঝতে পারে ও আর এখন সতেরো বছরের কিশোরী নয়। মনের বয়স বেড়ে গেছে। ওকে ঘিরে যা হচ্ছে ওটাকে ও পাঁচ ভূতের কাণ্ড ভাবে না। ঘটনাটা বেশ সাজানো। এখন ঘটনাকে নিজের পক্ষে নিতে হবে। মইরম সতেরো বছরের ভাবনা থেকে ধীরেসুস্থে বেরিয়ে যায়। বেশ তো জীবন! হেসে-খেলে বইছে। মইরম যখন- তখন হা-হা করে হাসতে পারে। যে কারো মুখের ওপর দিয়ে সে হাসি উড়িয়ে দেয়। ষোড়শী মইরম নারী হতে ভীষণ ভালোবাসে। নূরালী ওকে নারীর মর্যাদা দিয়ে ছেলে চেয়েছে। ও নূরালীর কাছে যাবে জমি নিতে। মাটি ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে?

ঘরে-বাজারের পথে হাঁটতে হাঁটতে জসিমের কাছে বলা মইরমের স্বপ্ন শেষ হয় না। অন্ধকারে ও দ্রুত হাঁটতে পারে না। ও পৌঁছে যেতে চায় বাজারে। নকুলের দোকানে ভাত রাখা থাকে ওর জন্য। ক্ষিধেও পেয়েছে। কিন্তু হাঁটতে গিয়ে প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছে। ও আবার ফিরে আসে মইরমের সঙ্গে। যেন মইরম ওকে বলছে, জানো না মইরম মানে ফুল।

কেমুন ফুল? গন্ধ আছে?

গন্ধ নাই। হুগনা ফুল। মেলা দিন ঘরে থাহে। কারো সন্তান পস্‌সবের সমুয় ব্যাতা উঠলে ওই ফুল পানিতে বিজায়ে রাখতে অয়। ফুল যদি পানিতে তাজা হইয়া উঠে তাইলে সন্তান পস্‌সবে কষ্ট অয় না। আর যদি তাজা না অয় তাইলে মা মইরা যায়।

এমুন কতা তোরে কে কইলো?

রমিজন বুয়া। রমিজন বুয়া মেলা কতা জানে। যহন কতা কয় তহন মনে হয় কতাগুলা য্যান আকাশ থাইকা ভাইসা আসতেছে।

তাইলে তো তুই একডা তাজ্জব ফুল।

আমি ফুল হমু ক্যান? আমার নামের মানে ফুল। বাজান কইতো মাইয়াডা আমার ফুলের মতন।

ওই একডাই কতা। তোর গুণেরও শ্যাষ নাই।

বাজান কইতো মাইয়াডা আমার বোকার ঢেঁহি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মইরমের হাসিতে জসিমের কান ভরে যায়। ও অন্ধকারে হাত বাড়ায়। যেন ও মইরমকে ধরতে পারবে। হাতটা মুঠি করে। মুঠিতে ঘাম জমে। ওর গতি দ্রুত হয়ে ওঠে। আশ্চর্য ও যেন এখন হাওয়ার বেগে ছুটছে। ও বাতাসে ছড়িয়ে দেয় কণ্ঠ: বিয়ার আগে তুই আমার সন্তানের মা হবি মইরি। লোকে কি কইবে হেইডা লইয়া ভাবিস না।এই দ্যাশে তো মাইয়ারা ধর্ষণ হইতাই আছে। হেতে কার কি আইসা যায়? বিচার আচার কি দ্যাশে আছে? ক আছে? ধর তোরে আমি ধর্ষণ করলাম, হেরপরে বিয়া। এইরহম হইলে বেবাক ঠিক। সমাজের মাথা ঠান্ডা। আর ধর্ষণের সন্তানের বাপ হইয়া গেলে তো সমাজ মাথায় তুইলা থুইবে। কইবে, এমুন বালা পোলা হয় না। আমরা সব ঠিক করছি। আগে নন্তান নিমু। তারপর জমি-ঘর নিমু।জীবনরে খাড়া করমু। মইরম তুই আর আমি এই সমাজরে খাঁচা বানামু। ওরা বন্দি থাকবে। আমরা ঘুইরা বেড়ামু সমাজের নাকে দড়ি দিয়া।

জসিম বাজারের কাছে আসতেই কফিল ওর হাত চেপে ধরে। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, শালা।

তুই না কইলি সত্তর বছরের নূরালী হাওলাদার সতেরো বছরের মইরমরে গর্ভবতী করছে?

ঠিকই কইছি।

তুই জানলি ক্যামনে?

এত কথার জবাব দেই না।

শালা সব তোর সাজানো নাটক। সন্তান অই বুড়ার লয়, তোর।

হা-হা করে হাসতে হাসতে জসিম বলে, বুড়া তো আটকুঁড়া।

তাইলে? কফিল ওর ঘাড়ের ওপর থাবা দিয়ে ধরে। ঠিক কইলাম না?

ছাড়। ব্যাতা লাগতিছে।

কফিলের থাবা আরও চেপে বসে। জসিম দু'হাত দিয়ে ওর হাত ছাড়াতে চায়। পারে না। কফিল হিসহিস কণ্ঠে বলে, বল, ঠিক কি-না?

নূরালী পোলা চায়। মানুষডা প্রেম বোঝে। একডা প্রেমিক মানুষ। ভালোবাসা চিনে।

শালা, তোর কথা ক।

কফিল ওর ঘাড় ছাড়ে না। জসিম গায়ের সব জোর দিয়ে ওকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বলে, ওই বুড়ার কতাই আমার কতা। ভাগ শালা।

তাইলে তুই অহন ওই বুড়া?

জসিম হাসতে হাসতে বলে, কয়দিন পর মইরমের সাথে আমার বিয়া। গরুর গোস্ত আর ভাত খাওয়ামু।

অন্ধকারে মিলিয়ে যায় জসিম। কফিল দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারে ওর চলে যাওয়া দেখে। ওর রাগ বাড়ে। জসিমের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা হয়। পরক্ষণে নিজেকে নেংটি ইঁদুর বলে গাল দেয়। তারপর ভাবে, ইঁদুরের মতো ধারালো দাঁত ওর নেই।ও অন্ধকারে পথে নামে। দিনের বেলা হলে ধান ক্ষেতের আলে শুয়ে থেকে চোখ বুজে রাখত। এভাবে চারপাশ থেকে খানিকক্ষণের জন্য পালিয়ে থাকা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেদিন নূরালীর সঙ্গে ঘটনাটি ঘটল সেদিন বুক ভেঙে গেল মইরমের। বুড়ো প্রথমে ওকে চিৎ করে রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর উপুড় করল। তারপর উত্তেজিত বুড়ো হাড়সর্বস্ব শরীরে ওকে যখন মন্থন করল, ও চেঁচিয়ে বললো, মরণ!

মরণ শব্দ শুনে নূরালীর থুতুভরা মুখ থেকে ফসফস শব্দে বেরিয়ে আসতে থাকে মরণ— তো জমি, ভিটা, ঘুঘু, লাউগাছ। মরণ তো চুলা, ভাতের হাঁড়ি, সানকি, নুনের বাটি। মরণ তো শীত-বৃষ্টি, রাইত, জোয়ান স্বামীর চোদন! মরণ তো মরণঘরের মধ্যে পস্‌সব, পোলার কান্দন। হা-হা করে হাসতে থাকে নূরালী। মইরম বুঝে যায় এটা জসিমের হাসি- হুবহু একই রকম- নূরালীর সঙ্গে জসিমের কোন পার্থক্য নেই। ও নিস্তেজ হয়ে যায়। ভাবে নূরালী ওকে নিয়ে যা খুশি তা করুক। এই পুলসেরাতটুকু পেরোলে ও ভাবে দোজখ- দোজখের মত আগুনের সংসার, ইবলিসের মতো স্বামী। ওহ, কি আনন্দ। ও পাশে পড়ে থাকা ওড়নাটা টেনে নিয়ে নিজের মুখে লেগে থাকা নূরালীর থুতু মোছে।

ওরা এখন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের বারান্দায় বসে আছে। নূরালী কিছুক্ষণ বারান্দার বেঞ্চে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। বেশিক্ষণ ঝুলিয়ে রাখতে পারে না। বেঞ্চের ওপর পা উঠিয়ে নেয়। ও এখন পৃথিবীর সব দেশের আদি মন্দিরে। মন্দিরের দেবদাসীরা ওকে ঘিরে রেখেছে। কারো সঙ্গে তো যেতেই হবে। ঘরে বৃদ্ধ স্ত্রী। সন্তান নেই। দু'জনেই সন্তান চায়। স্ত্রী বলেছে, আমার জন্য আর অপেক্ষা না। তুমি সন্তান উৎপাদন করো। মন্দিরের পুরোহিত নূরালী মুচকি হাসে। ও তো কত সন্তানই উৎপাদন করেছে। তার তো হিসাব রাখেনি। ওর চোখ রাঙানিতে মুখ খোলেনি মেয়েরা। ও অন্য কোনো যুবকের সঙ্গে ওদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নইলে মেরে ফেলা। এবার ওর ছেলে চাই। নূরালী আনন্দে উদ্বেল। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। ঘরে বাঁজা চার বউয়ের মুখের ওপর ছেলেটা কোলে দিয়ে বলবে, দ্যাখ, ক্ষ্যামতা কত। ও দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। চারপাশের মানুষ ওর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পায়।

মইরম নূরালীকে দেখে। ওর হাসি পায়। সেদিনের উত্তেজনার মুহূর্তে নূরালী ওকে বলেছিল, আমি তোরে ভালোবাসি রে মইরম। ভালোবাসা পবিত্র। ভালোবাসার পুত্র কহনও কুপুত্র হয় না। আমার ভালোবাসতে খুব সাধ হয়। আমি বুড়া হই নাই রে মইরম। যে মানুষ ভালোবাসতে জানে সে মানুষ কি বুড়া হয় রে মইরম! হয় না।

মইরমের এই মুহূর্তে মনে হয় ছোটবেলায় কোনো কিছু না দেখে ভূতের ভয় পাওয়ার মতো ভূতটা এখন ওর সামনে। ওর ভীষণ হাসি পায়। ভূত দেখার আনন্দ বেশ।

সকিনা বলে, হাসস ক্যান ছেমড়ি?

ভূত। ও নূরালীকে আঙুল দিয়ে দেখায়।

সখিনা হেসে ফেলে। হাসির শব্দে চোখ খোলে নূরালী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি হইয়েছে?

আপনেরে ডাকে। টিপসই দিতে অইবে।

টিপসই? ও সোজা হয়ে বসে।

আপনের টিপসই দেওয়া অইলে এক কাঠা জমি আমার অইবে।

হ, টিপসই তো দিমু।

নূরালী সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে এসে টিপসই দেয়। পাশে ঝুলিয়ে রাখা ন্যাকড়ায় হাতের কালি মুছে ফেলে। তারপর মইরমের হাত ধরে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পেছনে সকিনা।

আমি মুড়ি আর কলা খামু। ক্ষিধা লাগছে।

সকিনা চুপিচুপি বলে, বমি হইবি।

হোক। বমি করলে আমার মাথা ঘোরানো থাইমা যাইব। আমার ঘুম পাইতাছে।

নূরালীর সঙ্গে আসা কাজের লোকটা মুড়ি আর কলা কিনে আনে। ওরা রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়ে কাঁঠাল গাছটার নিচে বসে। মইরম মুড়ি আর কলা খেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বমি করতে শুরু করে।

নূরালী সে দৃশ্য দেখে উৎফুল্ল-কণ্ঠে বলে, সাবাস, নূরালী সাবাস। তুমি পোলার বাপ হইবা।

মইরম আচমকা পেছন ফিরে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলে, তুমি না বুইড়া, বাপ হইবে জসিম।

কয়েক দিনের মাথায় বেড়া আর খড় দিয়ে ঘর ওঠায় সকিনা। তারও সাত দিন পরে বিয়ে হয় জসিম ও মইরমের। চোখের নিচে কালি পড়েছে। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে গেছে। ওর মনে আনন্দ নেই। জীবনের সবটুকু এখন বিস্বাদে ভরা। জসিম ওকে আদর করে বলে, কি হইছে?

মইরম কথা বলে না। নিস্পৃহতা ওকে গ্রাস করে রাখে। বেঁচে থাকার অর্থ ওর কাছে ফুরিয়ে গেছে যেন। তখন জসিম ওকে বিছানায় বসিয়ে বলে, আয়, দুঃখু ভুলাইয়া দিমু।

আবার সেই একই ঘটনা। আবার- আবার- মইরমের বমি পায়। শরীর ভালো নেই। কিন্তু আনন্দ কোথায়? জসিম উৎফুল্ল হয়ে বলে, তুই খুশি হইছস মইরি? মইরম তিক্ত কণ্ঠে বলে, মরণ!

মইরি সোনা, আমরা অহন স্বামী-স্ত্রী।

মইরম একই ভঙ্গিতে আরও তিক্ত কণ্ঠে বলে, মরণ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেসমিনের ইচ্ছাপূরণ

ডাক্তারের মুখের দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জেসমিন। ওর মুখ ভাবলেশহীন, যেন এমন কোনো কথা ও ওর ছাব্বিশ বছরে শোনে নি, ডাক্তার কোন ভাষায় কথা বলছে সেটাও ও বুঝতে পারে না। বোকার মতো ড্যাবড্যাব দৃষ্টিতে হাঁ হয়ে থাকে। ডাক্তার ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলে, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না?

ও আবারো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখে ডাক্তারের সুশ্রী চেহারা, চিকন ভ্রু, হালকা লিপস্টিকে ঠোঁট জোড়া দেখতে বেশ লাগছে, ঝোলানো কানের দুলটি অনবরত দুলছে। ডাক্তারের চুলের অপূর্ব ছাট মুগ্ধ করে জেসমিনকে। ওর দৃষ্টি ডাক্তারের গলার সরু চেনে আটকে যায়, দু'হাতের আঙুলে তিনটি আংটিতে চমৎকার রঙের পাথর। এমন মানুষকে তো শুধু দেখতেই হয়। তার প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া কি যায়? ডাক্তার মৃদু ধমক দিয়ে বলে, তোমাকে কি বলেছি তা কি তুমি শুনতে পেয়েছ?

ও এবার ঘাড় কাত করে বলে, পেয়েছি।

তবে কিছু বলছ না যে?

আমি কি বলব জানি না।

তোমার অসুখটা কি হয়েছে তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?

আমার জরায়ু নেমে গেছে।

এই তো বুঝতে পারছ। ওটা এখন যে অবস্থায় তাতে ওটাকে আর এখন রাখা যাবে না, কেটে ফেলে দিতে হবে।

জেসমিন ডাক্তারের কথা শুনে ঠোঁট কামড়ে ধরে, ওর নোংরা দাঁতগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলে ডাক্তার দৃষ্টি ঘোরায়, ওর ঘেন্না করে মেয়েটির ওই দাঁত দেখতে, অসুস্থতার কারণে চেহারাও চিমসে গেছে। সামনে ওর আরও দুর্দিন। একটি বড় ধরনের অপারেশন না হলে ও বাঁচবে না। ডাক্তার আবার ওর দিকে তাকালে দেখতে পায় ওর বড় আকারের চোখ দুটো ওর মুখের ওপর ন্যস্ত। চোখের দৃষ্টিতে কোনো জিজ্ঞেসা নেই। ডাক্তার অনুভব করে জেসমিনের চোখজোড়ায় দীপ্তি নেই, ও মেধাবী হলে বা পড়ালেখা শিখলে ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখের ভাষা অন্যরকম হতো, ও কাজল দিলে বা চোখের পাতার ওপর রঙ ব্যবহার করলে চোখের ঔজ্জ্বল্য অন্যরকম হতো, কিন্তু সে গোত্রের মেয়ে নয় বলে ওর অবহেলিত চোখ মানুষের দৃষ্টি কাড়ে নি। অন্য কারও এমন চোখ হলে ধন্য হয়ে যেত তারা। জেসমিনের জীবনে সে সুযোগ নেই, ও কাজের মেয়ে, স্বামী পরিত্যক্ত, একটি আট বছর বয়সি ছেলের মা। ও এখন সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে ডাক্তারের মুখোমুখি। পাঁচ টাকা দিয়ে একটা টিকেট কেটে লম্বা লাইনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ডাক্তারের টেবিলের সামনে বসতে পেরেছে। ডাক্তার আবার বলে, তোমার জরায়ুটা কেটে বাদ দিতে হবে। তুমি রাজি?

ও ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ, আমি রাজি।

ভবিষ্যতে তুমি আর কোনো দিন মা হতে পারবে না।

আমি আর মা হতে চাই না।

তুমি ভালোভাবে ভেবে কথাটা বলো। আজকে বাড়ি যাও, দু'তিন দিন পর আবার আসবে।

জেসমিন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ডাক্তার ওকে প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়, কাগজটা ওর হাতে। ডাক্তার ওকে জিজ্ঞেস করে, তোমার বয়স কত?

ও একটু থেমে চিন্তা করে বলে, বোধ হয় ছাব্বিশ বছর হতে পারে।

আচ্ছা যাও। পরে আবার দেখা করো।

ও বেরিয়ে আসে। ডাক্তারকে সালাম দিতে ভুলে যায়, ফিরে গিয়ে সালাম দিয়ে আসবে কি-না ভাবতে ভাবতে দেখে অন্য রোগী ঢুকে গেছে। আয়া রেগে বলে, যাও না কেন? জায়গা ছাড়ো। জেসমিন মৃদু হেসে আয়াকে দেখে। এখন বিভিন্ন মানুষ দেখতে ওর ভালো লাগছে। হাসপাতালের লম্বা করিডোর পেরিয়ে ও যখন বাইরে এসে দাঁড়ায়, তখন ওর ভেতরে তেমন কোনো গভীর অনুভূতি কাজ করে না, ডাক্তারের কথাগুলো ও উল্টেপাল্টে নাড়াচাড়া করে। আশপাশ দিয়ে লোকজন চলাচল করছে, সবাই ব্যস্ত, সবার মধ্যে তাড়া, কোথাও কেউ চুপচাপ বসে আছে, ওরও ইচ্ছা করে কোথাও বসতে, এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরতে ভালো লাগছে না। যে বাড়িতে ও কাজ করে তিনি ওকে বলে দিয়েছেন, যতক্ষণ লাগে ডাক্তার দেখিয়ে আসবি, বাসার জন্য তাড়াহুড়ো করে আসতে হবে না। আজ আমার অফিস নেই। যে আশ্বাস ও পেয়েছে সেই ভরসায় ও ভাবে আজ ও নিজের জন্য খানিকটুকু সময় ব্যয় করবে। তাড়াহুড়ো করে ফেরার দরকার নেই। একটু দূরের একটা দোকান থেকে ও ম্যাঙ্গো জুস কেনে, খেতে খেতে আবার ফিরে আসে হাসপাতালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে। বারান্দা থেকে নামলে ডান দিকের গাছগুলোর নিচে অনেকগুলো রিকশা দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে রেলিংঘেরা মাঠ, মাঠে ছেলেরা খেলছে। কেউ একজন রিকশাওয়ালা ওকে দেখে বলে, যাবেন আপা?

আপা! অদ্ভুত তো, ও কাজের মেয়ে, এখন পর্যন্ত কেউ ওকে আপা ডাকে নি। ভাবতে ভালো লাগছে যে কারও কারও কাছে ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য, অকারণে ওর মন খারাপ হয়। জুসটা খেতে ভালো লাগে না। খালাআম্মা ওকে ত্রিশ টাকা দিয়ে বলেছে, এটা তোর রিকশা ভাড়া, টিকেটের টাকা আর ক্ষিধে পেলে কিছু কিনে খাবি। কারও কাছ থেকে বকশিস পেলে ও জুস বা কোক কিনে খায়, এ দুটোই ওর প্রিয় পানীয়। মাঠের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে ও ছেলেদের খেলা দেখে, বুকটা কেমন করে, বাড়িতে ওর আট বছরের ছেলেটি ওর অপেক্ষায় আছে। ফিরলেই বলবে, মা তোকে ছাড়া মোর তো আর কেউ নাই। তু মোক থুইয়া কোনহানে যাবু না।

জেসমিনের মাথায় চক্কর ওঠে, আমি ছাড়া তোর আর কেউ নেই কে বলেছে, তার বাবা নেই? রাগ উঠলে ছেলেকে এমনই উত্তর দেয়, আর মেজাজ ভালো থাকলে বলে, না তোকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব নারে সোনা। তুই ছাড়া আমারও তো কেউ নেই।

এতদিন ছেলেটি গ্রামে দাদির কাছে ছিল। দাদি মারা গেলে চাচীরা ওর দায়িত্ব নেয় নি, জেসমিনকে খবর পাঠিয়েছে ছেলেকে ওর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। খালাআম্মাকে রাজি করিয়ে গত মাসে ছেলেকে ঢাকায় এনেছে ও। খালাআম্মা বলেছে, ঠিক আছে ও থাকুক এখানে। ছেলেটি ভারী লক্ষ্মী। কিন্তু একটা উপায় হয়ে যাওয়ার পরে আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখন ওর উপায়? অপারেশনের খরচ কোথা থেকে আসবে?

রোদের তাপে জেসমিনের মাথা গরম হয়ে যায়। গাছের নিচে এসে দাঁড়ায়, একটু ছায়া, একটু বাতাস ওর ক্লান্তি শুষে নেয়। ওর ভালোই লাগে, ভাবে এবার বাড়ি চলে যাওয়া দরকার। তখন রিকশার ওপর পা উঠিয়ে বসে থাকা রিকশাওয়ালা জমির এগিয়ে এসে বলে, তোমার কি হয়েছে? অনেকক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

জেসমিন কথা বলে না। মুহূর্তে লোকটাকে দেখে নেয়। অর্ধবয়সি হবে, দু'চারটা চুল পেকেছে, গোঁফ সব সাদা, গায়ে গেঞ্জি, পরণে চেক লুঙ্গি, স্পঞ্জের স্যান্ডেল আছে পায়ে। পরক্ষণে মনে হয় লোকটা ওর স্বামীর বয়স কি? হবে হয় তো। তবে এই লোকটির দৃষ্টি শান্ত, ওর স্বামীর চোখের মতো রক্তচক্ষু নয়। কেন যে ওই লোকটির সঙ্গে এই মানুষটির তুলনার কথা মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো? ওকে তো ও মনে করতে চায় না। জমির আবার বলে, তোমার কি অসুখ করেছে?

জানি না। ও জুসের প্যাকেটটা দূরে ছুঁড়ে মারে।

তুমি বাড়ি যাবে? চলো দিয়ে আসি।

আমার খালাআম্মা আমাকে রিকশা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। আমি যেতে পারব।

তাহলে যাও না কেন? তোমার কি খুব খারাপ অসুখ? কি বলেছে ডাক্তার?

অপারেশন করতে হবে।

ও বাব্বা, তাহলে তো অনেক টাকা লাগবে। তোমার কি অত টাকা আছে?

নাই।

সেজন্য তোমার মন খারাপ?

না। আমার একটু বাইরে থাকতে ইচ্ছে হয়েছে।

চলো, তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাই?

কেন? আপনার মতলব কি?

মতলব? আমার কোনো মতলব নাই। শুধু আমার মন খারাপ। আমার বউ-পোলাপান গাঁয়ে থাকে। খবর পেয়েছি বউয়ের অসুখ।

ঢাকা শহরে আপনার কেউ নাই?

না।

সেজন্য আপনার মন খারাপ?

হ্যাঁ, কথা বলার কেউ নাই। যেখানে থাকি সেটা একটা দোজখ।

জেসমিন আর কথা বলে না। জমিরের রিকশায় উঠে বলে, আমাকে শ্যামলীতে পৌঁছায়ে দেন, এখান থেকে সাত টাকা রিকশা ভাড়া। আমি সাত টাকা দিয়ে এই হাসপাতালে এসেছি।

আচ্ছা, চলো।

জমির ওকে ওর ঠিকানায় পৌঁছে দেয়। জেসমিন ওর মুঠিতে ধরে রাখা টাকাগুলো জমিরের দিকে বাড়িয়ে দেয়। জমির বলে, বেশি দিলা যে, আমার কাছে তো ভাংতি নাই? ক্যান দিলা? তোমার মতলব কি?

কোনো মতলব নাই। আপনার বউয়ের চিকিৎসার জন্য কিছু টাকা বেশি দিলাম। বাড়িতে পাঠাবেন।

ও গেটে ঢুকে যায়। জমির মৃদু হেসে রিকশা ঘোরালে আর একটি ভাড়া পায়। ওকে অনেক দূর যেতে হবে। কিন্তু জেসমিনের বিষণ্ন, কুঁকড়ে থাকা কালো মুখটা ওর বুকে গেঁথে যায়, মেয়েটির সঙ্গে আবার কখনো কোথাও দেখা হতে পারে ভাবতে ওর ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরে ফিরে জেসমিনেরও মনে হয়, লোকটি ওর মনটা ভালো করে দিয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা না হলে ও হয়তো বাড়িতে ফিরতে আরও দেরি করত। লোকটির সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বাড়িতে ফেরার তাগাদা বোধ করে। মনে হয় ঘরে ওর ছেলে আছে, পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত ছেলে, আর যার কাজ করে সেই খালাআম্মা আছে, যার দুই ছেলেমেয়ে বিদেশে, স্বামী মারা গেছেন, বোনের একটি ছেলে থাকে তার সঙ্গে, মানুষটি ভালো। বলেছে, হাসপাতালে গিয়ে দেখা যে তোর কি হয়েছে, টাকা পয়সা যা লাগে আমি দেব, নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে রে মেয়ে, পারবি না টিকিট করে ডাক্তার দেখাতে?

জেসমিন সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, পারব। যার কেউ নেই তাকে তো নিজের কাজ নিজেই করতে হবে।

পঞ্চগড়ের গ্রাম থেকে এসে নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছে এই ঢাকা শহরে, এখন তো উপার্জন ভালোই করছে, ছেলেটাকেও নিজের কাছে রাখতে পারছে, আর কি চাই, জেসমিন ভাবল, আর কিছু চাই না, ভাবতে ভাবতে ও হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকল, সোজা খালাআম্মার পড়ার ঘরে, তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন। জেবুন্নাহার ওর দিকে না তাকিয়েই বলল, ফিরেছিস? কি বলল ডাক্তার?

অপারেশন লাগবে। জরায়ুটা কেটে বাদ দিতে হবে।

বাদ দিতে হবে? জেবুন্নাহার চমকে ওর দিকে তাকায়। জেসমিন মুখে পানি দেওয়াতে খানিকটা সুস্থির হয়েছে, মাথা ঠাণ্ডা, চিন্তাতেও অবসাদ নেই। ও স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে বলে, জরায়ু নাকি একদম বেরিয়ে গেছে, রাখার কোনো উপায় নেই, ফেলে না দিলে ওটা পঁচতে শুরু করবে।

বাহ তুই তো বেশ গলগলিয়ে কথা বলতে পারছিস! কিন্তু তুই কি জানিস–

হ্যাঁ, জানি যে আমি আর কোনো দিন মা হতে পারব না। আমি একটা ছেলেকে নিয়েই প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছি, আমি আর বাচ্চা চাই না।

ঠিক বলছিস তো?

একদম ঠিক। ডাক্তার আমাকে ভালো করে ভেবেটেবে দুদিন পরে যেতে বলেছে। আমি তো জানি আমার আর ভাবাটাবার কিছু নাই। ওইটা ফেলে দিলে আমি বেঁচে যাই।

তোর বয়স কত, তুই কি আর বিয়া করবি না?

বিয়া করলে যদি মা হয়ে যাই এই ভয়েতে বিয়ার কথা ভাবি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই কি পাগল হলি? তোর ক্ষিধে পেলে কিছু খা, রান্নাঘরে রুটি আর আলু ভাজি আছে।

জেসমিন মেঝেতে বসে পড়ে, কথা বলে না, ওর কিছু ভালো লাগছে ছেলের জন্মের সময়ের সেই দুঃস্বপ্নের সন্ধ্যাটা এখন ওর সামনে। শাশুড়ি বড় ছেলেকে দেখতে পারে না, কারণ ছেলেটা তিন বছরের মধ্যে পাঁচটা বিয়ে করেছে। জেসমিন ওর পঞ্চম স্ত্রী। ওর স্বামীর দুই স্ত্রী মারা গেছে, দুই জন অন্য লোকের সঙ্গে চলে গেছে। লোকটি গাঁজাখোর, জুয়াড়ি, বউদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেনি। এত কিছু খোঁজ না নিয়ে জেসমিনের বাবা ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়, তাও আবার একমাত্র মেয়ে। ও বিয়েতে দুঃখ পেলেও, সংসার করতে আপত্তি করে নি। কিন্তু ও দুঃখ পেয়েছে শাশুড়ির আচরণে, বড় ছেলেকে তিনি একদমই সহ্য করতে পারেন না, থাকেন ছোট ছেলের সঙ্গে। ওই সূত্র ধরে জেসমিনের সঙ্গেও তার সদ্ভাব নেই, সহ্যই করতে পারে না, খোঁটা একটাই, তোমার বাপে তোমার জন্য আর ছেলে যোগাড় করতে পারে নাই?

ওর বয়স তখন চৌদ্দ, কিশোরী জেসমিনের ওই প্রশ্নের উত্তর জানা ছিল না, বাবারা যা করে সেই বিয়ে মেনে নেওয়াই নিয়ম বলে জানত, ও প্রশ্ন করবে কাকে? কি বিয়ে দিয়েছেন আমাকে, এ অভিযোগ নিয়েও তো বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। শরীর কি বোঝার আগেই বুঝল যে, পেট বেঁধে গেছে, তারপরও লোকটা প্রতি রাতে ওকে জ্বালাতন করেছে। নিজস্ব কোনো সুখ ওর জন্য ছিল না, কেবলই যন্ত্রণা, হতাশা এবং বিরক্তির মাঝে গড়িয়েছে দিন।

যে সন্ধ্যায় ব্যাথা উঠল কেউ ছিল না কাছে, পাশের ঘর থেকে জা এসে একবার উঁকি দিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কি রে কি হয়েছে?

জানি না, পেটে ব্যথা।

তোর বোধহয় সময় হয়েছে।

ওহ মাগো, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে জাকিয়া'বু। সারাদিন কিছু খাইনি। চারটা ভাত খাওয়াবা? আমার বোধহয় ক্ষিধের জ্বালায় পেট ব্যথা করছে।

বোকা কোথাকার, দেখবি রাত পোহাবে না, শুয়ে থাক আমি তোর জন্য ভাত নিয়ে আসছি।

মোটা চালের ভাত দিও না।

ঢং, ভালো চাল আমি কোথায় পাব?

আম্মার কাছে ভালো চাল আছে।

আম্মা তো জহিরের মায়ের কাছে গেছে। এই সুযোগে তোকে দু'মুঠো ভাত রান্না করে দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকিয়া গরম ভাত রান্না করে উঠোন পেরিয়ে ওর ঘরে আসার সময় শাশুড়ি বাড়িতে ফেরে। ওর হাত থেকে ভাতের থালাটা কেড়ে নিয়ে বলে, দুই মুঠা রোজগার করতে পারে যে খাইতে চায়? যাও পাতিলে দুপুরের ভাত আছে ওইটা দিয়ে আসো।

জাকিয়া হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা ভাত আর ডাল নিয়ে আসে ওর জন্য। বলে, ভালো চালের ভাত তোর কপালে নাই রে হারামজাদী, নে খা।

জেসমিন হাত দিয়ে থালাটা এক ধাক্কায় ফেলে দেয়। ভাতগুলো ছড়িয়ে যায় মেঝেতে। জাকিয়া রেগে উঠে চলে গেলে প্রবল ব্যথায় ও চিৎকার দিয়ে ওঠে এবং বাচ্চাটা প্রসব হয়। ধরার কেউ নেই, ও নিজেই উঠে বসে এবং নাড়ি কাটে, যতক্ষণ ফুলটা বেরিয়ে না আসে ততক্ষণ নাড়িটা ধরে বসে থাকে, এক সময় হাতের টান পড়লে অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে, বাচ্চাটাও ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে, মুহূর্তমাত্র, ওর কিছু মনে থাকে না, মাথার কাছে কুপিটা জ্বলছে, ক্ষীণ আলো ঘরের সর্বত্র পৌঁছায় না, শিশুটিকে হাতড়িয়ে বুকে টেনে একটি ন্যাকড়ায় পেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে ওর অনুভূতি লোপ পায়। একবার শুধু মনে হয় আকাশে কি চাঁদ আছে? উঠোনে বাতাস আছে? এমন লাগছে কেন ওর? এমন অদ্ভুত শিহরণ? পরক্ষণে ও আর কিছু মনে রাখতে পারে না।

সে রাতে ওর স্বামী বাড়ি ফেরে নি, শাশুড়ি ছেলে হয়েছে শুনে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, জাকিয়া কাজের মেয়ে পাঠিয়ে ঘরটি পরিষ্কার করে দেয়, ছেলেটির মুখে মধু দিয়ে যায়, কীভাবে রাত কাটে ও আর টের পায় নি। তারপর শুরু হয়েছে বাচ্চাটিকে নিয়ে ওর কঠিন সংগ্রাম, জীবনযুদ্ধ কি তা বুঝতে হয়েছে ওকে। স্বামী বাচ্চাটির দিকে ফিরে তাকায় নি, ছ'মাসের মাথায় আবার বিয়ে করে লোকটি। যেদিন ও নতুন বৌ নিয়ে বাড়িতে আসে সেদিনই বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে আসে জেসমিন। তারপরের দিনগুলোর কথা ও আর স্মরণ করতে চায় না। একটি বাচ্চার মা হলে কি হবে, বয়স তো বাড়ে নি, তাই নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হয়েছে অনবরত। কখনো যে ইচ্ছে হয় নি কারও কাছে গিয়ে দাঁড়াতে, তা নয়, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে গেছে, ভয় একটাই, আবার যদি পেট বাধে। পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতায় ও দ্বিতীয়বার ঢুকতে চায় নি, বঞ্চিত করেছে নিজেকে। দুঃখ পায় এই ভেবে যে, শরীরের সুখ ওর নিজের মতো করে পাওয়া হলো না। ছেলেটা বড় হয়েছে, কোনো কোনো মানুষের আচরণ দেখে রাতের বেলা কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলেছে, মা তুই বিয়ে করবি না, তুই না থাকলে আমি কার কাছে থাকব?

এই জটিল পরিস্থিতিতে ঘোলা হয়ে গেছে ওর বেঁচে থাকার জল, এই ঘোলা জলে নতুন সমস্যা একটি অপারেশন, জরায়ু কেটে ফেলা এবং সে বাবদ অর্থের সংস্থান। শূন্য হয়ে যায় জেসমিনের দৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেবুন্নাহার লেখা থেকে মাথা তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, কি ভাবছিস এত? দু'দিন পরে আমিই তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, তোকে যে দেখেছে ও আমার ছোট বোনের বান্ধবী। একটুও চিন্তা করিস না।

জেসমিন চিন্তিত মুখে বলে, অনেক টাকা লাগবে। ও জেবুন্নাহারের পা ধরে বলে, খালাআম্মা আপনি আমাকে বাঁচান।

পাগল, ওঠ একটা ব্যবস্থা হবে।

তিন দিন পরে জেবুন্নাহার নিজেই হাসপাতালে আসে। ডাক্তার মুনিরা বলে, মেয়েটির আনঅ্যাটেনডেন্ট ডেলিভারি হয়েছিল। নাড়ি ধরে ও এমন টান দিয়েছিল যে জরায়ু উল্টে গিয়েছিল। অপারেশন ছাড়া এটাকে রক্ষা করার আর কোনো চিকিৎসা নেই। যত দ্রুত সম্ভব ওকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। সরকারি হাসপাতাল হলেও প্রায় হাজার দশেক টাকা ব্যয় হবে। আপনি কি দায়িত্ব নেবেন?

জেবুন্নাহার মৃদু হেসে বলে, এই মুহূর্তে আমি ছাড়া ওর আর কেউ নেই। তুমি ভর্তির ব্যবস্থা করে দাও। বাকিটা আমি দেখব। এই মেয়ে ঠিক আছে তো?

জেবুন্নাহার পাশে দাড়িয়ে থাকা জেসমিনের দিকে তাকায়। ও মাথা নেড়ে সায় দেয়। ও নির্বিকার, দ্বিধাহীন, যেন ওর শরীরে কি ঘটে যাচ্ছে সেটা ও বুঝতে পারছে না। জেবুন্নাহার আবার বলে, তুই বুঝেশুনে বলছিস তো?

হ্যাঁ, জেসমিনের কণ্ঠের দৃঢ় প্রত্যয়ে ও থমকে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবে, এত শক্ত কেন মেয়েটি? মাতৃত্বের সাধ কি ওর জীবন থেকে উঠে গেছে? কার বিরুদ্ধে ওর অভিমান?

জেবুন্নাহারের বুকটা ভার হয়ে যায়। বাল্যবিয়ে, সন্তানের জন্ম, নিজের শরীরের বিপুল ক্ষতি, স্বামী পরিত্যক্ত নারী হিসেবে সামাজিক পরিচিত, অন্যের বাসায় কাজের মেয়ে হিসেবে জীবিকা নির্বাহ এসব কিছুর বিরুদ্ধেই কি ওর এমন প্রতিবাদ? জেবুন্নাহার যাওয়ার জন্য উঠে দাড়ালে ডাক্তার মুনিরা বলে, আমি সব কাগজপত্র তৈরি করে দেব, কালকেই ভর্তি হয়ে যাক।

বেড দেবে তো? নাকি ফ্লোরে–

না, না আপা, একটা বেড খালি আছে। ওর ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

ভাগ্য ভালো! জেসমিন বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে। ভাগ্য কি, পোড়াকপালই বা কি, এখন শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়াটাই যথেষ্ট, এরপরে আবার হেঁটে যাওয়া, বয়স বাড়া, বুড়ো হওয়া, ছেলেকে বড় করা, একদিন ছেলে এবং ছেলে বউয়ের সংসারে থেকে উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকা। এটাকেই কি ভাগ্য বলে? অকারণে ওর চোখে জল এলে ও ওড়না দিয়ে চোখ মোছে। জেবুন্নাহার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, কাঁদিস না, তোর তো ভাগ্য ভালো যে তুই সরকারি হাসপাতালে বেড পেয়েছিস, তোকে মাটিতে ঘুমাতে হবে না। ডাক্তার মুনিরা তোর অপারেশনের সময় থাকবে, তাছাড়া আমি তো আছি, দেখাশোনার ত্রুটি হবে না। ভয় কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো ভয় নাই। কোনো কিছুতেই ভয় নাই।

ও ফিক করে হেসে ফেলে।

কোনো কিছুতেই ভয় নাই, এটা তো দর্শনের কথা হয়ে গেল, ডাক্তার মুনিরা হাসতে হাসতে বলে। জেবুন্নাহার জেসমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এটুকু বয়সেই ও আমাদের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। ও-ই তো দার্শনিক হবে, নাকি আমরা হবো? ভোতা জীবনযাপনে কাটিয়ে দিলাম কয় যুগ। আয় জেসমিন, যাই মুনিরা।

হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে জেবুন্নাহার ওকে কয়েকটা টাকা দিয়ে বলে, তুই রিকশায় বাড়ি যা। আমি অফিসে যাচ্ছি।

টাকা হাতে নিয়ে জেসমিন রিকশায় উঠতে গিয়ে ঝটিতে ওর মনে পড়ে ক'দিন আগের সেই রিকশাওয়ালার কথা, দেখবে ও আছে কি-না? ও আবার ফিরে আসে হাসপাতালের বারান্দার সামনে, গাছের নিচে বসে থাকা সব রিকশাওয়ালা একে একে দেখে। না লোকটি নেই। মনটা খারাপ হয়, পরক্ষণে নিজেকে ধমকায়, মন খারাপ হবে কেন? ও আমার কে? পথের মানুষ তো পথে ভেসে যাবে, আর হয়তো কোনো দিন দেখা হবে না ওর সঙ্গে। ও হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ আসে, কয়েকটা টাকা বাঁচিয়ে ছেলেটার জন্য বিস্কুট কেনে। ও ছাড়া এখন আর ওর কেউ নেই, ও-ই সম্বল, সুখ-দুঃখের সাথী। বাড়ি ফিরলে দেখতে পায় কেঁদেকেটে চোখ ফুলিয়েছে ওর ছেলে। ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, কেঁদেছিস কেন রনি?

মা তোর পেট কাটবে?

হ্যাঁ, অপারেশন।

রনি আবার কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুই যদি মরে যাস!

রনির হাউমাউ কান্নায় ও নিজেকে সামলাতে পারে না। দু'জনে কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে থাকে।

পরদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যায় ও। বিছানা পায়, সঙ্গে ধোওয়া চাদর-বালিশ, ও বেশ আরাম করে শুয়ে থাকবে বলে বিছানায় বসে, কিন্তু শোওয়া হয় না, কয়েক বেড পরে একটি মেয়ে খুব চিৎকার করছে, সেই চিৎকারে ওর মাথা ঝিমঝিম করছে। ও পাশের বেডের মহিলাকে বলে, ওর কি হয়েছে?

বিষ খাইছে।

বিষ! জেসমিনের শরীরে তড়িৎ প্রবাহ। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। পাশের বিছানার রোগী মুখ বেঁকিয়ে বলে, ওর প্যাড ধোওয়া হইতাছে। ওর লাগি অমুন চিল্লায়।

বিষ খাবে কেন? কি হয়েছিল?

স্বামীডা মানুষ না, তাই মরতে চাইছিল। বাঁইচা থাইকা লাভ কি? আবার দুইডা মাইয়াও আছে।

জেসমিন আবার নিজের দিকে তাকায়। তাহলে ওর নিজেরও কি বিষ খাওয়ার দরকার ছিল? শক্ত হয়ে যায় শরীর, মরবে কেন, পৃথিবীতে কি ভালো মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই, খুঁজে পাওয়া কি খুব কঠিন, নিজের ছেলের কেঁদে ভাসানো লাল চোখ ওর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ করে তোলে। ও এই কান্না শুনবে না বলে তিনতলা থেকে নিচে নেমে দোকান থেকে জুস কেনে, মাঠে ঘুরতে ঘুরতে জুসটা খায়। নিজের অস্থির তাড়না শান্ত করতে চায়, পারে না, মেয়েটির চিৎকার গগনবিদারি হয়ে কাছে পৌঁছে যায়, ও পা দাপায়, ওর ইচ্ছে করে দেয়ালে মাথা ঠুকতে, ও এভাবেই নিজের ক্রোধ দমন করার কথা ভাবে। তখন রিকশাওয়ালা জমির এসে গেটের সামনে যাত্রী নামায়, ভাড়া চুকিয়ে দিলে জমির যখন ফেরার উদ্যোগ করছে তখন জেসমিন সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে চমকে উঠে জমির অস্ফুট স্বরে বলে, কি হয়েছে জেসমিন?

কিছু না। জেসমিন জুসের প্যাকেটটা দূরে ছুঁড়ে মারে।

অপারেশন হয়েছে?

বৃহস্পতিবারে হবে, আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি।

জমির মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আল্লাহ তোমাকে তাড়াতাড়ি ভালো করুক। তুমি এখানে থাকো। আমি তোমার জন্য আপেল কিনে নিয়ে আসি।

রিকশা প্যাডেল করে দ্রুত চলে যায় জমির। অল্পক্ষণে ফিরে আসে আপেল, কলা, বিস্কুট ও জুস নিয়ে। জেসমিন প্রথমে বিস্মিত হয়, তারপর বলে, এক বেলার কামাই শেষ করে দিলেন?

জমির সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলে, তোমার এখন ফলফ্রুট খাওয়া দরকার। অপারেশনে তো রক্ত লাগে, তোমার কী রক্ত লাগবে?

ডাক্তার খালাআম্মাকে বলেছে তিন ব্যাগ রক্ত লাগবে।

তোমার সঙ্গে আমার রক্ত মিললে আমিও তোমাকে রক্ত দিব।

রক্ত দিবেন? জেসমিনের অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে আসে, ও আবার বলে, আপনি আমারে রক্ত দিবেন কেন? জমির সেটা শুনতে পায় না, ওর ভঙ্গি অনুসরণ করে হেসে বলে, তোমার ছেলেটি কেমন আছে জেসমিন?

জেসমিন ভ্রু কুঁচকে জমিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কতজনরে রক্ত দিছেন?

কাউরে না। কাউরে দেই নাই। তোমারেই দিতে চাই। চলো ওই কোনায় গিয়ে বসি।

দুজনে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। উড়ে যায় সময়, উড়ে যায় ফেলে আসা দুঃস্বপ্ন এবং নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করে অনেক কিছু। বহুদিন পর জেসমিনের মনে হয় ও আজ ভীষণ আনন্দে আছে। লোকটি ওর হাত ধরার চেষ্টা করে নি, খারাপ চোখে তাকায় নি, জেসমিন ওর সঙ্গ উপভোগ করে, অদ্ভুত লাগে সবকিছু। কিছুক্ষণ সময় মাত্র, কিন্তু জীবনের অনেকটা যেন ভরিয়ে দিল, জেসমিন নিজের ভেতরে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে নিয়ে বলে, চলেন আমার বিছানা দেখে আসবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকে দু'জনে, পাশাপাশি, কিসব কথা যে বলা হয় দুজনের মনে থাকে না তা, সময়টাই এমন। বিদায়ও এমনই হয়, দুজনের মনে হয় না এটাই শেষ দেখা। জমির ওয়ার্ডের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলে, আমি রোজ রোজ তোমাকে দেখতে আসব।

জেসমনি ঘাড় কাত করে, অসুস্থতার সময় কেউ ওকে দেখতে আসবে ভাবতেই ওর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, যেন অনেক ফুল ফুটে আছে হাসপাতালের সবখানে–ওয়ার্ডে, ডাক্তারের ঘরে, অপারেশন টেবিলে, করিডোরে, নার্সদের সাদা অ্যাপ্রোনের ওপরে এবং সব রোগীদের বিছানায় –ওহ কি যে সুখ!

সব কিছু ঠিকঠাক মতো হয়ে গেল। জমির রক্ত দিতে পারল জেসমিনকে। জেবুন্নাহার আরও দুবোতল রক্ত জোগাড় করল, হাসপাতালের বিছানায় দশ দিন শুয়ে থেকে ছুটি পেল জেসমিন। বাড়ি যাওয়ার দিন জমির এলো জেসমিনকে পৌঁছে দিতে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জেসমিন জমিরকে বলে, আজ থেকে আমি স্বাধীন।

স্বাধীন? স্বাধীন আবার কি?

আমার আর মা হওয়ার ভয় নাই।

জমির দুটো সিঁড়ি বেশি নেমে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না জেসমিন।

জেসমিন খিলখিল করে হাসে। জমির সাবধানী কণ্ঠে বলে, আস্তে হাসো, কেউ শুনবে।

শুনুক, আমিতো শোনাতেই চাই। এই জীবনে যা কিছু পাই নি, তার সব এখন অমার চাই। আমার সব ইচ্ছার পূরণ হবে। হাঃ আমি আর মা হবো না।

বুজেছি, ধরো আমার হাত।

জমির হাত বাড়িয়ে দিলে জেসমিন শক্ত করে সে হাত ধরে, উষ্ণ এবং...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল্যাংড়াটা খুন হয়েছে

বাড়িটা গলির শেষ মাথায়, লোকে এটাকে অন্ধগলি বলে। টানা একটানা বৃষ্টি হলেই বাড়ির উঠোনে হাঁটু পানি জমে, মুষলধারায় সারাদিন হলে ঘরে উঠে যায়, পুংটা লোকের আদেখলা বেহায়াপনা যেন, জোর করে ঘরে ঢুকে কোনো নারীকে নিয়ে মশগুল হয়ে যাওয়ার মতো আচরণ। দেখা যায় ঢুকতে সময় লাগে না, কিন্তু নামতে সময় লাগে।

জিনিসপত্র টানাটানি করতে করতে মেজাজ খচে যায় খলিলের, ধুস শালা নিকুচি করি– বলে একটানে গায়ের জামা খুলে ও পানিতে দাঁড়িয়ে থাকে। দুপুর থেকে মা খাটের ওপরে, নওয়াবের বেটির মতো এটা ওটা হুকুম করছে, তাতেও মেজাজের বারোটা, খলিলের পেশিতে টান পড়ে। সকালে একটা পরাটা খেয়েছিল শুধু, আজ আলু ভাজি কিংবা চিনিও জোটে নি। এখন পেটের ভেতর ভোঁ ভোঁ, যেন মৃধার সুতোকাটা ঘুড়িটা গোঁত্তা খেয়ে পড়ার অপেক্ষায় পাক দিচ্ছে। ও আবার গাল দেয়, শালা দুনিয়াটা মঙ্গা, কেউ গুলি খায়, কেউ খায় ভাত। ও জামাটা কোমরে পেঁচিয়ে নেয়। সারাদিন পানিতে হাঁপর কেটে চোখ লাল হয়ে উঠেছে, মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বেদনা ছাড়াতে চায়, ও কি ছাড়ে, ছাড়ার জন্য তো ধরে নি। রাগের চোটে পা দিয়ে পানি ছিটায়, নোংরা পানি চারদিকে খলবল করে। ওর ব্যায়াম করা পেশিবহুল শরীরের দিকে তাকিয়ে নূরুদ্দিন গলা খাকারি দিয়ে ডাকে, দাদু, দাদুরে–

চুপ, বুড়া শালা, একটা পা খুইয়ে বসে থাকিস, মরতে পারিস না। একজন কমলে তো একটু জায়গা খালি হয়।

নূরুদ্দিন জানে নাতিটা এমনই, ওর কথা গায়ে মাখলে তুলকালাম হয়, চুপ থাকাই ভালো।

সন্ধ্যার আগে বৃষ্টি ছাড়ে, হালকা নরম রোদ ছড়ায় চারদিকে। খলিলের মেজাজ এই রোদ দেখে আরও খারাপ হয়ে যায়।

ও ভালোবাসে অন্ধকার, রক্ত এবং গুলি। এই বাড়িতে ওর আর বেশিদিন থাকা হবে না, পুলিশ ওর ওপর নজর রাখছে। তখন নূরুদ্দিন ঘর থেকে আবার হাক দেয়, দাদু দেখ কি সুন্দর রোদ উঠেছে।

এইসব ফালতু জিনিস আমি দেখিনা বুড়া শালা। তুই দেখ। মা তো নবাবের বেটি, দুপর থেকে ঘুমাচ্ছে, ভাইবোনগুলোকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দায় চুকিয়েছে। বেটির কাছে আমরা তো মানুষ না শালা। টাকা দে আমি বিরিয়ানি খেয়ে আসি।

আমি টাকা কোথায় পাব দাদু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খলিল ভেংচি কেটে নূরুদ্দিনের কথাটা নিজে বলে। তারপর নূরুদ্দিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, রোদ চিনিস, কিন্তু রক্ত চিনিস না ল্যাংড়া বুড়া।

কে বলেছে রক্ত চিনি না? রক্ত চিনি রে শালা।

নূরুদ্দিনের বৃদ্ধ চোখ ঝলসে উঠতে চায়, কিন্তু সে দৃষ্টিতে আগুন নেই। ওটা আবার নেতিয়ে যায়।

খলিল হা হা করে হাসে। বলে, তুই যে রক্ত দেখেছিস সেটা পানসে। আমার রক্ত গরম। টগবগিয়ে ফোটে।

তুই শালা বদমাশ একটা। আমার রক্তে জীবন ছিল, তুই জীবন কাড়িস।

খলিল আরও জোরে হাসে। নূরুদ্দিনের মাথা নুইয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টি নেই। হাসি থামলে খলিল বুক চেতিয়ে বলে, কে বলেছে আমার রক্তে জীবন নাই? আমি তোদের বাঁচিয়ে রেখেছি না? কে তোদের ভাত খাওয়াচ্ছে? বাপ শালা জমিরুদ্দিন, আদমজী পাটকলের কেরানি, চাকরি খুইয়েছে, শালারা কারখানাটা বন্ধ করে দিল। এখন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে। রাতদুপুরে বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা ভাত গিলে বৌয়ের সঙ্গে বিছানায় যায়। তুই শালা একটা অপা ছেলে পয়দা করেছিলি। এখন তোদের সবাইকে টানতে হচ্ছে আমাকে। আমি শালা একদিন ভেগে যাব এই দোজখ থেকে। শালা তোরা এখন রোদ দেখিস, রোদ দিয়ে পাটালি গুড় বানাবি তোরা। পাছার কাপড় তুলে গুড় সেন্দিয়ে দেব। বুঝবি রক্ত কি, রোদ কি।

খলিল পানির ভেতর ছপছপিয়ে হাটে। নূরুদ্দিনের মাথা বুকের ওপর, সেটা ডান হাঁটুর সঙ্গে ঠেসে আছে, বাম পা উরুর কাছ থেকে কাটা। ও কখনোই খলিলের সঙ্গে তর্কে যায় না। যাওয়াটা সঙ্গত মনে করে না। বেঁচে থাকাটা এখনও নিজের কাছে ভয়াবহ রকমের দুর্বিষহ। ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতনিদের কাছে ও একজন বাড়তি মানুষ, খাওয়া-দাওয়ায় ঠিকমতো পেট ভরে না, ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে পারে না এই ঠুটো জগন্নাথ হয়ে থাকাকে কি বাঁচা বলে? কিছুক্ষণ পানিতে পা ঝাপটিয়ে খলিল আবার নূরুদ্দিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, সরকার যে তোর ছেলে জমিরুদ্দিনের চাকরিটা খেল একবারও ভাবল না তার পরিবার ভাত পাবে কোথায়? বিশেষ করে তার পরিবারে একটা ল্যাংড়া বুড়া আছে যে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গিয়ে পা হারিয়েছিল। এখন সবাই বলে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ। দেশটা স্বাধীন না হলে তো কোনো শালা মন্ত্রী হতে পারত না। এখন শালারা মুক্তিযোদ্ধাদের ভাত দেয় না।

খলিলের এত কথা শুনেও নূরুদ্দিন মাথা ওঠায় না। ওর বুকের ভেতরে হু হু শব্দের ধ্বনি হয়, সে ধ্বনি দু'কান দিয়ে বেরিয়ে চারপাশ ভরে রাখে। নূরুদ্দিনের ভীষণ ভয় করে। মনে হয় ছেলেটা আজ বেশি কথা বলছে। এত কথা বলছে কেন? ওর হাত কি নিশপিশ করছে? আজ কি খলিলের বুলেট ওকে শুইয়ে ফেলবে? খলিল ওর মুখের ওপর মুখ নামিয়ে বলে, কথা বলছিস না যে নূরুদ্দিন? বলবি আর কি, তোর বুকের ভেতর তো ভাষা আন্দোলন খলবল করে। ভেবেছিলি দেশের জন্য মহৎ কাজ করেছিলি? হা আসলে তো সব ঢুঢু। তোদের রক্ত কুকুররা চেটে খেয়ে গদিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসেছে। তোরা কেউ না। ল্যাংড়া হাবড়া। মুখ তোল নূরুদ্দিন।

খলিল আদেশের সুরে কথা বলে, যেন ও মধ্যযুগের কোনো সামন্ত প্রভু, নূরুদ্দিন বর্গাচাষী, যার বসতবাটি, গাছের ফল, স্ত্রী এবং মেয়ে ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তি প্রভুর পায়ের নিচে, ঘাড় সোজা করার উপায় নেই। নূরুদ্দিন বিড়বিড় করে বলে, তোর কি হয়েছে খলিল?

বুঝিস না কি হয়েছে?

শ্রমিকের মজুরি না থাকলে তার ছেলেকে তো সংসার ঘাড়ে নিতে হয়।

তুই কি তোর বাপের সংসার ঘাড়ে নিয়েছিলি?

আমার বাপে তো দোকান চালাত। চাকরি ছিল না।

তাহলে তোর বাপ স্বাধীন মানুষ ছিল। এখনকার দোকানদাররা স্বাধীন মানুষ না।

তবে কি?

চাঁদাবাজদের হুকুমের তাবেদার।

তুই মেজাজ খারাপ করিস না দাদু।

তুই শালা ভালোমানুষ সাজিস না।

আমি তো ভালোমানুষ না। পঞ্চাশ বছর ধরে কখনো কুকুর ছিলাম, কখনো শেয়াল। শুধুই মানুষের পা চেটেছি।

হা হা, বেশ বলেছিস। কিন্তু ওই যে মিছিলে অংশ নিয়েছিলি সে কথা তো ভুলতে পারিস না।

পায়ে গুলিটা না লাগলে ঠিকই পারতাম।

যাহ শালা, আজ রাতে ঘর থেকে পানি নামবে না। তোর চৌকি আমি ইট দিয়ে উঁচু করে দিয়েছি, পানি তোকে ছোঁবে না। তুই দিব্যি ঘুমুতে পারবি। তোর কি ঘুম পাচ্ছে?

না, একটুও ঘুম পাচ্ছে না।

তোর শালা কই মাছের পরান। ঠ্যাং একটা হারিয়েও দিব্যি পঞ্চাশ বছর পার করে দিলি। কত বছর বয়সে তোর ঠ্যাংটা হারালি?

বিশ বছর বয়সে।

তখন মাগী চিনতে শিখেছিলি?

নূরুদ্দিন আবার মাথাটা নিচু করে। সাদা চুলের গুচ্ছ কপালে গড়ায়। হা হা করে হাসে খলিল। যেন ভীষণ বিদ্রুপে বাড়িটাকে সরগরম করে তুলেছে। একটু পরে দরজায় কড়া নাড়ে কেউ। খলিল এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। খবর কাগজ নিয়ে এসেছে পাশের বাড়ির ছেলেটা, পয়সা দিয়ে কাগজ কেনা। সঙ্গতি নেই, অথচ কাগজ পড়ার জন্য নূরুদ্দিনের প্রাণ ফেটে যায়। পাশের বাড়ির সঙ্গে কথা বলে দাদুর জন্য এ ব্যবস্থা করেছে খলিল, ওদের পড়া হলে কাগজটা খানিকক্ষণের জন্য নূরুদ্দিনকে দিয়ে যায় ওরা। কাগজ নিতে নিতেও তমিজকে বলে, বাঁচালি, আমার দাদু কাগজের জন্যে হা করে বসে আছে। বেচারা সারা বেলা পানিতে বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনারা এই বাড়িটা ছেড়ে অন্য বাড়িতে চলে যান খলিল ভাই। বৃষ্টি হলে কি যে একটা ঝামেলা হয় আপনাদের!

খলিল এক মূহুর্ত থমকে বুক টান করে বলে, আমিও তাই ভাবছি। গুলশানে চলে যাব আমরা।

গুলশানে? তমিজের চোখ কপালে ওঠে।

একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেলব। সেরকমই কথাবার্তা হচ্ছে।

তখন আপনার দাদুর জন্য অনেকগুলো খবরের কাগজ রাখতে পারবেন।

হ্যাঁ, গোটা দশেক তো বটেই।

তমিজের মুখের ওপর ঠাস করে দরজা বন্ধ করে খলিল। ওর রাগ হয় না, তমিজ একটা বালক, ওর উপদেশ হজম করা সহজ। নূরুদ্দিনের সামনে এসে বলে, নে তোর কাগজ।

নূরুদ্দিন সারাদিনের পর এই প্রথম হাসিমুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠে দু'হাতে কাগজটা ধরে। বলে, তুই তো আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস দাদুভাই।

বেড়ে বলেছিস নূরুদ্দিন। শালা কে কাকে বাঁচিয়ে রাখবে, বাঁচার দিন ফুরিয়েছে।

তাই তো আমিও ভাবি রে দাদুভাই। পত্রিকা পড়লে মনে হয় পত্রিকার রিপোর্টের মতো হয়ে গেছে সময়। একটা খুনের সূত্র ধরে আর একটা খুন হয়।

খলিল চোখ বড় করে বলে, তোর মুখে খুনের কথা কেন নূরুদ্দিন?

পত্রিকায় রোজ খুনের খবর থাকে।

যাহ শালা, এ নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। তোর জীবনে একটি ঘটনা আছে সেটা নিয়ে তোর বড়াই আছে। সেই ঘটনাটা বলে বলে তুই দিন কাটিয়েছিস, এখনো তোর বলার নেশা ফুরোয় নি। মরলে ফুরোবে শালা, আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা থাকলে আমি বোধ হয় বেঁচে যেতাম রে নূরুদ্দিন।

ঠিক বলছিস? নূরদ্দিনের চোখ ছলছল করে। সত্যি বলছিস দাদুভাই?

সত্যিই বলছি। মিথ্যে বলছি না তোর সামনে। যুদ্ধের আগে জন্মালে তো যুদ্ধই করতাম। সেই চান্সটাও পেলাম না।

দাদুভাই! নূরুদ্দিন কেঁদে ফেলে।

খলিল পানিতে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দেয়। বলে, মেজাজ খারাপ করে দিস না নূরুদ্দিন। চোখের পানি দেখলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে।

নূরুদ্দিন চোখ মুছে কাগজ পড়ায় মন দেয়। শুনতে পায় বাইরে থেকে কারা যেন খলিলকে ডাকছে। ডাকের ঢঙেই নূরুদ্দিন বুঝে যায় ওরা কারা। তবু কাগজের আড়াল থেকে মুখ সরিয়ে সামনে তাকায়, কাউকে দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় ওদের কণ্ঠ।

ও খলিল, খইল্যা?

কেন ডাকছিস?

বেরিয়ে আয় শালা, কথা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়টা ফেলতে হবে?

দুটো, আজ আর বেশি না।

এতেই হবে।

শালা বের হ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কারদানি করিস না।

ও দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা জামাটা টেনে বের করে পরতে থাকে। মাথা ঘুরিয়ে নূরুদ্দিনের দিকে তাকায়। নূরুদ্দিন কাগজ দিয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে। ও চেঁচিয়ে বলে, ল্যাংড়া বুড়া আমি বাইরে যাচ্ছি।

কোথায় যাবি দাদু?

তুই না হাজীর বিরিয়ানি খেতে চেয়েছিলি, আজ সেটা পাবি।

সত্যি? আল্লাহ তোর হায়াত দারাজ করুক।

জিজ্ঞেস করলি না টাকা কোথায় পাব?

জানি তো তুই ঘাগু সন্ত্রাসী।

তোর ঘেন্না হয় না?

প্রথম প্রথম হতো, এখন হয় না। বাপের চাকরি সরকার খেয়ে ফেললে ছেলেকে তা সন্ত্রাসী হতেই হবে।

ও বাবা, তুই তো আমার চেয়েও ঘাগু। নিজেকে বেশ সান্ত্বনা দিতে শিখেছিস। আবার বুঝেও গিয়েছিস যে সময়ের সঙ্গে সময়কে মেনে নিতে হয়। সময় সব হালাল করে দেয়।

হা হা করে হাসে নূরুদ্দিন, হাসতে হাসতে কাশি ওঠে, বুকভর্তি কফ, গলা ঘর্ঘর করে। খলিল পানি ভেঙে চলে যায়। ও চলে গেলে নূরুদ্দিন কাগজের একটি খবরের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আঠার মতো আটকে যায় দৃষ্টি। লেখা আছে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে সংঘটিত ৪ টি হত্যাকাণ্ডের পক্ষ এবং বিপক্ষ দলের মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের জের ধরেই বুধবার রাতে কোতোয়ালিতে ৩ যুবক খুন হয়েছে। নিহতরা সকলেই রাজনৈতিক দলের ক্যাডার কর্মী ছিল বলে জানা গেছে। এরকম অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং পাল্টাপাল্টি অব্যাহত থাকলে এই সাত হত্যাকাণ্ডগুলোকে কেন্দ্র করেই আরও বেশকিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা, এমনকি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটতে পারে বলে পুলিশের আশঙ্কা। কয়েকদিনের ব্যবধানে ঢাকার চামেলিবাগের আলম খান, সিদ্ধেশ্বরীতে বিপুল, আদালত প্রাঙ্গণে মুরশিদুল এবং মতিঝিলে তরুণ খুন হয়। পুলিশ এই কটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে যোগসূত্র পেয়েছে। গত সোমবার রাতে কবুতর গোডাউনে একই সঙ্গে খুন হয় তুহিন, দিলদার ও বিপুব। দিলদার ও বিপুব একাধিক মামলার আসামি। এই তিন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ও পূর্বোক্ত চার হত্যাকাণ্ডের স্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে বলে পুলিশ সূত্র উল্লেখ করেছে। গোয়েন্দা পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, শুধু এই সাত হত্যাকাণ্ড নয়, সাম্প্রতিক সময়ের এ ধরণের অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড ওই প্রাধান্য বিস্তার এবং পাল্টা প্রতিশোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘটছে। রাজনৈতিক দলের আশ্রয়পুষ্ট এই সকল হত্যাকাণ্ডে নায়করা পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে। ফলে অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে । পুলিশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওপর মানুষে আস্থা কমছে। তাই রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রী, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ বিশেষভাবে এগিয়ে না এলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এর চাইতেও ভয়াবহ রূপ নেবে।

এদিকে সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, নিহত বিপ্লবের লাশ এখন পর্যন্ত মিটফোর্ড মর্গে আছে। তার কোনো আত্মীয়স্বজন এখন পর্যন্ত মর্গে আসে নি। কোতোয়ালি থানা, দাহের ব্যবস্থা করা হবে।

পড়া শেষ হলে নূরুদ্দিন বোকার মতো তাকিয়ে থাকে। দেখতে পায় ওর সামনে ভাষা আন্দোলনের যাবতীয় ধারণা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, একটা পা নয়, দুটো পা-ই ওর নেই। কীভাবে যে আর একটি পা উড়ে গেছে ও টেরই পায় নি। খবরের পাতার সব অক্ষরগুলো খলিলের মুখ হয়ে ওল্টাচ্ছে। একবার মনে হয় কান্না পাচ্ছে, পরক্ষণে মনে হয় হাসি পাচ্ছে, পরক্ষণে মনে হয় যমের ছায়া লম্বা হয়ে বিছিয়ে আছে, যেন খলিল শুয়ে আছে মর্গে, ও কোনো দিন আর উঠবে না, কারণ গুলিতে ওর বুক ফুটো হয়ে গেছে, একটি খুনের সূত্র ধরে আর একটি খুন। পরক্ষণে প্রশান্ত হয়ে যায় নূরুদ্দিনের মুখ। ও খবরের কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করে, একটু পরে পাশের বাসার ছেলেটি আসবে কাগজটি নিতে। ওরা খলিলকে ভালোবাসে না, ভয় পায়। সন্ত্রাসের ভয়। তাই কাগজটা দেয়। ফলে নূরুদ্দিনের পড়া হয়। ব্যবস্থাটা খলিলের। বলে, কাগজটা পড়ে তুই সময় কাটাতে পারবি। অর্ধেক দিন তো নির্ঝঞ্ঝাটে যাবে। তাই না? পরক্ষণে বলে, না নির্ঝঞ্ঝাটে যাবে না। তোর দুঃখ হবে, রাগ হবে, হাসি পাবে, ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হবে, তবে তুই ছিঁড়তে পারবি না। কারণ কাগজটা কেনার ক্ষমতা আমাদের নাই ওটা সংসারের বাড়তি খরচ! কাগজটাকে যত্ন করে নিজের পিঠের দিকে রাখে ও।

তখন জমিরুদ্দিন বাড়ি ফেরে। হাতে একটা ঠোঙা। ওতে মুড়ি আর ছোলা মাখানো আছে। জমিরুদ্দিন বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। নূরুদ্দিন সোজাসুজি বলে, কোথায় ছিলি সারাদিন? জমিরুদ্দিন সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, এখানে ছোলা আর মুড়ি মাখানো আছে, খাও। সারাদিন তো কিছু খাও নি।

জমিরুদ্দিন অন্য হাতে স্যান্ডেল ধরে রেখেছে। প্যান্ট হাঁটুর ওপর পর্যন্ত গোটানো। বাবার সঙ্গে আর কথা না বলে জমিরুদ্দিন পাশের ঘরে যায়। সাহানা তখনো ঘুমাচ্ছিল, ওকে ধাক্কা দিয়ে বলে, এখনো ঘুমাচ্ছ?

ঘুমাব না তো কি করব? দোজখ ঘাটতে ঘাটতে জীবনটা শেষ হেয় গেল।

সাহানা প্রবলভাবে মুখ ঝামটা দেয়। জমিরুদ্দিন খাটের ওপর বসে। চাকরি হারানোর পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গে ওর সম্পর্কে ভালো যাচ্ছে না। জমিরুদ্দিন স্ত্রীর অভিযোগের জবাব দেয় না। শার্টটা খুলে চৌকির ওপর রাখে, স্যাণ্ডেলটাও চৌকির ওপর রেখেছে। পা পানিতে ডুবে আছে। ও পা জোড়া টেনে তোলে না, ভাবে থাক ওটা পানিতে ডুবেই থাক, পায়ের পাতার নিচে যে জুলুনি আছে সেটা তো আর টের পাওয়া যাচ্ছে না। এখন বৌয়ের মুখ ঝামটায় বুক জ্বলছে, সেটাও হজম করা কঠিন, জমিরুদ্দিন পায়ের নিচে খলবল করা পানিতে সরষে ফুল দেখছে। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথাটা পাক দিয়ে ওঠে। আজ একটা দোকানে ক্যাশ দেখার কাজ পেয়েছে, বেতন বেশি না, তবু তো কিছু উপার্জন, এ খবরটাও বউ বা বাবাকে দেয়ার কোনো আগ্রহ হয় না। জমিরুদ্দিন পিঠটান করে বসেই থাকে।

সাহানা চৌকির অন্য কোণায় বসে থেকে বলে, সকালে খলিল পরোটা কিনে এনেছিল বলে সবার খাওয়া হয়েছে, দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি, রাতের জন্য কিছু জোগাড় করো।

জমিরুদ্দিন চুপ করে থাকে। সাহানা আবার মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, কি হলো মুখে কথা নেই কেন?

রাত হোক, কিছু একটা কিনে আনব। আর কিছুক্ষণ পরে চুলোর ওপর থেকে যদি পানি নামে তাহলে তো তুমি কিছু রান্না করতে পারবে।

না, আমি পারব না। এই নোংরা পানি নেমে গেলে ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে আগে। তারপর বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জীবনের বোঝা আর টানতে পারি না।

না পারলে মুক্তি নাও। আমি তো তোমাকে ধরে রাখি নি।

রাখোনি? সাহানা সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে বলে।

না। জমিরুদ্দিনের নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

সাহানা আবার বলে, রাখো নি?

একটা কথা আমি বারবার বলি না। আমি খুব টায়ার্ড। সারাদিন অনেক ঘুরেছি। তারপরে...

তোমার তারপরে আমি জানতে চাই না, বলে সাহানা গুনগুন করে কাঁদতে থাকে। সাতাশ বছর সংসার করার পরে লোকটি এভাবে কথা বলতে পারল, এটা ও মানতে পারছে না। ওর বুক ফেটে যায়। ওর ইচ্ছে করে চিৎকার করে কাঁদতে, কিন্তু পাশের ঘরে শ্বশুর আছে ভেবে গলা নামিয়ে রাখে। জমিরুদ্দিন বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বাবা আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

নূরুদ্দিন ছেলের দিকে না তাকিয়ে বলে, না তো।

আপনার ক্ষিধে পেয়েছে?

না তো। মুড়ি আর ছোলাবুট দিয়ে আমার রাতের খাবার হয়ে গেছে। আমার আর ক্ষিধে পাবে না।

বাবাকে আর কি জিজ্ঞেস করবে বুঝতে না পেরে জমিরুদ্দিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। বাবার পিঠের পেছনে খবরের কাগজটা দেখে বলে, আপনার কাগজ পড়া হয়েছে বাবা?

নূরুদ্দিন চিন্তিত কণ্ঠে বলে, হয়েছে তবে মর্গে বিপ্লবের লাশ পড়ে আছে। ওর আত্মীয়রা লাশটি নিতে আসে নি।

এসব নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না।

বিপ্লব তো খলিলের বন্ধু। রোজকার পত্রিকা পড়ে বুঝতে পারছি এক খুনের সূত্র ধরে আর একটি খুন হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ বাবা, এসব কথা থাক।

তুই কাগটজটা পড়বি?

না বাবা। ভালো লাগছে না। মাথা ভীষণ ব্যথা করছে।

নূরুদ্দিন ছেলের কথার গুরুত্ব না দিয়ে বলে, শোন জমির, আমাদের এ বাড়িটা ছেড়ে দেয়া উচিত।

বৃষ্টি হলেই শুধু পানি জমে বাড়িটায়। নইলে তো বাড়িটটা খারাপ না। সামনে খানিকটুকু খোলা জায়গা আছে। আপনি চেয়ার পেতে বসতে পারেন। খলিলের মা পেঁপে আর কাঁচামরিচের গাছ লাগিয়েছে।

আমি সে কথা বলছি না। বাড়িটার পেছন দিয়ে পালানোর কোনো জায়গা নেই।

আপনি খলিলের কথা ভাবছেন বাবা?

নূরুদ্দিন আর কথা বাড়ায় না। জমিরুদ্দিনও না।

সে রাতে বাড়ি ফেরে না খলিল।

নূরুদ্দিন ঘুমুতে পারে না। কখনো চৌকির ওপর বসে থাকে, কখনো শুয়ে থাকে, কখনো পা ঝুলিয়ে দিয়ে পানি কমেছে কি না তা পরিমাপ করে। নূরুদ্দিন ক্লান্তি অনুভব করে না, ভাবে বেশ সময় কাটছে। রাত দেখা হচ্ছে, পা নামালে টের পাচ্ছে যে পানি কমছে, এখন আর হাঁটুর ওপরে পানি নেই, শুধু খলিলের চিন্তা মাথায়, ওর বন্ধুর লাশ মর্গ থেকে কেউ নিয়ে যায়নি, কেমন অদ্ভুত সময়, এটাকে কি দুঃসময় বলা যাবে? নূরুদ্দিনের মনে হয় তার চেয়েও বেশি, কিন্তু কোনো প্রকৃত শব্দ দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। একবার ভাবে ও তো ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পা হারিয়েছিল, ওর কি বাংলা ভাষা ভালোভাবে জানা উচিত ছিল? নূরুদ্দিন মৃদু হেসে নিজেকে বলে, তুমি একটা বোকা, গাধা কোথাকার। সব সময়ের ব্যাখ্যা জীবন দিয়ে বুঝে নিতে হয়, শব্দ দিয়ে তাকে ধরা যায় না, বাংলা ভাষার হাজার হাজার শব্দ জানা থাকলেও না। আমি তো সামান্য মানুষ, কেরানিগিরি করে জীবন কাটিয়েছি। আমার কি এত কিছু জানতে চাওয়া মানায়? শুধু খলিল আমার প্রিয় নাতি, ওর জ্বালা আমি বুঝি, ও যেভাবে প্রকাশ করে সেটাও আমি বুঝি। ও নিজেও আমাকে বোঝে।

নূরুদ্দিন চিৎ হয়ে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে, রাতে না ঘুমানোর জন্য সম্ভবত। ভোর হবো হবো করছে, কারণ অন্ধকার ফিকে হয়েছে, ঘর থেকে পানি নেমেছে, পানি দ্রুত নেমে যাওয়ার জন্য দরজা খোলা ছিল, খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরে আবছা আলো। এতক্ষণে ওর চোখ বুঁজে আসতে চাইছে, ঘুম পাচ্ছে। হালকা তন্দ্রার ভেতরে পনেরো বছর আগে মারা যাওয়া স্ত্রীকে স্বপ্ন দেখে নূরুদ্দিন। আফরোজা নিঃসন্তান বিধবা ছিল। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করত। পা হারানো নূরুদ্দিনকে আপন ইচ্ছায় বিয়ে করেছিল আফরোজা। বলেছিল এমন মানুষকে চাই যে একটা মহৎ কাজ করেছিল। দু'জনের উপার্জনে সংসারে শান্তি ছিল, একটি ছেলের জন্মের পরে ওদের আর কোনো সন্তান হয় নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে প্রবল নিঃসঙ্গ– একাকী নূরুদ্দিনের বন্ধু হয়েছিল খলিল। ওর সঙ্গেই যা কিছু কথা হতো, আর তো এই সংসারে কথা বলার মতো কেউ নেই। খলিলের ছোট ভাইবোনগুলো ছোটই, ওরা সত্তর বছরের দাদুর সঙ্গে কথা বলে সুবিধা করতে পারে না। খলিল বাড়িতে থাকে না, কোথায় থাকে সেটা কেউ জানতে চায় না। জানার সাহস কারো নেই, সবাই খলিলকে ভয় পায়।

হঠাৎ করে আকস্মিক শব্দে তন্দ্রা ছুটে যায় নূরুদ্দিনের। চৌকির ওপর উঠে বসে। ওর ঘরে দু'চারটা জামা কাপড় ছাড়া তেমন কিছু নেই। চোর এলে রেগেই যাবে, কিন্তু নূরুদ্দিন দেখতে পায় চার পাঁচটি ছেলে ওর ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে অস্ত্র। নূরুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বলে, খলিল বাড়িতে নেই।

একজন হেসে বলে, খলিল এই দুনিয়াতেই নেই।

নেই? অস্ফুট শব্দ ছুটে বেরিয়ে আসে নূরুদ্দিনকে বুকের ভিতর থেকে।

রাত বারোটায় শেষ করেছি ওকে। খুনের বদলায় খুন, একটা নয় তিনটা। বাংলাদেশ মাঠের কাছে তোরাজ পারফিউমারি কোম্পানির গোডাউনের খোলা মাঠে পড়ে আছে। পুলিশ আলোর ব্যবস্থা করে মৃতদেহের সুরতহাল করেছে। মর্গ থেকে লাশ ছুটিয়ে নিয়ে আসিস।

তোরা এসেছিস কেন?

ওর কাছে একটা অস্ত্র ছিল সেটা নিতে।

ও কখনো বাড়িতে অস্ত্র রাখে নি।

মিথ্যে বলিস না বুড়া।

আমি মিথ্যে বলতে শিখি নি।

ও ধর্মপুত্র যুধিষ্টির! অস্ত্রটা বের করে দে। ও তোকে খুব ভালোবাসত। আমাদের কাছে তোর গল্প করত, ও ভাবত তুই একটা মহান মানুষ।

হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে নূরুদ্দিন।

কেঁদে সময় নষ্ট করিস না। অস্ত্রটা বের কর।

নূরুদ্দিন কাঁদতেই থাকে, এদিকে আলো পরিস্কার হয়ে উঠছে। ওরা আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। ওরা নূরুদ্দিনকে ধমকায়। ঘরের এদিক-ওদিকে তাকায়, কোথাও কিছু নেই। জমিরুদ্দিন আর সাহানার ঘরের দরজায় লাথি দেয়। ছেলেগুলোর একজন নূরুদ্দিনের বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে বলে, বুঝতে পারছি যে তুই কথা বলবি না। খলিলের খুব ইচ্ছে ছিল তোর মতো মানুষ হওয়ার। আজ তোর বুকটা ফুটো করে দিয়ে ওর স্বপ্নের সাধ মিটিয়ে দেব। ও মরেছে, তুইও মর ল্যাংড়া বুড়া।

ওরা নূরুদ্দিনকে গুলি করে রেখে গেট টপকে চলে যায়। চৌকি থেকে গড়িয়ে পড়ে নূরুদ্দিনের লাশ।

সকালবেলা যে ছেলেটি বাড়িতে খবর কাগজ দেয় সে পাড়ায় খবরটা পৌঁছে দেয় যে ল্যাংড়াটা খুন হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরণ্য কুসুম

ঢাকায় পৌঁছেই মেয়েটির কি যে হয়।

ও কাউকে নিজের নাম বলে না। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলেই মায়ের নাম বলে। ভাবে এভাবে বোধ হয় সব মানুষের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করা যাবে। কেমন করে ওর ভিতর এমন একটি ধারণা জন্মাল ও তা খতিয়ে দেখতে পারে না। অত বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই। বাসে ঝিমুনি এলে যখন পাশে বসা লোকটি শাড়ির নিচে ঢুকিয়ে ওর বুকে হাত দেয় তখনই এমন একটি ভাবনা ওকে পেয়ে বসে। ভাবনাটি ওকে স্বস্তি দেয়, আনন্দও। ঢাকায় নিজের একটি জায়গা করতে পারবে এমন ভরসাও পায়। কিসের ওপর ভিত্তি করে ভরসা তা ও বোঝে না।

গাবতলী বাস স্টেশনে নামার পরে ওর ভীষণ ক্ষিধে পায়। দেড় দিন কিছু খাওয়া হয় নি। একশ টাকার নোটটি কোমরে গোঁজা আছে। পেটিকোটের সঙ্গে জড়ানো। কখনো আঁতকে উঠে ভাবে, কেউ যদি পেটিকোটের ফিতাটা টান দিয়ে খুলে ফেলে তাহলে টাকাটা কোথাও ছিটকে পড়ে যেতে পারে। ওর ভয় নোটটার জন্য, নিজের শরীরের জন্য নয়। এমনই ধারণা সঙ্গে নিয়ে ও শহরে এসেছে। শরীরের চেয়ে টাকার মূল্য বেশি, এটা ও শিখেছে। ক্ষিদেয় ওর পেট চোঁ-চোঁ করছে। কত আর পানি খেয়ে ক্ষিদে দমানো যায়, ও দু'চোখ ভরে মানুষ দেখে, কুঁকড়ে থাকে ভেতরটা– মানুষ দেখতে ঘেন্না লাগে। লোকগুলো কেমন চ্যাটচেটে, আঠালো, গায়ে দুর্গন্ধ ভরা, কদাকার কুৎসিত। মেয়েটি আতঙ্কে চোখ বোঁজে, আবার খোলে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে বাস এসে থেমেছে। তখন যে পরিমাণ লোক গিজগিজ করছিল তার চেয়ে এখন ভিড় পাতলা হয়েছে। ওর ভেতরটায় স্বস্তি ফিরতে থাকে। মানুষ কমে গেল গাবতলী বাসস্টেশন ওর একার হবে। থাকবেও আরও অনেক অনেক বাস ট্রাক। তখন ওর কাউকে ভয় করার থাকবে না। ও গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শরীরের ভার ছেড়ে দিতে চায়, পারে না। গড়িয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। একটি কুকুর পাশে এসে বসলে ও ওটার গায় হাত রাখে। কুকুরটি ওর বাহু চেটে দেয়। ওর জিভ থেকে লোল গড়ায়। ঘেন্না হয় মেয়েটির। কুকুরটিকে শাসিয়ে বলে, এই আমারে না জিগায়ে হাত চাটলি ক্যান? তুই কি চেয়ারম্যানের পোলা বজলু? হালা কুত্তার বাচ্চা, যা ভাগ।

মেয়েটির কাণ্ড দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বালকটি হি হি করে হাসে। ও একটি আমের আঁটি চুষছিল। ওটা মুখ থেকে সরিয়ে বলে, আপনে অরে মানুষ ভাবলেন ক্যান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুত্তা আর মানুষের ফারাক কি?

হি-হি করে হাসে ছেলেটি। আমের আঁটি দূরে ছুঁড়ে ফেলে বলে, আপনের বাড়িঘর নাই?

আছে, থাকব না কেন? আমি কি রাস্তার ফকির?

তাইলে বাড়িত যান।

যামু না।

কই থাকবেন?

রাস্তায়।

রাস্তা খুব খারাপ জাগা।

ভাগ শয়তান। আমার যা খুশি তাই করুম।

আপনের ক্ষিধা পায় নাই?

পাইছে। মেলা ক্ষিধা লাগছে। নাড়িভুঁড়ি মোচড়াইতাছে।

চলেন, ওই হোটেলে যাই। মালিক আপনেরে ভাত দিবে।

ক্যান, আমারে ভাত দিবে ক্যান? মালিক আমার কাছে ঠেকা কিসের?

ঠেকা না। মালিকের দয়ার শরীল। গরিব মানুষরে ভাত দেয়। চলেন।

মেয়েটি একটুক্ষণ উদাস হয়ে থাকে। ওর শরীরের ভেতরে তীব্র যন্ত্রণা খচখচ করে। বাবার সঙ্গে রাগ করে ঘর ছেড়েছে, হুট করে ঢাকাগামী বাসে উঠে পড়েছে। এখন এই অচেনা শহরে ও কোথায় যাবে? বালকটি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কালো, শুকনো, হাড়গিলে চেহারা, ওকে একটা বানরের মতো লাগছে, আসলেই ও একটা আস্ত বানরই। ও একটা ছোট ব্যাটা, একদিন বড় ব্যাটা হবে। ওর মাথার ভেতরে খিচ ধরে, যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। ও তীব্র ভাষায় চেঁচিয়ে বলে, ওই ছ্যামড়া খাড়ায়ে রইছস ক্যান?

আপনের লাগি। আমি বুঝছি আপনের ঘর নাই। থাকলে তো ঘরে যাইতেন।

ওই শয়তান তোর নাম কিরে?

জলফু। জলফু আলি।

বাপের নাম কি?

জানি না।

মা নাই?

মরছে। মারেও দেহি নাই।

বুজছি।

কি বুজছেন?

তুই একডা জাউরা।

জলফু আলি হি হি করে হাসে। ভীষণ মজা পেয়েছে। এমন কথা তো ও হরহামেশা শোনে। শুনে তো ওর মজাই লাগবে। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো ছেলেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের ঠিক থাকলেও লোকে মনে করে ওদের জন্মের ঠিক নাই। ওরা অল্প বয়সে অনেক বেশি বোঝে। ও মেয়েটির সামনে উবু হয়ে বসে বলে, আপনার নাম কি খালা?

গড়িগাঁ।

এইডা আবার কেমুন নাম?

চুপ কইরা থাক বান্দর।

ছেলেটা হি-হি করে হাসে। এগিয়ে আসে একজন বুড়ো ভিখারি। মেয়েটির মনে হয় এই শাকচুন্নি আবার কে? তেলহীন রুক্ষ চুল, ময়লা শাড়ি হাঁটুর ওপর ওঠানো। গায়ে জামা নেই, পেটিকোটও না। হাতে টিনের থালা, খালি। কোমরে গোঁজা কিছু একটা, হয় পান নয়তো পয়সা। দাঁতহীন চেহারা কুৎসিত। কোঁচকানো মুখের চামড়ায় ধুলো জমে আছে। বুড়িকে দেখে খুবই বিরক্ত হয় মেয়েটি। মনে মনে বলে, এমুন ডাইনি আমি আগে দেহি নাই। বুড়ি ওর কাছে এসে বসে। বলে, কিছু কামাইতে পারছ নি?

আমি তো ভিখ মাঙি না।

অ। বুড়ি মুখ ভ্যাংচায়। তোর নাম কিরে ছেমড়ি?

গড়িগাঁ।

এইডা তোর গেরামের নাম। তোর নাম কি?

গড়িগাঁ।

এইডা আবার কেমুন নাম অইল?

অইব না ক্যান? নাম তো একডা অইলেই অয়। আপনেরা ডাকবেন, আমি সাড়া দিম, তাইলে তো অইল। এত রঙবাজি কিসের?

বুড়ি খি খি করে হাসে। ওর তেলহীন রুক্ষ চুল বাতাসে দোল খায়। চূর্ণ কুন্তল কপালে এসে পড়ায় ওকে ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে। মেয়েটি ভয় পায়। ছোটবেলায় শোনা রাক্ষস-খোক্কসের গল্পের ডাইনি যেন। ও তখন চেঁচিয়ে বলে, হাইসেন না, হাসি থামান।

বুড়ি দুম করে নিভে যায়। চোখ বড় করে বলে, তোরে আমি রাজকইন্যা ডাকমু ছেড়ি।

পাইছি, পাইছি। একডা নাম পাইছি।

জলফু লাফাতে থাকে। ওর হাসি, ওর অঙ্গভঙ্গি দেখে মেয়েটির মনে হয় ছেলেটি আসলেই একটি বানর। বানরের পেটেই ওর জন্ম হয়েছে। ছেলেটি ভ্রু কুঁচকে বলে, অমুন রাগ কইরা আমার দিগে চাইয়া রইছেন কেন? চলেন, হোডেলে চলেন। আপনের ক্ষিদা লাগছে রাজকইন্যা খালা।

চুপ কর শয়তান।

আপনের ক্ষিদা লাগছে তো।

মেয়েটি কিছু বলার আগেই বুড়ি জলফুর হাত ধরে, আমারও খুব ক্ষিদা লাগছে দাদা। আমারে ভাত খাওয়াবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, না, আপনেরে খাওয়াইতে পারমু না। আপনেরে দেখলে মালিক চেইতা উঠব।

তুই না কইলি তোর মালিকের দয়ার শরীল?

মেয়েটি তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকায়। জলফু আমতা আমতা করে। কথার উত্তর না দিয়ে দূরে গিয়ে পেসাব করে। তখন বুড়ি যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দয়ার মেলা রহম আছে রে রাজকইন্যা। তোর লাগি এক রহম দয়া, আমার লাগি আর এক রহম।

বুড়ি আবার খ্যা খ্যা হাসিতে ভরিয়ে দেয় চারপাশ। ওর মুখ থেকে থুতু ছিটায়। ওর কদাকার মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি গাল দিয়ে বলে, তুই একডা শাকচুন্নি।

বুড়ি থমকে দাঁড়িয়ে বলে, শাকচুন্নি হমু ক্যান? তুই রাজকইন্যা হইলে আমিতো রাজকইন্যার নানী।

হ নানী না ঢেঁকি। যাও ভাগো।

বুড়ি চলে গেলে জলফু এগিয়ে আসে। পাশে বসে। আদুরে গলায় বলে, রাজকইন্যা খালাআম্মা চলেন যাই।

তোর মালিকের নাম কি রে?

তোফা আলি। মাইনষে কয় তোফা বাবু।

কয়ডা বিয়া করছে?

হি-হি করে হাসে জলফু। মেয়েটির কানে সে হাসি খট কর বাজে, যেন ছেলেটির হাসিতে মেলা কথার আভাস আছে। তবুও ওকে উস্কে দেওয়ার জন্য বলে, বিয়া করে নাই, না?

করব না ক্যান? বেডা মানষে বিয়া না কইরা থাকতে পারে!

তুই ক্যামনে জানলি যে থাকতে পারে না?

আমি বেবাক কিছু জানি। আমার মালিকে পাঁচডা বিয়া করছে। প্রথম বউ পোলাপান হইতে গিয়া মরছে। মাইয়া হইছিল হেইডাও বাঁচে নাই। পরের বউ আরেক বেডার লগে চইলা গেছে। তার পরেরডারে মালিক নিজে তালাক দিছে। কয়ডা হইল?

তিনডা। মেয়েটির কণ্ঠে ঔৎসুক্য।

চাইর নম্বর বউরে গেরামের চেয়ারম্যানের পোলা পাট ক্ষ্যাতে লইয়া গিয়া–

হইছে থাম। আর কওন লাগব না।

এরপর কি তালাক না হইয়া পারে! পাঁচ নম্বব বউ লইয়া অহন মালিক ঘর করতাছে। পোলাপান নাই একডাও। মালিকের মনে এর লাগি মেলা দুঃখু।

দুঃখু! দুঃখুর তো ও কিছুই দেখেনি। মেয়েটির নিঃশ্বাস ভারী হয়ে যায়। এমন আজব লোকটিকে ওর দেখার ইচ্ছা হয়। উঠে দাঁড়ায়। হাত পা টানটান করে। ঝিঁঝি ধরা পা জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা করে। জলফু বুঝে যায় যে মেয়েটি এখন ওর সঙ্গে যাবে। ও মেয়ের হাত ধরে বলে, চলেন খালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ল যাই। মেয়েটি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে। হাঁটতে গিয়ে মনে হয় ওর মাথা টলছে। দু'মুঠো ভাত না খেলে আজ রাতে ও আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তারপরও রাস্তা পার হয়ে তোফা আলির হোটেলে আসে। লোকজন তেমন নেই। দু'জন লোক ভাত খাচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে জলফু চেঁচিয়ে বলে, ওস্তাদ আনছি। আহেন খালা।

ওস্তাদ আনছি! দুটো শব্দ সে রাতে বজলু যেমন করে কথা বলেছিল সেভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। মেয়েটির মনে হয় ওর কান ছ্যাদা হয়ে গেছে, গরম লোহার শিক ঢুকতেই থাকে। ওটা কতখানি লম্বা এবং কতক্ষণ ধরে ঢুকবে ও জানে না। তোফা আলি দন্ত বিকশিত করে বিগিলিত ভঙ্গিতে হাসে। ওর মোটা ভ্রু কালো পাপড়ি চোখের ওপর ঝুলে আছে। থ্যাবড়া চেহারায় কুতকুতে চোখ। চওড়া নাক। কপালের ওপর থেকে অনেকখানি চুল উঠে গেছে। থলথলে ভুড়ি গর্ভবতী গাইগরুর মতো ঠেলে আছে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। মেয়েটি যে লোকগুলো ভাত খাচ্ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। জলফু গদগদ স্বরে বলে, ওস্তাদ উনি রাজকইন্যা। নামডা ভিক্ষা-বুড়ি দিছে।

মেয়েটির নাম শুনে ভক্ষণরত লোক দু'জন উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। ওদের মুখ থেকে ভাত ছিটকে পড়ে। তোফা আলি নিজেও হাসতে হাসতে বলে, ভেতরে আসো। বসো রাজকইন্যা।

আমার নাম গড়িগাঁ।

ও আল্লারে তুমি মাইয়া মানুষ না, তুমি একডা গেরাম। তো ভিতরে আসো। তোমার মেলা ক্ষিধা লাগছে না?

লাগছে। দুই দিন খাই নাই।

ও জলফু ওরে দুই থালা ভাত আর গোস্ত দে। পারবা তো খাইতে?

পারমু। ভাত খাওয়া কঠিন কাজ না।

আবার তিনজন পুরষ এবং একজন বালক হা হা করে হাসে। যেন এমন একটি কথা মেয়েটি বলেছে যার মতো মজার কথা আর কিছুতে হয় না। হাসতে হাসতে ভক্ষণরত পুরুষেরা বিষম খায়। বালকটি ওদের দিকে পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়। তোফা আলী মেয়েটির কানে কানে বলে, ভাত খাও সোনা। মেয়েটি দ্রুত গিয়ে বেঞ্চে বসে। ভাতের থালা টেনে নেয়। ও হাত ধুয়ে নেয়ার কথা ভুলে যায়। ওর কানের কাছে লেগে থাকে তোফা আলির উষ্ণ নিঃশ্বাস। ও বুঝে যায় ওই ক্ষুদ্র বানরটিকে তোফা আলিই পাঠিয়েছে ওর কাছে। লোকটি নিশ্চয় দূর থেকে ওকে দেখেছে। অনেকক্ষণ সময় একা একা বসে থাকতে দেখে ভেবে নিয়েছে ওর কেউ নেই। ওর হাত থেমে যায় থালার ওপর। এতক্ষণ মুখ নিচু করে খাচ্ছিল। চোখ তুলতেই দেখতে পায় ভক্ষণরত লোকগুলোর খাওয়া শেষ। ওরা মনোযোগী দৃষ্টি ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ও শুনতে পায় জলফুর কণ্ঠ, ওস্তাদ আনছি। ওহ সংসার, সংসার। মেয়েটি গপগপিয়ে আবার কয়েক গ্রাস ভাত মুখে পোরে। খেতে বেশ আনন্দই পায়। আনন্দে ওর চোখে জল আসে। ও বাম হাতে চোখ মোছে। তিনজন খাটা মানুষ তখন ওর মুখোমুখি বেঞ্চে এসে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্দো ক্যান? এ কণ্ঠ ও চেনে না।

কান্দো ক্যান রাজকইন্যা? এবার তোফা আলির কণ্ঠস্বর।

মেয়েটি তীব্র চোখে ওদের দিকে তাকায়। বলে, কান্দুম ক্যান, ভাত পাইলে আবার কান্দন আহে নাহি? আমার খুশি লাগতাছে। আপনেরা আমারে মেলা গোস্ত দিছেন।এত গোস্ত আমার এই জীবনে আমি এক বেলায় খাই নাই। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর।

তুমি ঘুমাইবা রাজকইন্যা?

হ ঘুমাবু। ভাত খাইলে তো ঘুম আহে।

ও বিশাল ঢেকুর তোলে। বড় করে হাই। চোখ ডলে, যেন ঘুমে ওর দু'চোখ জড়িয়ে গেছে। ও থালার ওপর পানি ঢেলে হাত ধুয়ে নেয়। বেঞ্চের ওপর পা তুলে বসে। ডান দিকে টেনে রাখা আঁচলটা পিঠের ওপর ফেলে দেয়। ওর ঘাড়, গলা, পিঠের অংশ এবং বুকের একটুখানি অংশ উন্মুক্ত। ওর গায়ের রঙ শ্যামলা। স্বাস্থ্যবতী। অভাবের সংসারেও ফুলে-ফেপেই বেড়েছে। বাড়বাড়ন্ত শরীর। মুখের ছাঁদ আকর্ষণীয়। তিনজন মানুষই ওর পরিবর্তিত ভঙ্গিতে নড়েচেড়ে বসে। ও তিনজনের দিকে তাকিয়ে সরল হাসিতে নিজের অবস্থানকে পোক্ত করে তোলে। ওর হাসি দেখে তিনজনই কিছু বুঝতে পারে না। বড় অমায়িক, বড় নিষ্পাপ হাসি, পৃথিবীর পাপ মেয়েটিকে স্পর্শই করে নি, করতেই পারে না। ও তো স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তিনজনই বিগলিত।

তুমি কোনহানে ঘুমাইবা রাজকইন্যা?

এইহানে, এই বেঞ্চির উপরে।

তোমার কাঁথা বালিশ আছে?

না, রাগ কইরা এক কাপড়ে চইলা আসছি। কেঁথা-বালিশ কই পামু।

আমি তোমারে কাঁথা বালিশ দিমু রাজকইন্যা। আমি টেরাক চালাই। আমার টেরাকে তুমি ঘুমাইতে পারবা। আরাম কইরা ঘুমাইবা।

না, না, টেরাকে ঘুমাইবা ক্যান? আমি চারডা বেঞ্চি জোড় কইরা তার উপর তোষক পাইতা সোন্দর চাদর বিছাইয়া তোমারে বিছানা কইরা দিমু। তুমি শুইবা আর ঘুমাইবা।

আর একটি লোক নিজের কথা বলার আগেই তোফা আলি খেঁকিয়ে ওঠে, তুমি চুপ কর। কথা কইলে কল্লা ফালাইয়া দিমু।

ক্যান চুপ করমু ক্যান?

ভুইলা যাও ক্যান যে আমি অরে ভাত দিছি।

কয় টেকার ভাত দিছ? টেকাটা আমি দিয়া দিমু।

টেকার গেরম দেহাও? বাইর হও বাইর হও এহান থাইকা।

তবে রে–

দু'জনে তোফা আলিকে মারতে উঠলে মেয়েটি দু'হাত প্রসারিত করে ওদের সামনে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনেরা ঝগড়া করেন ক্যান? আমারে তো জিগাইবেন যে আমি কোনহানে ঘুমামু। আপনেরা খালি খালি আমারে লইয়া বিবাদ বাধাইতাছেন?

তিন জন পুরুষ এবং একজন বালক অকস্মাৎ বোকার মতো থেমে থাকে। মেয়েটির মনে হয় ভক্ষণরত লোক দুটো স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করার ফলে ওদের দানবের মতো লাগছে। একজন গালভাঙা, শুকনো হাড়গিলার মতো। প্যাঁচা ডাকলে যেমন শোনায় তেমন তার কণ্ঠস্বর, ছোট করে চুল ছাঁটা। ধর্ষণকারী পুলিশের মতো দেখাচ্ছে ওকে। আর একজন সিনেমার খলনায়কের মতো। ওর কুতকুতে চাউনিতে হত্যাকারীর ছায়া আছে। ওর মোটামোটা গোলগাল চেহারা দেখে বমির ভাব হয় মেয়েটির। ওর দিকে সবাই লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বেশ মজা লাগছে ওর। জলফু আকস্মিকভাবে বলে, আপনে কোনহানে ঘুমাইবেন কইয়া ফালান রাজকইন্যা খালা?

ও এক মুহূর্ত ভেবে বলে, আইজ রাইতে আমি এইহানে ঘুমামু। কাইল যামু টেরাকে ঘুমাইতে। অহন তো ঢাকা শহরের বেবাক জায়গায় মোর বিছানা পাতা আছে, বলেই উচ্চকিত হাসিতে তিনজন পুরুষ মানুষকে মাতিয়ে তোলে।

তোফা আলি কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে বলে, তোমারে আমি কোনো হানে যাইতে দিমু না। এই হোডেলে কাম দিমু। ব্যাতন দিমু। তুমি এইখানে থাকবা।

আবার খলখল হাসি ছেটে মেয়েটির। ওর শরীর দোলে। ও তোফা আলির কথার উত্তর দেয় না। অন্য দুজন লোকের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনেরা যান। কাইল আইসেন।

লোক দু'জন চলে যায়। মেয়েটি বেঞ্চির ওপর পা তুলে বসে। দু'জন খদ্দের এলে তোফা আলি আর জলফু ব্যস্ত হয়ে পড়ে। থালা বোঝাই ভাত মাংস, ডাল, ভাজি দেয়। মানুষ দু'জন দ্রুত খেয়ে বেরিয়ে যায়। ওরা মেয়েটির দিকে এক পলক তাকালে তাকাতেও পারে, কিন্তু মনোযোগ দেয় না। তাহলে মানুষও আছে, এই ভাবনা নিয়ে মেয়েটি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে।

কত রাত ও জানে না। বুঝতে পারে জোড়া লাগানো কাঠের বেঞ্চের বিছানায় ও শুয়ে আছে। ওর পাশে তোফা আলি। আজ রাতে ও বাড়ি যায় নি। ওর নগ্ন শরীরে হামলা শেষ করে লোকটি এখন নিঃসাড়। ঘুমিয়ে আছে কি? মেয়েটি তা পরীক্ষা করার জন্য লোকটির গায়ে খোঁচা দিলে ও অদ্ভুত মোলায়েম কণ্ঠে বলে, কিছু কইবা রাজইকইন্যা?

আমার নাম গুড়িগাঁ।

ওই হইল, এক নামে ডাকলেই হয়।

গুড়িগাঁ নামে ডাকবেন।

আইচ্ছা ডাকুম। তুমি খুশি হইছো গুড়িগাঁ? নাকি আর একবার হইব?

খুশি? মেয়েটির ভীষণ কান্না পায়। ওর বুক ফেটে যাচ্ছে। ওর কুমারীত্ব গেছে এইভাবে। জোর করে, ঘর থেকে টেনে এনে। পাটক্ষেতে। দু'জন একসঙ্গে। এসবের ও তো কিছুই বুঝল না। আনন্দ না, বেদনাও না। কেবলই বিছুটির জ্বালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো যন্ত্রণা এবং একই সঙ্গে প্রবল ঘৃণা। আবার খুশি কি? তোফা আলি আবার ওর ওপর উঠে যায়। ও বাধা দেয় না। আজ তো বেঞ্চের ওপর একজন, কাল রাতে ট্রাকের ওপর ওকে দু'জনকে সামলাতে হবে। কাজ শেষে তোফা আলি আবার জিজ্ঞেস করে, তুমি খুশি হইছ গুড়িগাঁ?

মেয়েটি তখন বলতে থাকে, একদিন রাইতের বেলা ঘরের বেড়া কাইটা বজলু আমাগো ঘরে ঢুকে। বাজান বাড়িতে আছিল না। বজলুর লগে আরও দু'তিন জন ছিল। ওরা আমারে চিল্লাইতে দেয় নাই। গামছা দিয়া মুখ বাইন্দা পালা কইরা কাম করে। পাশের বাড়ির মাইনষে ট্যার পাইয়া বজলুরে ধইরা ফালায়। বাকিরা ভাইগা যায়। বজলুরে বেবাক লোকে চিনে। চেয়ারম্যানের পোলা। হে এমুন অকাম আরও করছে। পরদিন আমার বাপে ফিরা অইসা সব শুইনা পাথর হইয়া যায়। হেরপরে চ্যাত উড়াইয়া কইল, এর একডা বিচার চাই। গেল গাঁয়ের মোড়লের কাছে। মোড়ল কইল, এর বিচার আমি করতে পারুম না। বজলুর বাপ শক্ত বেডা। আমার ভিটায় ঘুঘু চরায়ে ছাড়ব। বাজান গেল থানায়। আমার বাপে তো দিনমুজর। হের ঠ্যাংগে তো বল নাই। দিনমজুরের কথার দাম কি। থানার পুলিশ তো টেকা ছাড়া কিছু বুঝে না। তারপরও একডা মামলা হইলো। বজলুর বাপে মামলা তুইলা লওয়ার জন্যি চাপ দেয়। বাপে তো ঘাউড়া । কারো কথা হুনে না। কেবল কয় আমি বিচার চাই। যেই দ্যাশে বিচার নাই হেই দ্যাশে আকাল নামব। আমারেও হেরা আপসরফার জন্যি চাপ দেয়। কিন্তু বাজান কোনো কথা শুনতে চায় না। হের একডাই কথা। আমি কইলাম, বাজান এইসব ছাড়ান দ্যান। বাজান আমারে ধমক দেয়। শ্যাষে বজলুর বাপে লোকজন পাডাইয়া আমাগো বাড়িতে তালা ঝুলাইয়া দিল। আমাগোরে গেরাম থাইকা বাইর কইলা দিল। আমি বাজানের লগে রাগ কইরা শহরের বাসে উঠলাম। কইলাম, বাজান বজলুর বাপের কাছে গিয়া মাফ চাইয়া আমাগো ভিডাটা ফেরত লন, গরিবের এত রাগ সাজে না। আমার মা আছে, ভাইবোন আছে। হেরা কোনহানে থাকবে কন? আমার একলার লাইগা কি বেবাক পথে নামব। আমি আমার পথ লইছি। অহন দেখুম বাঁচন যায় কি-না।

তোফা আলি শরীরটা শিথিল করে বলে, ও তাইলে তুমি কুমারী নাই! কামডা আগেই সারছে কেউ।

কুমারী হইলে কি আপনে পাইতেন?

মেয়েটি পাশ ফিরে শোয়। প্রবল তাচ্ছিল্য ওর কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়। তোফা আলি ঘরে বউ রেখে আজ রাতে একটি নতুন বিছানা সাজিয়েছে। জলফুকে দিয়ে বাড়িতে খবর পাঠিয়েছে যে ও নারায়ণগঞ্জে গেছে। জলফু এইটুকু বয়সে ভীষণ সেয়ানা। সব বোঝে। একদিন হয়তো ওকে বলবে, আমি আপনের লগে শুমু। পয়সা চাইতে পারবেন না। মেয়েটির বুক ফুড়ে দীর্ঘশ্বাস আসে। মনে মনে ভাবে যদি এমন প্রস্তাব দেয় তাহলে ও একটুও অবাক হবে না। অপমানিতও না। জীবনের পাঠ ওর গ্রহণ করা শেষ হয়েছে। দুই থালা ভাত দিয়ে ফতে আলি ওর যৌবন কিনেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগামীকাল রাতে ও কিছু পয়সা কামাবে। পয়সার খুব দরকার। তোফা আলির তো উচিত ওকে পয়সা দেওয়া।

পরমুর্হুতে ও পাশ ফিরে বলে, শুনছেন?

কও। কি কইবা?

আপনে আমারে পয়সা দিবেন না?

খেঁকিয়ে ওঠে তোফা আলি। বলে, ভাত দিছি, বিছান দিছি আবার পয়সা চাও? কামডা কি করলা?

কামডা কি করছি হেইডা আপনেও বুঝেন, আমিও বুঝি। পয়সা না দিলে আপনের বউয়ের কাছে নালিশ দিমু।

কি কইলা?

ঠিকই কইছি। আমার পয়সার খুব দরকার। আমার দিনমজুর বাজান আমার লাইগা পথে নামছে। আমি বাজানরে টেকা পাঠমু। য্যান বাজান ভিডাটা ফিরা পায়। যে বেড়া কাইটা বজলু ঘরে হান্দাইছিল হেই ঘরডা য্যান ঠিক কইরা লইতে পারে।

ওরে বাবা তুমি তো দেখছি ভীষণ সেয়ানা মাইয়ামানুষ।

কত দিবেন?

ভাবইা লই হেরপর দেখুম। বেহানে কথা হইবো। আর একবার কি হইবো?

করেন, তয় হিসাবডা রাইখেন।

তুমি রাহ নাই?

রাখছি।

তুমি এত হিসাব শিখছ? লোখপড়া কি শিখছ?

এই হিসাবের লাইগা লেহাপড়া লাগে না। এইডা মাইয়ামানুষরা এ্যামনে এ্যামনে শিখে।

তোফা আলি হো হো করে হেসে বলে, তুমি ভালাই শিখছ।

ভোররাতে আবার তোফা আলি ওর ওপরে উঠে এলে মেয়েটির ভীষণ কান্না পায়। নিজের সঙ্গে লড়াই করে ও আর কুলোতে পারছে না।

নিজেকে গুড়িগাঁর নদীটার মতো মনে হয়। যে নদীতে এককালে বিশাল বিশাল জাহাজের বহর বাণিজ্যে যেত, সে নদী এখন মরা গাঙ্গ। দু'টো নৌকা পাশাপশি চলে না। ও নিজে এখন মরা গাঙ্গ। জীবনের নব্বই ভাগ পলি পড়ে বুজে গেছে। ওই পলি আর সরবে না। তোফা আলির কাজ হয়ে গেলে ও দরজা খুলে বাইরে আসে। ভোররাত। সুনসান রাস্তা। সব মানুষের ঘর আছে। সবাই ঘুমুচ্ছে। শুধু ও জানে না যে ও কোথায় যাবে। ও আবার হোটেলে ফিরে আসে। তোফা আলির পাশে শুয়ে পড়তে পড়তে ভাবে, গত রাতে লোকটার বউ হয়তো না ঘুমিয়ে রাত কাটিয়েছে। ও এক ধাক্কায় তোফা আলিকে বেঞ্চের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে বলে, শকুন একটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও তোফা আলির ক্যাশ বাক্স খুলে টাকাগুলো নিয়ে আঁচলে বেঁধে বাইরে আসে। তোফা আলি আর ওর নাগাল পায় না। তোফা আলি টেবিলের নিচ থেকে বের হতে হতে ও একটা রিকশায় উঠে পড়ে। কোথায় যাবে? রিকশাওয়ালাকে বলে, ভাই আমারে একডা কাম যোগাইয়ে দিতে পারবেন?

কাম? কি কাম করবেন?

বাসাবাড়িতে, ইট ভাঙনের কাম, যা পাই তাই করুম।

তাইলে মোর বউয়ের কাছে লন। হে একডা কিছু করতে পারবে আপনের লাগি। কিন্তু একডা কথা।

কন, কইয়া ফালান।

আপনে কাম পাইলে মোর লগে একদিন শুইতে অইবে।

খিলখিল করে হাসতে থাকে মেয়েটি। রাস্তায় লোক চলাচল কম। বাতাসে শীতল আমেজ। বেশ লাগছে ওর এমন ফাঁকা রাস্তায় প্রাণখুলে হাসতে। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, হাসেন ক্যান?

এইডা তো সব থাইকা সহজ কাম। কহন শুইবেন? একবার মাগনা শুইবেন ক্যাবল। আর এক সময় শুইতে চাইলে টেকা দেঅন লাগব। আমার দিনমজুর বাপেরে টেকা পাঠান লাগব। বাজান আমার লাগি মেলা ঝামেলায় আছে।

বুজলাম। মুই যদি আপনেরে এমন বেহান বেলায় ঠাণ্ডাবাতাসে রিকশায় বসাইয়া ঘুইরা বেড়াই তাইলে অইবে না?

মেয়েটি গলা চড়িয়ে বলে, না অইব না। টেকা চাই। কাম করাইবেন আর টেকা দিবেন না এইডা কি অয়!

লোকটি আর কথা বাড়ায় না। দূর থেকে নিজের ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে বলে, মোর বউর ধারে যান। হে ইট ভাঙনের লাইগা মাতারি জোগাড় করে। আপনেরে পাইলে কাম দিব। মুই আর যাইতে পারুম না। মোর কথা য্যান মনে থাহে।

মেয়েটি কথা বলে না।

এরপর থেকে ওর আর কাজের অভাব হয় না। দিনমজুর বাপকে টাকাও পাঠানো হয়। ঢাকা শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের একজন ও। অদ্ভুত আনন্দ ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। ঘর ভাড়া দিতে না পারলে ফুটপাতে ঘুমিয়ে থাকে। কিংবা ট্রাকের ওপরে ঘুমুতে যায়। একবার লোকগুলোর সঙ্গে অন্য শহরে গিয়েছিল। বেড়ানোর আনন্দও পেয়েছিল। মনে হয় ভালোই তো দিন কাটছে। একদিন ফুটপাথে গর্ভবতী ছবির মায়ের কষ্ট দেখে বলেছিল, এতগুলান পোলাপাইন হওয়াইলেন ক্যান?

ছবির মায়ের নির্বিকার উত্তর, ফুটপাতে ঘুমাই। কত বেডারে ফিরামু!

মেয়েটির বিস্ফারিত চোখে অদ্ভুত শঙ্কার জন্ম হয়। ও বিড়বিড় করে। হিসেব কষে এবং আঁতকে উঠে ভাবে যে গত মাস থেকে ওর মাসিক বন্ধ আছে। তাহলে কি? দিন গড়ায়। কঠিন সত্য এখন ওর সামনে। ও ইট ভাঙার কাজ করতে পারে না। কোনো বাড়িতে কেউ ওকে কাজে রাখে না। শুধু হোটেলে মসলা বাটার কাজ করে। কোনোরকমে দিন গুজরান মাত্র। ভাবে, তাও তো দিন কাটছে। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঁচু পেটের দিকে তাকিয়ে কেউ বাঁকা হাসে। কেউ পাচটা টাকা গুঁজে দেয়। তবু ঢাকা শহরের আস্তাবলে ও একটি অলৌকিক শিশুর জন্ম দিতে চায়, যে এই শহরের ময়লা আবর্জনা নিজের মাথায় উঠিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে এসে সবাইকে বলবে, দেখেছো কত সুন্দর শহর। মানুষেরা নিজের বুকের দিকে তাকিয়ে দেখবে ওখানে আবর্জনা নেই। আশ্চর্য পরিষ্কার বুকের কন্দরে টলটলে জল খলবল করে। কিন্তু কোনো কোনো মানুষ থাকবে যাদের বুকের পাথরের দেয়াল ভেদ করে পরিষ্কার জল ঢুকতে পারবে না। ওরা ছেলেটির জন্য ফাঁসির দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে বলবে, শহর পরিষ্কার করেছ? বাহাদুরি দেখানোর জায়গা পাওনা? এই অপরাধের জন্য তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

মেয়েটি আঁতকে উঠে নিজের উঁচু পেটের ওপর হাত রাখে। ছবির মা বলে, তোর প্যাড দেইখা মনে অয় বাইচ্চা বোদঅয় দুইডা।

মেয়েটি খিলখিল করে হাসে। বলে, এক কষ্টে দুইডা পামু। ভালাই তো।

বাপের তো হদিস নাই। পালবি কেমনে?

রাস্তার পোলাপান আবার পালা লাগে নাহি? অরা তো এ্যামনে এ্যামনে বড় অয়।

আবার সেই বাঁধভাঙা খিলখিল হাসি। ভাবে ওর নিজের তো বাপ আছে। দিনমজুর বাপ। সে-ইবা ওর জীবনের কি এমন বড় কাজে এসেছে।

সেদিন নীল পূর্ণিমার রাত। ওর মনে হয় ব্যথা উঠেছে। ও বস্তির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ব্যথার দমক বাড়ছে। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। রাজপথ সুনসান। ও রাজপথের মাঝখানে শুয়ে পড়ে। প্রবল শীতল বাতাস ওর শরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে। ব্যথার কঁকানিতে ছুটে আসে রাস্তার কুকুর। ওর কাছাকাছি বসে প্রসবের আর্তনাদ শোনে। কখনো খুব কাছে এসে ওর মাথা চেটে দিয়ে যায়।

নীল পূর্ণিমার রাতে মেয়েটি দুটো যমজ শিশু প্রসব করে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে। ও ভীষণ খুশি হয়। আস্তাবলে পরিণত হওয়া এই শহরের রাস্তাটা যে এই মধ্যরাতে এত সুন্দর হতে পারে মেয়েটি তা ভাবতে পারে না। এই কয়েক মাসে ও শহরের কোনো সৌন্দর্য দেখে নি। ও কোনোরকমে সোজা হয়ে বসে কোমরে গুঁজে রাখা নতুন ব্লেড দিয়ে শিশুদের নাড়ি কাটে।

ও জানে আর কিছুক্ষণ পরে আলো ফুটলে বস্তির নারীরা ওর খোঁজ করবে। ওরা ঠিকই এই রাজপথে এসে দাঁড়াবে। একে-অন্যকে বলবে, দ্যাহো, দ্যাহো গুড়িগাঁ একডা কামের মতো কাম করছে। একলগে দুইডা সন্তানের জন্ম দিছে। কি সোন্দর ফুটফুইট্যা মাইয়া পোলা। আয় আমরা অরে কান্দে উডাইয়া ঘরে লইয়া যাই। আমাগ ঘরে আজ যা আছে হের বেবাগডা ও পাইব। অরে কমু গুড়িগাঁ তোর নামডা কবি না?

মেয়েটি আনন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, হ কমু তো, আমার নাম কমু। এই শহরের বেবাক মানুষে হোনো আমর নাম পুষ্পলতা।
আমার লতায় হাজার রহম ফুল ফুডাইতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা

ছাব্বিশ বছরের তনুশ্রী পঁচাশি বছরের ফখরুল আহমদ চৌধুরীর প্রেমে পড়েছে।

তনুশ্রীর যক্তি একটাই, না আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কাছে ওর কোনো জবাবদিহির উত্তর এটা নয়, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার সময় এই যুক্তি দাঁড় করানো একসময় দরকার ছিল ওর। এখন আর যুক্তিফুক্তি লাগে না। নিজেকে সামলে ফেলেছে। এখন সত্যিটা ভারি সুন্দর।

ওর যুক্তি ভদ্রলোককে দেখতেই বুড়ো দেখায়, কিন্তু তার আচরণে, ভাষার প্রকাশে এবং যৌন আকাঙ্ক্ষায় তার মধ্যে তারুণ্যের দীপ্তি জ্বলজ্বল করে। তার সঙ্গে কমিউনিকেশনে অসুবিধা নেই। চমৎকার ভঙ্গিতে পুরো আবহ এমন মোহনীয় করে ফেলে যে মুগ্ধতার রেশ কাটে না।

আর বয়স? বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত তো একজন যুবকও হতে পারে, যার ভেতরে সৃষ্টিশীল উচ্ছ্বাস একদমই অনুপস্থিত। বয়সে কিছু এসে যায় না।

অতএব তনুশ্রী আপন ভাবনায় মশগুল। ফখরুল আহমদ চৌধুরী ওকে নিবিড় কণ্ঠে বলে, সম্পর্ককে কখনো বিয়ে নামক ইন্সটিটিউশনে ঠেসে ফেলা উচিত নয়। সম্পর্ক হবে সীমানাহীন, রঙিন এবং রঙের সুতোয় সম্পর্কের প্রতিটি গিট্টু হবে অমলিন। এই গিট্টু খোলার সাধ্য কারও নেই, বুঝলে হীরের টুকরো। তোমার হাতটা দাও আমি ধরে রাখি। তোমার হাতটা বড় পবিত্র, মায়াবী এবং স্নিগ্ধ। তোমার হাত ধরলে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায়। মনে হয় কেউ যেন আমার মাথার কাছে বসে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। আমি ঘুমুচ্ছি ঘুমুচ্ছি– ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি। আমার জীবনে ঘুমের খুব অভাব রে মেয়ে।

এসব কথায় অভিভূত হয়ে যায় তনুশ্রী। অপলক তাকিয়ে থাকে মানুষটির দিকে। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায় ধানমন্ডির লেকে। পাখিদের ডানায় ঘরে ফেরার তাড়া। তনুশ্রীর শরীরে শিহরণ, এমন মানুষই তো চাই, যার যৌবন উদ্দীপিত করে দেয় শরীর এবং মনের সবটুকু। বয়সের হিসেবে গরমিল হলে হোক, কিছু এসে যায় না। তনুশ্রী জানে অন্ধকার নামলেও ও মানুষটির সবটুকু দেখতে পায়। এত গভীর দৃষ্টিতে দেখে রেখেছে যে দেখায় ভুল হয় না। তার গালভাঙা মুখে ক্লান্তির ছাপ, বয়স তাকে ছুঁয়েছে এটুকুই। আর কোথাও নয়। তার প্রশস্ত কপাল, ফাঁকা হয়ে গেছে মাথার অনেকখানি, ফ্যাকাশে লালচে চুল পুরোটা সাদা নয়। জোড়া ভ্রু, ফর্সা গায়ের রঙ এবং টানা ঋজু ফিগার– শুকনো কিন্তু ভাঙা নয়। আশ্চর্য ভরাট কণ্ঠে দারুণ আবৃত্তি করে রবীন্দ্রনাথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন কলেজের শিক্ষক ছিল। বলে, তনুশ্রী পড়ানো ছাড়া আমি আর কিছু পারতাম না। সাহিত্য পড়াত মানুষটি। ইংরেজি সাহিত্য। টিএস এলিয়ট তার প্রিয় কবি। অন্য ক্লাসের ছেলেমেয়েরাও এসে তার ক্লাসে ভরে যেত। মুগ্ধ হয়ে শুনত তার লেকচার।

তনুশ্রী বিস্ময়সূচক ধ্বনি তুলে বলত, তখন কেন আমার জন্ম হয় নি। কেন আমি সে সময়টুকু পেলাম না।

হাসিতে পৌরুষের রেশ ছড়িয়ে লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমার এখনকার সময়ের সবটুকু তোমাকে দেব বলেই তখন তোমার জন্ম হয় নি।

তনুশ্রী এমন উত্তরে ধাক্কা খায় না। ভাবে না যে তাহলে কি মানুষটি তার জীবনের এক এক সময়ে এক একজনকে পেয়েছে? যারা বিশেষ বিশেষ সময়ের ব্যবধানে তার জন্য জন্মগ্রহণ করেছে?

মুগ্ধ তনুশ্রীর বুকের ভেতরে প্রশ্ন নেই। তার একটি কারণ আছে। লোকটির অনেক গল্প আছে, সে গল্পগুলো তনুশ্রীর সবই জানা। তার তিন ছেলেমেয়ে অসাধারণ মেধাবী। বিদেশের নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। খুব কমই দেশে আসে। বেশিরভাগ সময় বাবাকে নিয়ে যায় ওরা। স্ত্রী ছিলেন। বিদুষী নারী। সভাসমিতি, নারী সংগঠন, লেখাপড়া, চাকরি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সেই সঙ্গে দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ঘর সংসার দেখতেন। তার কোনো খুঁত ছিল না। বাবার কাছ থেকে একটি চমৎকার বাড়ি পেয়েছিলেন ধানমন্ডিতে। তার বাড়ির গোলাপ বাগান মানুষের আলোচনার বিষয় ছিল। সেই স্ত্রী বছর দুই আগে মারা গেছেন। স্বামী স্ত্রীর প্রেম নাকি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের চেয়েও বেশি ছিল।

এত কিছু শুনে তনুশ্রীর তৃষ্ণা বেড়ে যায়– ভালোবাসার সরোবরে ডুবে যাওয়ার তৃষ্ণা।

কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলে ওকে ভালোবাসার কথা বলেছিল, কিন্তু এমন করে বলার সাধ্য ওর ছিল না। সেইসব কথা তখন শুনতে বেশ ভালো লাগত, কিন্তু এখন ফখরুলের কথা শুনে মনে হয় কি অবান্তর পানসে কথা ছিল সেগুলো। মনে করলে হাসি আসে। এখন আপন মনে হেসে নিজেকে করুণা করে।

শুধু এটুক নয়, করুণা করার আরও একটি জায়গা আছে ওর। কলেজে পড়ার সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। সেবার কলেজ বন্ধ ছিল। নানার অসুখের খবর শুনো ওর মা ওর কাঁধে সংসারের দায়িত্ব দিয়ে তড়িঘড়ি বাবাকে দেখতে চলে যায়। ছোট পাঁচ ভাইবোনের দায়িত্ব নিয়ে ও বেশ হিমশিম খাচ্ছিল। একদিন রান্না করার সময় জামা এবং ওড়নায় আগুন লেগে ওর দু'হাত এবং ঘাড়-গলা পুড়ে যায়। বেঁচে থাকার কি দীর্ঘ সাধনা করতে হয়েছিল ওকে। এখন ভাবলে শরীর হিম হয়ে যায়। শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণার ভেতরে দুঃসহ দিন রাতের কথা এই মানুষটির সান্নিধ্যে আসার পরই ও ভুলতে পারছে। সবটাই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। এইসব সঞ্চয় তিলতিল করে মানুষের বেঁচে থাকার নানা অর্থ তৈরি করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তনুশ্রী আচমকা প্রশ্ন করে, যে ছেলেটি আমাকে ভালোবাসার কথা শুনিয়েছিল সে তো একদিনও আমার সঙ্গে দেখা না করে বিনা দ্বিধায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

তাতে তোমার কোনো পরাজয় নেই। লজ্জা ওর, ছোট হলে ও হয়েছে। ও নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবে না শ্রী। যে আগুনে তুমি পুড়ে গেছ তার চেয়েও কঠিন আগুনে ও নিজেকে দহন করছে।

সত্যি? ও এমন শাস্তি পাবে?

একদম সত্যি। শাস্তি ও পাবেই শ্রী।

তখন তনুশ্রীর মুহূর্তটি হাওয়াই বাজির ফুলকিতে ঝলসে ওঠে। সেই সঙ্গে মানুষটির কণ্ঠে শ্রী ডাক ওকে বিমোহিত করে। নিজেকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। লোকটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজকে হালকা করার সাধ জাগে। কিন্তু কাজটি কঠিন। লোকটি ওই দূরত্ব রাখে।

একদিন তার সঙ্গে একটি পুরো দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরলে মা প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলি তনু?

বান্ধবীর বাড়িতে।

কোন বান্ধবী? সবাইকে তো আমি চিনি।

তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?

সরাসরি কথা বলছিস না কেন?

মা প্লিজ এভাবে আমাকে জেরা করবে না।

একটা ছোট বিষয় জানতে চাওয়া কি জেরা হলো?

তনুশ্রী মায়ের দিকে তাকাতে পারে না। ঘরে ঢুকে দরজা আটকায়। যে ঘরে ওরা চার বোন থাকে। বোনরা ড্রইংরুমে টেলিভিশন দেখছে। আপাতত কেউ ওকে বিরক্ত করবে না। কিন্তু ওর ভয় করে। মায়ের কাছে ও আজ ধরা পড়েছে। মা যখন জানবে যে এমন একটি অসম সম্পর্ক নিয়ে ও মেতে আছে তখন মা কি করবে? বলবে কি, একবার পুড়ে গিয়ে লজ্জা হয়নি? আবার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছ?

এমন প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে তা ওর মাথায় আসে না। ও বালিশে মুখ গোঁজে। আজ একটি স্বপ্নের দিন গেছে। কাজের লোক দুটিকে ছুটি দেয়া হয়েছিল। ও রান্না করেছে। মানুষটিকে ভাত মাখিয়ে খাইয়েছে। কত খুনসুটি, কত কথা। কেমন হলো ব্যাপারটা? ও উঠে বসে। পায়চারি করে। দরজাটা হাট করে খুলে দেয়। বাইরে বাবার কণ্ঠ শুনতে পায়। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত কণ্ঠ। ওর সঙ্গে ইদানীং খিটখিটে আচরণ করে।

নিম্নবিত্তের সংসার ওদের। টেনেটুনে দিনযাপন মাত্র। যে মানুষ উপার্জন করতে পারে না সে ছেলেমেয়ের বোঝা বাড়ায় কেন? ও বাবার মুখোমুখি হবে না বলে বাথরুমে ঢোকে। বাবার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় মন ভরে যায়। খিটখিটে মেজাজের মানুষটির চক্ষুশূল এখন ও। বাবাও তো পুরুষ। জন্ম দেয়ার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলাফল মনে রাখে নি। এখন সন্তানের ওপর পৌরুষের দাপট প্রদর্শন! যে দুর্ঘটনার জন্য ওর কোনো দায় নেই সেটিকে ধরেই ওর জীবনে নরক গুলজার করছে। ও নিজেকেই বলে, প্রতিশোধ নেব। একদিন এই বাড়িতে ঘোষণা দেব যে বাবার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সি পুরুষকে অমি স্বামী বানাতে পারি। বয়সে কি এসে যায়। হাঃ।

তনুশ্রী ভুলে যায় ওর দগ্ধ শরীরের কথা। মানুষটির পাশে শুয়ে একদিন ও অনুভব করেছিল, জীবনের কষ্টগুলো অনায়াসে দূরে ঠেলে দেয়া যায় যদি ঠিক জায়গা খুঁজে নেয়া যায়। মানুষটি কী প্রবলভাবে বুঝিয়েছিল যে শারীরিক আনন্দ কি। বয়স কোনো বাঁধা হয় নি। বার্ধক্য অতিক্রম করার এই জাদুকরি শক্তি ওকে স্তম্ভিত করার পরে সেই শক্তির কাছে নিজের আনন্দ নিবেদন করছিল ও। বলেছিল, যে সৌন্দর্য আমার কেড়ে নিয়েছ তা আবার অন্যভাবে ফেরত দিয়েছ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

মানুষটি একদিন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় ধানমন্ডি লেকের জলের ধারে বসে বলেছিল, এ মাসের পিরিয়ড তোমার হয়েছে তো শ্রী?

আমার পিরিয়ড ইররেগুলার। এ মাসের ডেট পনেরো দিন পার হয়ে গেছে।

বলো কি?

মানুষটি আঁতকে উঠেছিল। থরথর করে কেঁপে উঠেছিল শরীর।

তনুশ্রী খিলখিল হাসিতে জলের তরঙ্গ তুলে বলেছিল, এসব নিয়ে আমি ভাবি না। আমার কাছে আনন্দটাই প্রধান। পেট যদি বেঁধে যায়, বাঁধবে। ঘাবড়াবার কি আছে।

দোহাই লাগে তুমি এভাবে কথা বলো না।

মানুষটির কণ্ঠে আর্তনাদ ছিল। বলেছিল, এরপর আমি তোমার জন্য পিল কিনে রাখব।

হাঃ পৃথিবী বড্ড নিষ্ঠুর।

ওর ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল। তারপর ভীষণ তিক্ত কণ্ঠে বলেছিল, তুমি ভয় পেয়ো না। কিছু যদি হয়ে যায় সে দায় আমি সামলাব। ফেলে দেওয়া কোনো ব্যাপার না। তবে আমার ধারণা তুমি এখন আর সেই বীর্য বহন করছ না যেটা আমাকে সন্তান দিতে পারে। বয়স হয়েছে না।

বয়স?

মানুষটি ওর কথায় আশ্বস্ত হয়ে বলেছিল, বয়স আমি মানি না। তারপর কণ্ঠে প্রবল অনুরাগ ছড়িয়ে বলেছিল, তোমার জীবনে আমিই তো প্রথম পুরুষ শ্রী?

হ্যাঁ।

তোমার কুমারিত্ব আমিই পেয়েছি?

হ্যাঁ।

ওহ কি আনন্দ। মনে হচ্ছে আমার সামনে নয়জন মিউজের একজন বসে আছে। আমি কি ভাগ্যবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তনুশ্রীর মন খারাপ হয়ে যায়। মানুষটির কণ্ঠে পুরুষের আধিপত্য অনুভব করে ও। বলতে চেয়েছিল, আমি তোমার জীবনে প্রথম নারী নই। তাই তোমাকে নিয়ে আমার সেই আনন্দ নেই। আমি সেই আনন্দ পেতেও চাই না।

কি হলো তুমি এমন শীতল হয়ে গেলে কেন তনুশ্রী?

আমি তোমার কণ্ঠে আমার বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

ওহ, ওই বাজে লোকটির কথা তুমি আমাকে বলো না। ও কোনো মানুষই না।

বাবার রূঢ় আচরণের কথা তো ও নিজেই মানুষটিকে বলেছে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসার পরে বাবা ওকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিল, তোকে নিয়ে আর পারি না। তুই মরতে পারলি না! এত মানুষ মরে, আর আজরাইল তোকে চোখে দেখে না!

তনুশ্রী দাঁত কিড়মিড় করে প্রতিজ্ঞা করেছিল, এই দগ্ধ শরীর নিয়েই নিজেকে দাঁড় করাব। যতদিন সময় লাগে ঠিক ততদিন। তারপর একদিনও এ বাড়িতে না।

ওর এমএ ফার্স্ট পার্ট পরীক্ষা চলছে। ফাইনাল হলে কোনো না কোনো চাকরিতে ঢুকবে। চাকরি? ভাবতেই শরীর শক্ত হয়ে যায়। একবার একজন শিক্ষকের লিভ ভ্যাকান্সিতে একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছিল। দু'দিন পরই একজন অভিভাবক প্রিন্সিপালকে নালিশ দেয়, এই টিচারের ক্লাস করতে আমার ছেলে ভয় পায়। এই টিচার থাকলে আমি স্কুলে ছেলে পাঠাব না।

পরদিন প্রিন্সিপাল কয়েক দিনের বেতন দিয়ে ওকে বলেছিল, শিশুর দিকটিই আমাকে দেখতে হলো। আমি সরি।

তনুশ্রী কথা বলতে পারেনি। কাঁদতে পারেনি। শুধু বুঝেছিল, বাস্তব বড় নির্মম। এই নির্মমতার স্বরূপ ওকে বুঝতে হবে।

তখনও হাতের মুঠিতে ধরা ছিল কয়েকটি টাকা। রাস্তায় নেমে মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি আর সিঙাড়া কেনে ভাইবোনের জন্য। তারপর বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়ায়। পাশ থেকে কেউ একজন মৃদু ধাক্কা দেয় ওকে। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, কাকে ছ্যাক দিয়েছিলেন যে এসিড খেতে হলো? তনুশ্রী লোকটির দিকে তাকাল, লোকটি বলে, ভাগ্যিস আপনার মুখটা বেঁচে গেছে। ভারি সুন্দর দেখতে আপনি। এভাবেই মানুষের অনুকম্পা কখনো ওকে স্পর্শ করেছে, কখনো করেনি। বেশিরভাগ সময়ই কারও প্রশ্নের উত্তর দেয় ন। প্রয়োজনই মনে করে না। ও তো নিজের ভেতরে জগৎ গড়েছে। কত উপকরণ সে জগতে আছে। কোনটা ছেড়ে কোনটা ও আঁকড়ে ধরবে!

কত দিন গড়াল এভাবে মনে রাখে নি। একদিন পরীক্ষা শেষ হলো তনুশ্রীর। রেজাল্ট হলো। ছোটখাটো একটি চাকরি পেল। ভাবল, এটুকু নিজের চলার জন্য যথেষ্ট। প্রথম মাসের বেতনটার অর্ধেকের বেশি বাবার হাতে তুলে দিয়ে বলল, এভাবে তোমার ঋণ শোধ করব আমৃত্যু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি বললে? হুঙ্কার দিয়ে ওঠে ওর বাবা।

হুমকি দিও না। যা বলেছি তুমি তা বুঝেছ।

সবার বিস্মিত বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দিয়ে বেরিয়ে আসে তনুশ্রী। রিকশা ধরার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় একদিন এমন রূঢ় ভাষায় সেই মানুষটিকে একটি কথা বলেছিল। মানুষটি একদিন এক পাতা পিল দিয়ে বলেছিল, তোমার কাছে রাখো।

ও বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেছিল, তুমিই রাখো। আমার দরকার নেই।

খাবে তো তুমি।

আমি তো খাব না।

কেন?

বলেছি না কিছু হলে দায় আমার।

বাব্বা, তুমি তো বেশ জেদি মেয়ে।

তবে কিছু হবে না। হলে এতদিন হয়ে যেত। এটা আমি বুঝে গেছি।

তুমি ভীষণ বুদ্ধিমতী। দারুণ মেয়ে।

তোমাকে আশঙ্কা থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। তবে তোমার পৌরুষে খানিকটুকু আঘাত লেগেছে, নাকি?

মানুষটি তনুশ্রীর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। রূঢ় কথা শুনতে তো খারাপ লাগেই। তারপরও সেটা হজম করতে হয়।

তনুশ্রী কখনো নিজেকে প্রশ্ন করেছে, আমি যদি ওকে ভালোবাসি তাহলে এমন রূঢ় হই কেন? পুরুষের আধিপত্য কখনো অসহ্য লাগে। ওরা যেটুকু তার চাইতে বেশি নারীর কাছে দাবী করে। ঠিক চিন্তা করেছি কি? বোধ হয় ঠিক চিন্তাই করেছি। আমার অভিজ্ঞতা তাই বলে। বাবা আমাকে ভালোবাসার চেয়ে মেজাজ দেখাচ্ছে বেশি। সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে। আমি তার সহানুভূতিই বেশি পেতে পারতাম। পাচ্ছি না। এই যুক্তিহীন রূঢ়তা দিয়ে তিনি আমাকে দমিয়ে রাখছেন। কারণ আমি যেন সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন না তুলি। আর এই মানুষটি কখনো নিজের পাওনাটুকু বড় কঠিনভাবে আদায় করে। সেখানে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের চিন্তাটুকু আত্মস্থ করে তনুশ্রী আকাশ দেখে। বুক ভরে বাতাস টানে। নিজের দগ্ধ শরীরের মতো নিজের দগ্ধ ভবিষ্যৎ অবলোকন করে। ছোট বোন বনিতা মাঝে মাঝে বলে, আপু তোমার জন্য আমার খুব কষ্ট হয়। তোমার যদি বিয়ে না হয় তাহলে আমিও বিয়ে করবো না। আমরা দুজনে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকব। চাকরি করব। আমরা দু'জনে দুটো বাচ্চা পালক নেব। এভাবে আমাদের একটি ফ্যামিলি হবে।

তনুশ্রী বলে, এটা কেমন ফ্যামিলি?

বনিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে। ভীষণ হাসতে পারে। হাসতে হাসতে চোখ বড় করে বলে, ফ্যামিলিই তো। মূল ফ্যামিলির মতো নয়। শাখা পরিবার বলতে পারো। মূল ফ্যামিলির ডালপালা আর কি? ব্রাঞ্চ ফ্যামিলি হয় না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চয় হয়। হবে না কেন? কতগুলো মানুষের একসঙ্গে থাকা। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ভালোবাসা শেয়ার করা। ভালোইতো। কিন্তু আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। তোকে আমি মূল ফ্যামিলির বাইরে আসতে দেব না। তোর ভাবনা মতো আমিই একটা ফ্যামিলি করব। তুই আমাকে তোর একটা বাচ্চা দিবি। দিবি না?

উহু, না। তা হবে না। বাচ্চ যদি জন্ম দেই সেটা আর কাউকে দিতে পারব না।

বলতে বলতে হা হা করে হাসে বনিতা। তার চাইতে বাচ্চাই নেব না। অন্যের বাচ্চা এনে ঘর বোঝাই করব। যত খুশি তত, মানে আমাদের সামর্থ্যে যে কয়টা পালতে পারব সে কয়টা।

আবারও হেসে গড়িয়ে পড়েছিল বনিতা। তনুশ্রী ওর কথায় খুব মজা পেয়েছিল। ভেবেছিল বনিতা ওকে সতেজ বাতাস দিয়েছে। চমৎকার স্নিগ্ধ। এভাবে র্থবহ বাঁচার ধারণা মন্দ নয়। কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে প্রবল একটা ধাক্কা দিয়ে বলেছিল, আমি মূল পরিবার চাই। হোক না বিরাশি বছর বয়স, তাতে কি এসে যায়। ঘরের স্বাদ পাবে, প্রতিদিনের গৃহস্থালির ছবি মন ভরে দেখবে, মানুষটিকে ভাত মাখিয়ে দিলে মানুষটি ওকে এক লোকমা খাওয়াবে ও মানুষটিকে এক লোকমা। প্রতিদিন বিছানায় নতুন চাদর পেতে দেবে, সঙ্গে তাজা ফুল। আর কি? ওর চোখ বুঁজে আসে, ও আবেশে দম বন্ধ করে।

দু'দিন পরে ও মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মানুষটি তখন তার বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় রকিং চেয়ারে দুলতে দুলতে নোরা জোন্সের গান শুনছিল। ও নিঃশব্দে কাছে গিয়ে বসে চেয়ারের পাশে মেঝেতে পা গুটিয়ে। রেলিংয়ের ওপাশ থেকে কামিনী ফুলের গন্ধ আসছে। পুরো পরিবেশে দেখে ওর মনে হয় সবটুকই ওর অনুকূলে। ও আলতো করে হাত ধরলে মানুষটি চমকে উঠে বলে, তুমি!

অমি চলে এসেছি।

চলে এসেছ? মানে?

এখন থেকে আমি তোমার। তোমার কাছে থাকব।

মানে? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

মানে তো একদম সোজা। আমার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছে তোমার সঙ্গে সংসার করার। আমি ঘর চাই।

ঘর? লোকটা বিমূঢ়ের মতো উঠে বসে। মানে বিয়ে?

হ্যাঁ, তাই তো। বিয়েই তো হতে হবে।

আমি তো আর বিয়ে করব না। বিবাহিত জীবন একবার যাপন করেছি। আর করতে চাই না। তোমাকে তো আমি শুরুতেই বিয়ে সম্পর্কে ধারণা দিয়ে দিয়েছি। এখন এসব কথা ওঠাচ্ছ কেন?

আমি তো বিবাহিত জীবনযাপন করি নি। আমি সে জীবনযাপন করতে চাই, সেজন্য কথা উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওহ, শ্রী তুমি আমাকে পাগল বানিয়ো না।

আমি বুঝেশুনে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলছি।

আমি স্যরি।

মানুষটি চেয়ারের গায়ে মাথা হেলিয়ে দেয়।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তনুশ্রী চেঁচিয়ে বলে, তুমি এতদিন তাহলে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ?

আমি তোমার সঙ্গে কোনো প্রতারণা করিনি। তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার কাছে এসেছ। এখন তুমি লোভী হয়ে উঠেছ?

লোভী? তনুশ্রী বিস্ময়ে, অপমানে গলা ফাটিয়ে বলে, লোভী? কিসের লোভ? বিয়ে মানে আমার সঙ্গে তোমার একটি আইনগত ভিত্তি লাভ করা এবং আমার সম্পত্তি দখল। ওহ, গড । সেদিনও তুমি আমাকে অপমান করেছ।

সেদিন?

হ্যাঁ, সেদিন। যেদিন তুমি আমাকে একটা ভাঁজ করা প্যান্টি এগিয়ে দিয়ে বলেছিলে, আমি এটা ভুলে ফেলে গেছি। সেদিন আমি তোমাকে বলিনি যে ওটা আমার প্যান্টি ছিল না।

মানুষটি আকস্মিকভাবে রেগে বলে, তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছ?

না।

তবে তোমার মুখোশটা তোমাকে ধরিয়ে দিতে চাই।

স্টুপিড মেয়ে, তুমিই আমার কাছে এসেছ।

আর তুমি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছ। ভান করেছ। অভিনয় করেছ। তোমার প্রতি আমার আবেগ মিথ্যে নয়। তোমারটা কতটা এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে।

তুমি যদি আমাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করো তবে আমি বাধ্য হবো থানায় ডায়েরি করতে।

এটাও তুমি ভেবে রেখেছ?

কোনো কোনো নারীর কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তো ভেবে রাখতেই হয়।

তনুশ্রীর সমানে বিপুলা পৃথিবী প্রবল বেগে নড়ে ওঠে। ও মানুষটিকে দেখতে পায় না। দেখতে পায় তার কুৎসিত নগ্ন শরীর পোকায় খাওয়া এবং দুমড়ানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুন্তলার অন্ধকার

কুন্তলা সাত বছরের বালিকা। এখন পর্যন্ত বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। ওর মনে শান্তি নেই। কারণ বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে ও প্রায়ই দেখতে পায় বাবা মাকে ধরে মারছে। মারের সময় যেসব কথা বলে তা শুনে ওর ভীষণ ভয় করে। কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ওর।

বাবা বাড়িতে না থাকলে ও মাকে বলে, তুমি পালিয়ে যাও মা।

পালিয়ে যাব? কোথায়?

যেখানে খুশি যেতে চাও সেখানে।

শিউলি বেগম ভ্রু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকায়।

তাকিয়ে আছ কেন? তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই?

কে আমাকে খাওয়াবে?

কেন তোমার বাবা! আমার নানা।

বাবা আমার বোঝা আর কত টানবে?

বোঝা? তুমি নানার বোঝা?

শিউলি বেগম চুপ করে থাকে। বলতে পারে না যে তোর বাবা আমাকে তোর নানার বোঝা বানিয়েছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে কুন্তলার ভীষণ ভয় করে। ওর মনে হয় ও মাকে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে ভীষণ অন্ধকার। অন্ধকারের হাত-পা আছে এবং সেটা ওকে গিলে খেতে আসছে। ওহ মাগো, বলে কুন্তলা শিউলি বেগমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শিউলি ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, কী হলো সোনা?

আমি কি আমার বাবার বোঝা?

শিউলি বেগম মেয়ের মাথার ওপর মুখ নামিয়ে নিশ্চুপ থাকে। বলতে পারে না যে তুমিও বোঝাই তো। এক সময় তোমার বোঝাও তোমার বাবা টানতে পারবে না।

কুন্তলার বাবা মুস্তাফিজ ছোটখাটো চাকরি করত, এখন চাকরি নেই। মাঝে মধ্যে কিছু একটা করে, তাতে সংসার চলে না ঠিকমতো। শিউলি বেগম গৃহিনী। উপার্জনহীন অসহায় নারী। দু'জনের ঝগড়া লেগে থাকে সারাক্ষণ। এই ঝগড়ার দৃশ্য দেখতে হয় কুন্তলাকে। ঝগড়ার পরে মুস্তাফিজ শিউলি বেগমকে মারতে শুরু করলে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখে ও। শুনতে পায় অদ্ভুত খ্যাসখেসে কণ্ঠে বাবা চিৎকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। মাকে গালাগালি করার সময় ওর বাবার কণ্ঠস্বর বদলে যায়। বাবাকে ও তখন চিনতে পারে না, যেন দূরের কেউ, অন্য কোনো জায়গা থেকে এসছে। ওর ভূগোল বইয়ে এমন কোনো জায়গার কথা লেখা নেই। কুন্তলা বাবার খ্যাসখেসে কণ্ঠস্বরে বিদঘুটে কথাগুলো শুনতে পায়: তোর বাপের কাছ থেকে আমার জন্য টাকা নিয়ে আয় মাগী। টাকা এনে না দিলে তোকে আমি মেরে ফেলব। খুন করব। হারামজাদী একটা। বিয়ের সময় যৌতুক দেয়ার কথ ছিল। দেয়নি। আমি আর সহ্য করব না। টাকা নিয়ে আমি বিদেশ যাব। কামাই করব। একটা কেন্নো হয়ে ঢাকা শহরে থাকতে পরব না। বল টাকা আনবি কি-না?

শিউলি বেগম জোরের সঙ্গে বলে, বাবার কাছে টাকা চাইতে পারব না। আমার বাবার টাকা নাই।

শুরু হয় পিটুনি। চুলের মুঠি ধরে দমাদম পড়ে পিঠের ওপর। মাঝে মাঝে শিউলি বেগম রুখে দাঁড়ায়। কিন্তু সবসময় গায়ের জোরে পারে না। সেদিন পিটুনিটা বেশি খায়। মারধর করে মুস্তাফিজ বেরিয়ে গেলে কুন্তলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় মা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। শরীর ফুলে ফুলে উঠছে, পিঠময় ছড়ানো লম্বা চুলের গোছা দেখে কুন্তলার মনে হয় মায়ের পিঠে অন্ধকার জমে আছে। ওর বুক ফেটে যায়। ওর বুক কুঁকড়ে যায়। আসলে বুকের ভেতরে কি যে হয় ও নিজেই বুঝতে পারে না।

এক পা দু'পা করে খাটের কাছে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলে শিউলি বেগম প্রথমে মাথা তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকায়, তারপরে উঠে বসে। লাল হয়ে যাওয়া চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে আসে– ক্রন্দনরত চেহারা বীভৎস হয়ে থাকে– আলুথালু চুল সাপের মতো পেঁচিয়ে ওঠে– সে চেহারার মাকে দেখে কুন্তলা চিৎকার করে বলে, তুমি একটা পেত্নী। তোমকে শাকচুন্নির মতো লাগছে। আমি এমন মা চাই না। চাই না।

শিউলি বেগম মেয়ের দিকে হাত বাড়াতে পারে না। বুঝতে পারে মেয়ে ওর নাগালের মধ্যে নেই। ওকে ধরার সাধ্য নেই। কুন্তলা ভীত কণ্ঠে আর্তনাদ করে, তুমি এ বাড়ি থেকে না পালালে ওই দৈত্যটা তোমাকে গলা চেপে মেরে ফেলবে মা।

মেযের কথা শুনে শিউলি বেগম নিথর হয়ে যায়। স্খলিত কণ্ঠে বলে, আমি পালালে তুই আমার সঙ্গে যাবি?

জানি না।

কুন্তলার দৃষ্টি ইতস্তত ঘোরে। তবু ও দাঁড়িয়ে থাকে। শিউলি বেগম মেয়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, যাবি না? কুন্তলা নিরুত্তর। শিউল বেগম বিস্ময়ে-আতঙ্কে মেয়েকে দেখে। ওর বুক ফেটে যায়। এইটুকু মেয়ের আচরণে ওর পৃথিবী ধসে যায়। ভাবে আশ্রয়ের শেষ জায়গাটাও বুঝি আর নেই। শিউলি বেগম স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। কুন্তলা মায়ের সামনে থেকে সরে যায়। ওর ভয় করে। ওর দম আটকে আসছে। ও বারান্দায় এসে একা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। আবার মায়ের কাছে ফিরে যায়। ওখানে গিয়েও ওর গা ছমছম করে। আবার বারান্দায় ফিরে আসে। দেখতে পায় মুড়ি আর কলা নিয়ে ওর বাবা ফিরছে। তার চেহারাটও এখনও সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দানবের মতো, যে দানবটা রক্ত খায়। চোখ লাল হয়ে আছে, চেহারা থেকে হিংস্র ভাবটা মুছে যায়নি। মুস্তাফিজ মেয়ের দিকে মুড়ি আর কলা এগিয়ে দিয়ে বলে, নে, খা।

তুমি খাও।

ওর কণ্ঠে ভয়। বাবার দিকে তাকায় না।

খা, বলছি।

মুস্তাফিজের ধমকে কুন্তলা কাঁদতে শুরু করে। মুস্তাফিজ ওর চুল মুঠি করে ধরে ঠাস করে চড় মারে।

খা বলছি।

কুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি খাও। খেলে তোমাকে মানুষের মতো লাগবে।

মানুষ!

মুস্তাফিজের হাত থেকে মুড়ি-কলা পড়ে গেলে ও ঘরে ঢুকে হেঁচকা টানে শিউলিকে বারান্দায় নিয়ে আসে। মুড়ির পোটলাটা শিউলির মুখে চেপে ধরে বলে, খা। শিউলি গোঁ-গোঁ করতে থাকে। আর তখন বাবা বাবা করে চিৎকার করে কুন্তলা। মুস্তাফিজ মেয়ের ডাকে নিজের ক্রোধ সংবরণ করে। কুন্তলা কান্না থামিয়ে বলে, মাকে মারছ কেন বাবা?

আমার টাকার দরকার। অনেক টাকা।

মা টাকা কোথায় পাবে?

বাপের কাছ থেকে আনবে। বাপ। বাপ চিনিস?

মুস্তাফিজের খ্যাসখেসে কণ্ঠে হিম হয়ে যায় কুন্তলা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, না, না চিনি না। আমি তোমাকেও চিনতে পারছি না বাবা।

বলতে বলতে গেট খুলে দৌড়ে বেরিয়ে যায় ও। বড় রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়ায়। গলিটুকু তো একদৌড়ে পার হয়ে এসেছে, এখন কোথায় যাবে? ওর হাঁটু কাঁপে। গাড়ির নিচে পড়ে যাবে কি? ওর বুক ভেঙে যায়। ও আবার ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। চোখের জল মুছে শেষ করতে পারে না। একজন লোক পাশে এসে দাঁড়ায়।

কাঁদছ কেন খুকি?

ও জবাব দেয় না।

যাবে আমার সঙ্গে? তোমার ক্ষিদে পেয়েছে? বিরিয়ানি খাবে?

বিরিয়ানি!

কুন্তলার ক্ষিদে চনচন করে ওঠে। ওর মা কোনো দিন বিরিয়ানি রাঁধেনি। ও বিরিয়ানির গল্প শুনেছে, কিন্তু খেতে পারে নি।

খাবে বিবিয়ানি?

খাব।

কুন্তলা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে।

তাহলে এসো আমার সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি ওর হাত ধরে। শিউরে ওঠে কুন্তলা। লোকটি ওকে বিরিয়ানি খাওয়াবে বলেছে, কিন্তু এমন শক্ত করে হাতটা ধরেছে কেন? ও হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে বলে, আমার ব্যাথা লাগছে। হাতটা ছাড়েন।

হাত ছেড়ে দিলে তুমি মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাবে। এসো।

লোকটি ওকে হেঁচকা টান দেয়। সেই টানের ধাক্কায় ওর আবার কান্না পায়। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুনতে পায় বাবা ওকে ডাকছে, কুন্তলা, কুন্তী।

ও থমকে দাঁড়ায়, বাবা, আমার বাবা ডাকছে।

কোথায় তোমার বাবা?

ঐ যে আমার বাবা আসছে

দ্রুতপায়ে মুস্তাফিজ এগিয়ে আসে। লোকটি ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ভিড়ে মিশে যায়। বিপন্ন বোধ করে কুন্তলা। আবার সেই ভয় ওকে আচ্ছন্ন করলে ও দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে। মুস্তাফিজ এসে ওর হাত ধরে।

কি হয়েছে?

আমি বিরিয়ানি খাব বাবা।

বিরিয়ানি?

ওই যে লোকটা বলল আমাকে বিরিয়ানি খাওয়াবে। কিন্তু এখন কোথায় গেল? তোমাকে দেখে বোধহয় পালিয়েছে।

বাড়ি চল। কেন এখানে এসেছিস?

আমি বাড়ি যাব না। বাড়িতে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

তাহলে রাস্তায় থাক বদমাইশ মেয়ে। ছেলেধরারা তোকে পাচার করে দেবে। কুন্তলা বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না বাবা। আমি বাড়িতে যাব। মায়ের কাছে যাব।

বাবা ওকে হেঁচকা টান দিয়ে শক্ত হাতে চেপে ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে। সেটা ওর একটুও পছন্দ হয় না। মনে হয় বাবাও ওই রাস্তার লোকটার মতো আচরণ করছে। কিন্তু এবার ওর কান্না পায় না। ওর রাগ হয়। রাগটা বড় হতে থাকে। ওর বয়সের চেয়েও বড়।

কুন্তলার স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কবে স্কুল যাবে তা মাকে জিজ্ঞেস করলে শিউলি বেগম কোনো উত্তর দেয় না। কুন্তলার হাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরে বলে, পড়ালেখা করে কি হবে?

কুন্তলা এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ও এখন আর ভয় পায় না। ওর বুকের ভেতর রাগ। রাগ ও কমাতেই পারে না। বুকের ভেতর বালিশ আঁকড়ে ধরলে শুনতে পায় ওর মা কাঁদছে।

দু'দিন পর ঘটনাটা ঘটে।

সকালবেলা ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পায় মায়ের কণ্ঠের গোঁ-গোঁ ধ্বনি। কেমন অদ্ভুত শব্দ। কুন্তলার ঘুম ছুটে যায়। ও এক লাফে দরজার পাশে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ালে দেখতে পায়, বাবা মায়ের মুখের ওপর বালিশটা চেপে ধরেছে। ওর মা মাথা নাড়াতে পারছে না। ওর বাবা বসে আছে ওর মায়ের ওপরে। একটু পরে নিথর হয়ে যায় শিউলি বেগম। ও দৌড়ে গিয়ে বিছানার পাশে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, মাকে তুমি মেরে ফেলো না বাবা। বাবা তুমি আমাকে পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করে দাও। ওরা তোমাকে অনেক টাকা দেবে।

মুস্তাফিজ মেয়ের দিকে ঘুরে তাকায়। বাবার লাল চোখের রাগী দৃষ্টি দেখে ও একই ঢঙে বিড়বিড় করে বলতে থাকে, মা তোমাকে টাকা দিতে পারে না। কিন্তু আমি পারি। তুমি আমাকে বিক্রি করে দাও বাবা, তবু মাকে মের ফেল না।

মুস্তাফিজ মেয়ের কথায় বিমূঢ় হয়ে যায়। শিউলি বেগমের দিকে তাকায়। শিউলির নাকমুখ দিয় ফেনা বেরিয়ে আসছে। ও দু'হাতে নিজের মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

কাঁদো কেন বাবা? মায়ের কি হয়েছে? মা, মাগো।

মুস্তাফিজ দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েকে ধরতে গেলে কুন্তলা বাবার নাগালের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকিয়ে দেখে মায়ের মাথাটা ঢলে পড়েছে। ও চেঁচিয়ে বলে, বাবা ডাক্তার ডাকো। মা যে মরে যাচ্ছে।

ডাক্তার!

মুস্তাফিজ বিড়বিড় করে নিজের দু'হাতের দিকে তাকায়। নিজের চুল টেনে ধরে প্রবল অপরাধবোধে বাইরে এসে দাঁড়ায়। এতদিনের জীবনসাথীকে এভাবে? আমি কি মানুষ? নাকি অন্য কিছু? পরক্ষণে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের বলয়ে ফিরে আসে। জোরে জোরেই বলে, ঠিকই করেছি। যে বাবা মেয়েকে যৌতুক ছাড়া বিয়ে দেয় তার মেয়ের এমন শাস্তিই হওয়া উচিত। এখন আমর বাঁচার পথ দেখতে হবে।

ও বাথরুমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলা একছুটে বেরিয়ে যায়।

প্রতিবেশীর বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে, আমার বাবা মাকে মেরে ফেলেছে। আপনারা আসেন।

এদিকে মুস্তাফিজ অসম্ভব দ্রুততায় শিউলি বেগমের গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে মেঝেতে ফেলে দেয়। শাড়ির অপর অংশ ঝুলিয়ে রাখে ফ্যানের সঙ্গে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকে শিউলি। মুস্তাফিজ ওর পাশে বসে মাথা চাপড়ায়।

লোকজন ভিড় করে বাড়িতে। পুলিশ আসে। মুস্তাফিজকে জিজ্ঞাসা করে। ও কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার বউ আত্মহত্যা করেছে। অভাব, অভাবের জন্য। আমার চাকরি নাই, বেতন নাই, আমি কি করব। আল্লাহ রে।

পেছন থেকে হুঙ্কার দেয় কুন্তলা, বাবা।

মুস্তাফিজ থরথর করে কেঁপে ওঠে। মুখ শুকিয়ে যায়। ওর মনে হয় মেয়েটার চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। কুন্তলা চিৎকার করে বলতে থাকে, আমার বাবা আমার ময়ের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। বাবা মিথ্যা কথা বলছে।

সমবেত মানুষের দৃষ্টি কুন্তলার মুখের ওপর। কেউ ওর ছোট শরীর দেখতে পায় না। প্রবল অন্ধকার গাঢ় হয়ে থাকে ওর চারপাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই কিশোরীর ক্রসফায়ার

দুই গ্রামের সীমান্তে স্কুলটি অবস্থিত হওয়ায় দুই কিশোরী রেণু আর মিনু দুই গ্রাম থেকে এক জায়গায় মিলিত হয়। ছুটির দিনগুলো ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই। ওরা এখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী।

মিনুকে স্কুলে আসতে হয় একটি জলাভূমি নৌকায় করে পার হয়ে। ওর মতো অনেকেই এভাবে আসে। হাট-বাজারের জন্য আসে গাঁয়ের লোকেরা। নৌকা পারাপারে জন্য টাকা দিতে হয় বলে প্রায়ই রাহেলা খাতুন মেয়েকে হুমকি দেয়, অ্যাতো পড়ালেহা কইরা কী অইবে? ওই তো হাড়িই ঠ্যালন লাগবে।

রেণু জেদ করে। ভাত খাওয়া বন্ধ রাখে। রেগে যায়। উঁচু কণ্ঠে বলে, আমি হাড়ি ঠেলুম না ক্যাবল। হাড়িও ঠেলুম উপার্জনও করুম। আপনে হিসাব রাখেন আম্মা। যে কয় টাহা আপনে আমার পিছে ব্যয় করবেন আমি আয় কইরা বেবাক টাহা শোধ দিমু। ঠিকই পারমু। দেইখেন আপনে। আপনেরে একটা গরু কিনা দিমু। দুধ খাইবেন, দুধ বেঁচবেন।

মেয়ের কথা রাহেলা খাতুন একেবারে উড়িয়ে দেয় না। খানিকটুকু বিশ্বাস করে। গ্রামের মেয়েরা এখন যথেষ্ট সেয়ানা হয়েছে। এটা-ওটা করে উপার্জন যে করছে না তা তো নয়। তাহলে ওর মেয়ে পারবে না কেন? লেখাপড়া শিখলে স্কুলের মাস্টারনি হতে পারবে। রাহেলা খাতুন মনে মনে খুশি হয়।

সুতরাং রেণুর স্কুলে যাওয়ায় পড়ে না। ও আগের মতো উচ্ছল, চঞ্চল লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নৌকায় ওঠে, নৌকা থেকে নামে। এত জোরে লাফ দেয় যে মাঝি অবাক হয়ে যায়, মাইয়াডার গায়ে জোয়ান পুরুষ মাইনষের মতন বল আছে।

রেণু খিলখিল করে হাসে। এসব কথায় ও বেশ মজা পায়। মাঝি ওকে পুরুষ মানুষের সঙ্গে তুলনা করলে ও বলে, আপনে আমারে পুরুষের মতন কন ক্যান কাকু? মাইয়ারা জোরে লাফ দিতে পারে না?

তোমার মতন পারে না। তুমি একডা জাদুর মাইয়া

জাদুর মাইয়া?

রেণু আবার খিলখিল করে হাসতে থাকে।

জাদুর মাইয়া শুনতে ওর বেশ লাগে। মাঝি কাকু মজার লোক। কি সুন্দর করে কত নামে ওকে ডাকে। অনেক নামে লোকে ওকে ডাকলে ওর বাবার কথা ভীষণ মনে হয়। বিশেষ করে বাবার বয়সি লোকদের আদর পেলে ও বর্তে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা তো ঠিকই, যে মেয়ের বাবা বাড়িতে থাকে না বাবার জন্য ব্যাকুলতা তার তো থাকবেই। রেণুর চোখ ছলছল করে। মনে মনে বলে, বাবা আপনে বাড়িতে না থাকলে আমার একটুও ভালা লাগে না। বাবা আপনে ক্যান বাড়িতে থাকেন না?

এ প্রশ্নের উত্তর মায়ের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় তা ও বুঝতে পারে না।

মা বাজান বাড়িতে থাহে না ক্যান?

তোর বাজান যে রাজনীতি করে।

রাজনীতি? কেমুন রাজনীতি?

আন্ডারগ্রাউন্ড।

হেউডা আবার কি?

আমি এত কিছু জানি না।

বাজান আপনেরে কয় নাই?

কইছে এই রাজনীতি কইরা দ্যাশডারে ভালা বানাইব।

তাইলে তো আগে নিজের বাড়িডা ভালা বানান লাগে। ঠিক না মা?

আমাগো ছোড বইনডার চার মাস বয়স অইলো। অরেও বাজান অহনও দ্যাহে নাই। একদিন লুকায়ে লুকায়ে আইয়া কইবো অই তোরা কেমুন আছস?

আবার খিলখিল করে হাসে রেণু। হাসতে হাসতে বলে, আমার বাজান জাদুর মানুষ।

ওর একই ক্লাসের প্রাণের বান্ধবী মিনুর স্কুলও বাড়ি থেকে বেশ দূরে। ও স্কুলে আসে মামার সাইকেলের পেছনে বসে। যেদিন মামা আনতে পারে না সেদিন ওর স্কুলে আসা হয় না। হেঁটে আসা সম্ভব না। ওর মামা হারুন মায়ের খালাতো ভাই। ওদের বাড়িতে থেকে এনজিও অফিসে চাকরি করে। বাবা বাড়িতে থাকে না বলে মা ওকে বাড়িতে রেখেছে। নানা ধরণের কাজ করতে হয়। হারুনের ওকে স্কুলে পৌঁছে দিতে ভালোই লাগে। কিশোরী মিনু ওকে জড়িয়ে ধরে সাইকেলের পেছনে বসে থাকলে ওর শারীরিক উত্তেজনা থাকে পথজুড়ে। সাইকেলে গতি বেড়ে যায়। মিনু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে, মামা আপনের সাইকেলডা একডা পঙ্খীরাজ।

যেমুন তুই একডা পঙ্খীরাজ মাইয়া

পঙ্খীরাজ মাইয়া! কি সোন্দর কথা।

মিনু হাসতে হাসতে মামাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে। হারুন নিজেও হাসতে হাসতে বলে, এমুন জোরে জোরে হাসলে সাইকেল কিন্তু উলডায়া পড়ব। একবার তোর বাপেরে রাইতের অন্ধকারে বাস ইস্টান্ডে লইয়া আসনের সময় মোরা দুইজনে গর্তের মইধ্যে পইড়া গেছিলাম।

আহারে মোর বাজানে ব্যাতা পাইছিল?

পাইছিল। বাম হাতটা মোচড়াইয়া গেছিল। মেলা দিন কষ্ট পাইছিল। হেরা তো আবার পলাইয়া থাকে। ডাক্তার দেহাইতে পারে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজান পলাইয়া থাকে ক্যান?

রাজনীতি করে যে।

কি রাজনীতি?

সর্বহারা রাজনীতি।

হেইডা আবার কি?

আমি অত কিছু বুজি না। বুজানের কাছে শুনি এই রাজনীতি কইরা ক্ষমতায় আসলে মানুষের ভালা হইব। বেবাক মানুষে ভাত কাপড় পাইব।

আল্লারে আমার বাজান বাঁইচা থাকুক। আল্লাহ আমার বাজানরে য্যান একডা পঙ্খীরাজ ঘোড়া দেয়। বাজানের য্যান সাইকেলে চড়ন না লাগে। বাজান য্যান গোডা দ্যাশে উইড়া উইড়া কাম করতে পার। আইচ্ছা মামু?

ক, কি কবি?

তহন তাইলে আমাগো ইস্কুলগুলা এ্যাত দূরে দূরে থাকব না, না?

হইতে পারে, জানি না। ক্যামনে জানমু?

আবার খিলখিল করে হাসতে হাসতে মিনু বলে, জানেন মামু, আমার বন্ধু রেণুর বাপও একদিন নৌকা কইরা যাওনের সময় নৌকা উলডাইয়া গেছিল। রেণুর বাজান সাঁতার কাইডা পাড়ে উঠছিল।

নৌকা আবার উলডাইল ক্যান?

না, সোঁতে উলডায় নাই। রেণু আমারে কথাডা কইছে। ওর মাঝি কাকু অরে কইছে।

কি কথা রে?

বিলের ধারে পুলিশের গাড়ি আইসা থামছিল অর বাজানরে ধরনের লাইগা। হের লাইগা মাঝি কাকু উলডাইয়া দিছিল রেণুর বাজানের লগে পরামশ্য কইরা।

বুজছি।

কি বুঝছেন? আপনে নাহি রাজনীতি বুঝেন না?

এইডা বুঝি যে হ্যাগো পিছে পুলিশ লাইগা অছে।

ক্যান, পুলিশ লাইগা থাকব ক্যান? বাজান পুলিশের কি ক্ষতি করছে?

তোর বাজানের মতন মানুষরা শ্রেণীশত্রুর খতম করে যে।

মিনুর আর জিজ্ঞেস করা হয় না যে শ্রেণীশত্রুর খতম করা কি। ওর স্কুলে পৌঁছে গেলে সাইকেল থেকে এক লাফে নেমে স্কুলের দিকে দৌড় দেয়। গেটে দেখা হয় রেণুর সঙ্গে। দুই বান্ধবী হাত ধরাধরি করে ক্লাসে ঢোকে। প্রথম বেঞ্চে একসঙ্গে বসে। ওরা পড়ালেখায় খারাপ না। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ধারণা দু'জনেই ফার্স্ট ডিভিশনে এসএসসি পাস করবে। যতই হৈচৈ করুক, গালগল্প আড্ডায় মেতে থাকুক, কিছু যায় আসে না। পড়াশোনায় দু'জনে মনোযোগী। টিচাররা ওদের ওপর খুশি যে ওরা স্কুলের সুনাম রাখবে।

তবে দু'জনের দুঃখ একটাই যে, ওদের বাবারা বাড়িতে থাকে না। বাবা বাড়িতে না থাকলে পুরো বাড়িটা খালি খালি লাগে। মনে হয় যে সে থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেমেয়েরা ভরসায় থাকত। আনন্দে থাকত। মা না থাকলে কেমন শূন্য হয়ে যায় পৃথিবী, বাবার না থাকাও তেমন। তাও আবার যে বাবা বেঁচে আছে এবং কাছে ধারে কোথাও থাকে, যে ঠিকানা ওরা জানে না। বাবা বলে, আমাদের একটা ঠিকানা না। ঠিকানা অনেক। কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। তোদের ঠিকানা জেনে তো দরকার নেই।

বাবার এসব কথায় মন ভরে না। ছেলেমেয়েরা চায় বাবা বাড়িতে থাকবে। বাবার কাছে কারণে অকারণে দৌড়ে যেতে না পারলে আনন্দ থাকে না। দুই বান্ধবীর মধ্যে বাবার অনুপস্থিতির বোধ তীব্র। বিষয়টা ওদের ভাবায়– কাঁদায়। বাবার প্রসঙ্গ আলাপের সময় ওদের কথায় দুঃখবোধ ফুটে থাকে। মাঝে মাঝে ওদের ভয়ও লাগে।

রেণু মিনুকে বলে, তোর বাজানরে পুলিশ তাড়া করছিল ক্যান রে?

মিনু ভেবে বলে, রাজনীতি।

ওই হারামজাদী, তুইও রাজনীতি কস!

দু'জনে রাজনীতি শব্দ নিয়ে হাসাহাসি করে। শব্দটিকে নানাভাবে গালি হিসেবে ব্যবহার করে। যে গালিগুলো ওরা ছেলেদের মুখে শুনেছে, শুনে লজ্জা পেয়েছে। আজ অবলীলায় দুই বান্ধবী সেই শব্দগুলো ব্যবহার করে। ওরা একটুও লজ্জা পায় না। ওদের মুখ ছুটে যায় কেমন করে তা ভেবে নিজেরাও অবাক হয়। পরক্ষণে ভাবে, আসলে বাবাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ থেকে দু'জনের মন এমন হয়ে যাচ্ছে। ওদের সুরুচির বাঁধটা ভেঙে গিয়ে এমন গলগলিয়ে ঢুকছে নোংরা শব্দের স্রোত। টিফিন পিরিয়ড শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং ঢং– ওদের বুকের ভেতরে বাড়িটা পড়ে যেন।

রেণু মিনুর হাত চেপে ধরে বলে, পুলিশ আমাগো বাজানরে সামনে পাইলে মাইরা ফালাইব নাতে?

মিনু চিন্তিত মুখে বলে, কে জানে।

অন্য মেয়েরা ক্লাসে ঢুকছে। ওরাও দৌড় দেয়। কিন্তু মনে হয় পায়ে বেড়ি। কত দূর যে দাঁড়াতে পারবে ওরা জানে না। বাড়িতে মায়েদের যন্ত্রণার শেষ নেই। সংসার চালাতে কষ্ট হয়। কখনো বাবারা লোক মারফত টাকা পাঠায়। কখনো ধান-চালই ভরসা। হাঁস-মুরগির ডিম বিক্রি আছে। শাক-সবজির ক্ষেত আছে। উপায় না দেখলে মায়েদের বাপের বাড়ি আছে। বাবা বা ভাইয়ের কাছে হাত পাততে হয়। এটা কী বেঁচে থাকা? বাবা ওদের কেন এভাবে ফেলে রেখে রাজনীতি করতে চলে গেল? দু'জনের ভাবনায় বাবার আদর্শ এবং সমাজ বদলের স্বপ্ন ধরা পড়ে না। বরং বাবার পেছনে লেগে থাকা পুলিশের চেহারা দৈত্যের মতো ভেসে ওঠে। পুলিশের বন্দুকগুলো ওদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখে।

একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে রেণু দেখতে পায় মায়ের মুখ থমথমে। বাড়ির চাচার ঘরে উত্তেজনা। চাচাতো ভাইয়েরা নাকি বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। বাবার কারণে ওদের লুকিয়ে থাকতে হবে। চাচী উঠোনে দাঁড়িয়ে বাবাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুষে বকাবকি করছে। রেণুকে দেখে চাচী খেঁকিয়ে ওঠে, পড়ালেহা আর করন লাগব না। অহন জ্যালে যাওনের লাইগা রেডি হন বিবিসাব।

চাচী ওকে আপনি করে বলছে। ব্যাপরটা কি? এত রাগের কি হলো বাড়িতে? রেণু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হইছে চাচী? আমার কনু দোষ হইছে?

ও দেখতে পায় ওদের ঘরের বারান্দায় মা শুকনো মুখে বসে আছে। চাচী যে ওর বাবাকে নিয়ে এটা ওটা বলছে তার প্রতিবাদ করছে না। চাচী ওর সামনে এসে আঙুল নাড়িয়ে বলে, আপনের কনু দোষ নাই। আপনের মায়েরে গিয়া জিগান কি অইছে। সব্বোনাশের বাকি কিছু নাই।

তখন ওর মা চেঁচিয়ে বলে, বুজান আপনে থামেন। মাইয়াডা অহনও ভাত খায় নাই।

গিলান, মাইয়ারে ভাত গিলান। গলা পর্যন্ত গিলাইয়া রাহেন পুলিশের হাতে উডায়ে দেওনের লাগি। ও বাপের বড় মাইয়া না।

রেণু মাকে চাচীর সঙ্গে কথা বলতে দেয় না। হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, কি অইছে মা?

ওর মা চোখ মুছতে মুছতে বলে, তোর বাপের দলের বেডারা নাহি পুলিশের লগে বন্দুকযুদ্ধ করছে।

বন্দুকযুদ্ধ! রেণুর বুকের ভেতর ধস নামে। পুলিশ এবং বন্দুকযুদ্ধ। দুটোই ওর চিন্তার জগৎ তোলপাড় করতে থাকে। ও বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। মা ওকে ডাকে ভাত খেতে। ও বলে দেয় ওর ক্ষিদে নেই। ভাত খাওয়ার মতো অবস্থা তখন আর নেই। বাকি খবরটা কি পাবে সেটার অপেক্ষায় ওর ভেতরের সবটুকু ফাঁকা হয়ে যায়।

মিনুর বাড়িতে ওর মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। বাড়ির বাইরে থেকেই ওর মায়ের কান্না শুনতে পায়। ভাবে মানুষ এমন করুণ সুরে কাঁদে কি করে? নাকি ওর কানেই কান্নার শব্দ এমন অস্বাভাবিক লাগছে? কোনো একটি দুঃসংবাদ এলে মানুষ নিজেকে আর স্থির রাখতে পারে না, তখন সে তার নিজের অজান্তে যে শব্দ করে তার ধরণ সে নিজেই বুঝতে পারে না। ওর মায়ের কি তাহলে এখন তেমন অবস্থা?

মিনু হারুনকে জিজ্ঞেস করে, মামা কি হইছে?

খারাপ খবর। তোর বাজানের বোধহয় একডা কিছু হইছে।

একডা কিছু আবার কি?

ক্রসফায়ার।

হেইডা কি?

তোর মায়েরে জিগা গিয়া। আমি জানি না।

মিনু একছুটে বাড়ির ভেতর যায়। মা বাজানের কি অইছে?

তোর বাজান আর বাঁইচা নাইরে মা।

বাজানের কি অসুখ হইল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইনষে কয় ক্রসফায়ারে মরছে।

ক্রসফায়ার? এইডা তাইলে একডা নতুন অসুখ।

মিনু মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ওর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে যায়। বাবা ওদের কাউকে সেবা করার কোনো সুযোগ দিল না। ও আল্লারে বাজানগো? ক্যান আপনে এমনু কইরা মইরা গেলেন। আপনেরে আমরা দেখতেও পাইলাম না? ও বাজান গো।

বাড়িতে মিনুর কণ্ঠস্বর হারুনকে সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করে। র‍্যাবের সঙ্গে গোলাগুলিতে ক্রসফায়ারে মারা গেছে ওর বাবা। এ কথাটা মিনুকে ও আর বোঝাতে চায় না। মিনু তাহলে জিজ্ঞস করবে র‍্যাব কি, ও বলবে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, সেটাও মিনু বুঝতে পারবে না। এই বয়সের মেয়েদের বোধটোধগুলো ভোঁতাই হয়। হারুন শুকনা মুখে বারান্দার কোণায় বসে থাকে। বুঝতে পারে চল্লিশার দিন পর্যন্ত মিনুকে আর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে স্কুলে নিতে হবে না। বাড়িতে লোকের ছায়া লেগে থাকবে। ওর বোন ঠিকমতো ভাতটাও রাঁধবে না। কিন্তু রাজনীতি কি এমনই যে একদল মানুষ শ্রেণীশত্রু খতম করবে, থানা লুট করবে? ওদের অস্ত্রের ভীষণ দরকার হবে, আর অন্য দল তাদেরকে ধরার নামে মেরে ফেলবে? হারুনের মনে হয় ওর মাথাটাও ভোঁতা। সেজন্য সে এসবের উত্তর পায় না। কঠিন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন, হারুনের ভীষণ মন খারাপ হয়। ও ভাবে, এখন থেকে আর প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে না। ঘটনাগুলো শুধু দেখে যাবে। তাহলে হয়তো কষ্টের বোঝা খানিকটুকু কমবে। ওর কোনো কিছু ভালো লাগে না। ও উঠোনে পায়চারি করতে থাকলে দেখতে পায় গ্রামের আশপাশের বাড়ির নারী পুরুষ ওদের বাড়ির দিকে আসছে। ওরা শত রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে। কে ওদের এত প্রশ্নের উত্তর দেবে? ও আবার নিজের ভেতর গুটিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

মাস দুয়েক পরে রেণু আর মিনু আবার স্কুল প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। দু'জনের পিতার মৃত্যুজনিত ঝড়ের চিহ্ন দু'জনকে কাহিল করে রেখেছে। এক অপরকে ধরে কাঁদে। বলে, আমাগো বাজান একলগে মরল ক্যান?

প্রশ্নের উত্তর কেউ কাউকে দেয় না। প্রশ্নটা আবগের, উত্তর পাওয়ার জন্য নয়। মিনু বলে, আমার বাজান তো ক্রসফায়ারে মরছে তোর বাজানের কি অসুখ হইছিল?

ওর রুদ্ধকণ্ঠের উত্তর, বাজানের অসুখডাও ক্রসফায়ার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ পর্যন্ত শফিউল্লাহ

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলে শফিউল্লাহ আঁতকে ওঠে। প্রবল ভয়ে শক্ত হয়ে যায় শরীর। গা ছমছম করা একটা ভার ওর স্নায়ু নিষ্ক্রিয় করে দেবার আগেই ও অনুভব করে ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বকুল ফুলের গন্ধ যাওয়া আসা করছে। এটাই ওর ভয়ের কারণ। এই মুহূর্তে শ্বাস টানতেও ওর ভয় করছে। মনে হয় এটা বুঝি কোনো স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। এর সঙ্গে দুর্যোগের ঘনঘটার আভাস আছে। ও পাশে শুয়ে থাকা নেকজানের কাছ থেকে মানসিক আশ্রয় পাওয়ার জন্য হাত বাড়ায়। হাতটা নেকজানের গায়ের ওপর পড়ে, ঠিক কোমর এবং বুকের মাঝ বরাবর। নেকজান ঘুমে বিভোর। শফিউল্লাহর হাত সে ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। ওর মন খারপ হয় এজন্য যে ওর হাত নেকজানের শরীরে এখন বিদ্যুৎস্পর্শ নয়। দুজনের শরীর থেকেই ফুলের গন্ধ বিলুপ্ত হয়েছে। দু'জনে এখন দু'জনের মুখোমুখি, কিন্তু সময়টা স্থির, কাঁপুনে সময় নয়। সম্পর্কের প্রগভলতা চটকে দেয় না সময়ের নাড়িভুঁড়ি। শুধু জিইয়ে রাখে বধির সম্পর্ক, যে সম্পর্ক টেনে নেওয়ার, আলোড়ন তোলার নয়।

এসব ভাবনার মাঝে শফিউল্লাহর ভয় উবে যায়। ও বুক ভরে নিঃশ্বাস টানে। ফুলের গন্ধ তেমনই আছে। ও মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসে। আশ্চর্য, এখন ওর ভয় করছে না। আচমকা ভয়ের ভাবটা কেটে গিয়ে ফুলের গন্ধে ওর আনন্দ হচ্ছে। একটু আগে যে দুর্যোগের আশঙ্কা মনে এসেছিল সেটা ঝেড়ে ফেলে ও দরজা খুলে বাইরে আসে।

উঠোনে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় চারদিকে ঢোল বাজছে। ও চারদিকে তাকায়। নিস্তব্ধ চারপাশ। ফকফকে জোৎস্নায় গাছগুলো রূপসী নারীর মুখশ্রীতে উজ্জ্বল। কোথাও অস্পষ্টতা নেই। ওর মনে হয় ঢোলের শব্দ ওর কানে জ্যোৎস্নার আলো হয়ে ঢুকছে। ও নিজের ভেতরে প্রাকৃতিক চাপ অনুভব করে। ও নিজেকে মুক্ত করার জন্য এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। শব্দটা বুঝি চারদিক থেকে ছুটে আসছে কোনো একটি বিশেষ দিক থেকে নয়। ও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে কোনো দুর্যোগের আশঙ্কা নয়, আনন্দের খবর ঢোল হয়ে বাজছে। ঢোলের বাদ্য এখন ওর কাছে সঙ্গীত নয়, আলো। সেই সঙ্গে শত কণ্ঠ তারস্বরে বলছে, কাল তোমার প্রথম কন্যা নীলমণির বিয়ে শফিউল্লাহ।

শফিউল্লাহর বুক ভেঙে যায়। মনে হয় ওর হৃৎপিণ্ড ঢোল হয়েছে এবং এতক্ষণ ও ওই ভাঙা হৃৎপিন্ডের শব্দই শুনতে পাচ্ছিল। যেটাকে ও ঢোলের শব্দ বলে বিভ্রান্ত হয়েছিল। আসলে তো কোথাও ফুলের গন্ধ কিংবা সঙ্গীতের বাদ্য নেই। ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই মেয়ের মুখ ওর সামনে বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ও ওর চারপাশে কোনো উজ্জ্বল সময় দেখতে পায় না।

ও বাবো কথা কন না ক্যান?

ফুলমণি বাবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। শফিউল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন মানুষ এবং পটভূমিতে বিশাল প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। ওর কথার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ও নিজেই বুঝতে পারছে না যে ওর নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা। ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছে কিন্তু কাঁদতে পারছে না। শফিউল্লাহ ভাবে ও জীবনে কখনো এমন একটি অবস্থায় পড়েনি। কঠিন অবস্থা। এর চেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ওর কাছে অনেক সহজ জায়গা ছিল। আজ এই মধ্যরাতে ও কেমন ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে ওর শক্তি নিঃশেষ? তখন ফুলমণি আবারও বলে, ও বাবো কথা কন না ক্যান?

থেমে যায় নীলমণির কান্না। ও আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে শক্ত করে। বলে, ফুলমনি কথাডা ঠিকই কইছে বাবো। আপনে বিয়াডা ভাইঙা দ্যান।

না। চেঁচিয়ে ওঠে শফিউল্লাহ।

তোর ঘর আমি দ্যাখতে চাই মা রে। নইলে আমি কেমুন বাপ?

কথাটা বলে শেষ করতে না করতেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে এবং মুহূর্তে বুক ভেঙে শব্দ বেরুতে থাকে। শফিউল্লাহর কান্নার শব্দ উঠোনে পাক খেতে থাকে। ওর সঙ্গে কাঁদতে থাকে বাকিরা। একটু পর নীলমণি বাবার হাত ধরে, ফুলমনি মায়ের। বলে, চলেন, ঘরে চলেন।

ঘর?

আমাগো ঘর কি আছে?

ক্যান থাকব না?

আমরা কি বানভাসি মানুষ?

চলেন বারান্দায় বসবেন। ফুলমণি ছুটে গিয়ে পাটি এনে বিছিয়ে দেয় বারান্দায়। নীলমণি ডালাভরা মুড়ি নিয়ে আসে সঙ্গে গুড়। জগে পানি। দু'বোনই বাবা-মায়ের কোলের কাছে বসে আদুরে গলায় বলে, মুড়ি খান বাবো। মা আপনের ক্ষিধা পাইছে না? পানি খাইতে চাইছিলেন না? খান।

দু'বোনে বাবা মায়ের মুখে মুড়ি উঠিয়ে দেয়।

এইডা কি খাওয়ার সময় মা?

এমুন মাঝ রাইতে কেউ কি মুড়ি খায়?

কেউ খায় না আমরা খাই। খান।

দু'বোনের খিলখিল হাসিতে তরঙ্গ ওঠে। শফিউল্লাহ এই হাসি শুনে আবার নিজের ভেতর আলো দেখতে পায়। ভাবে যে অন্যায় কাজটা ও করেছে সেটা অন্যায় নয়। এটাই ঠিক কাজ। কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেটা কৃষিকাজে ব্যবহার না করে ব্যবহার করতে হচ্ছে মেয়ের বিয়েতে। ও এটাকে অন্যায় ভেবে কষ্ট পেয়েছে। এখন মনে হচ্ছে ঋণটা শোধ দিলেই তো হবে, যে কাজেই ও ব্যয় করুক না কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ ধরে এই অন্যায় কাজটাকে শুদ্ধ করার জন্য নিজের চারপাশে কত কিছু আয়োজন করেছে। সবটাই অলীক। এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না। জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, ঢোলের শব্দ তৈরি করে ও বুকের ভার কমাতে চেয়েছিল বলে নিজেকে ভীষণ বোকা মনে হয়। বোকা হয়ে থাকার অনুভবের ঘোরে বলে, মাগো আমার ঋণের লাগি তুমি দুঃখ কইরো না। আমি তো পোলাডারে যৌতুক দেই নাই। টাকাডা দিচ্ছি তুমার সুখের লাইগা।

টাকা দিয়া আপনে আমার সুখ কিনতে পাইরবেন না।

তুমি আমারে বড় কথা শুনাইও না মা।

বাবো। বাবো আপনে ভুল করছেন।

ভুল? শফিউল্লাহ ছিটকে ওঠে। বলে, আমি ভুল করি নাই মাগো। পোলাডা ভালো। তুমি দেইখো তুমি সুখী হইবা। আমার টাকা দিয়া পোলাডা তোমার লাইগা নতুন ঘর উঠাইব। তল্লা বাঁশের বেড়ার লগে ছনের ছাউনি। আহা কি সুন্দর! এমুন ঘরে তুমি রাতভর ঘুমাইয়া হপন দেখবা। ছনের চালে শিশির জমবে। পাখি আইসা বসবে। আমি তুমাগো মায়েরে ভাঙা ঘরে আইনা তুলছিলাম। হেরজন্যি আমার মনে দুঃখু আছে। আমি চাই না তুমি যারে লইয়া ঘর করবা তার মনে দুঃখু থাক।

বাবো! বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে নীলমণি।

ওর কণ্ঠস্বর অন্যদের চমকে দেয়। শুধু চমকায় না শফিউল্লাহ। শক্ত হয়ে থাকে ওর শরীর। ও মুখ ফিরিয়ে নীলমণিকে দেখে না। টাকার অভাবে মেয়েটির বিয়ে দিতে পারছিল না। এই লজ্জা গ্লানি হয়ে আড়ষ্ট করে ফেলছে। ও তাই তাকাতে পারছে না। পিতার লজ্জা ও এতদিনে দূর করতে পেরেছে, তবু ওর আড়ষ্টতা ভাঙে না। ভাবে, এই কথাগুলো তো ওর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ও বুঝি এখনো যুদ্ধের ভেতরে আছে। যুদ্ধের ভেতর থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। ফুলমণি হাতের তালুতে পানি নিয়ে বাবার পায়ের তলায় জল দেয়। শফিউল্লাহ অস্ফুট উচ্চারণ করে বলে, ভালা লাগতাছে মারে।

নেকজান স্বামীর জন্য যৌবনের ভালোবাসা অনুভব করে, যেটা এই পঁচিশ বছরের সংসার জীবনে মিইয়ে গিয়েছিল। তবু আশ্চর্য রাত আজ। যেন এমন একটি রাতেই যুদ্ধ করার জন্য চলে গিয়েছিল শফিউল্লাহ। নেকজানের এখনো মনে আছে সে রাতে কান্নাকাটি করার পর মেয়েকে কোলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ও অনুভব করেছিল যে মেয়ের শরীর থেকে পদ্মের ঘ্রাণ আসছে। ঘ্রাণে পুরো ঘর ভরে গেছে।

নীলমণি বড় কর শ্বাস টেনে বলে, পদ্মফুলের ঘেরান আসতিছে বাবো। আপনে ঘেরান পাচ্ছেন?

পাচ্ছি।

মা আমিও পাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে শফিউল্লাহর চোখ জ্বলে ওঠে। পঁচিশ বছর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো কখনো ওর চোখ এমন জ্বলে উঠত। শত্রুর বুকের নিশানায় বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়ার সাফল্যে জ্বলে ওঠা চোখটা এ মুহূর্তে তেমন জ্বলে ওঠে। শফিউল্লাহ কৃতজ্ঞচিত্তে নিজের চারপাশের জ্যোৎস্না দেখে। তার আনন্দ হয়। তার পঞ্চাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের জীবনে অনেকবার জ্যোৎস্না দেখেছে, কিন্তু এমন দেখা নয়। এ জ্যোৎস্নার রূপ এবং ঐশ্বর্য শফিউল্লাহর জীবনের উজ্জ্বল সময়কে বিস্মিত করে। ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে বারুদের গন্ধ নিয়ে ছুটে যাওয়া নিজের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের একজন বীর যোদ্ধার অবয়ব ফুটে উঠতে দেখে। সেই যোদ্ধার জীবনে পরাজয় বলে কোনো শব্দ ছিল না।

কিন্তু এখন? বড় করে শ্বাস টানলে টের পায় ফুলের গন্ধ আর নাই। নিজেকে ভীষণ পরাজিত মানুষ মনে হচ্ছে। হেরে যাওয়ার বোধের সঙ্গে সঙ্গে ওর ভেতরটা কুঁকড়ে ওঠে। একই সঙ্গে ওর মূত্রথলি ভরে ওঠার অনুভব টের পায় এবং নিজেকে নির্ভার করার তাড়না অনুভব করে। ইচ্ছে করলেই উঠোন পার হয়ে সুপুরি পাতা দিয়ে ঘেরা জায়গায় দাঁড়াতে পারে। বাড়ির মেয়েরা ওই জায়গাটা ব্যবহার করে। কিন্তু শফিউল্লাহর সেই জায়গাটিতে গিয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছে হয় না। শারীরিক চাপের সঙ্গে মনের চাপের বিপরীত অবস্থান তৈরি হয়েছে। ফলে শফিউল্লাহ দাঁড়িয়েই থাকে এবং পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে জ্যোৎস্নামাখা মাটি খুঁটতে থাকে। উঠোনে পায়ের নখের আঁকাবাঁকা রেখা ফুটে উঠতে থাকে। ও ভুলে যায় যে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা ছিল। শরীরে আর তেমন বেগ নেই। ওর মন শরীরের ওপর জয়ী হয়েছে। শফিউল্লাহ জ্যোৎস্নার বন্দনা করে গান গায়। ভাবে, এই জ্যোৎস্না ওকে সুস্থ মানুষ করে দিয়েছে। শফিউল্লাহর কণ্ঠ বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও ঢোলের বাদ্য নেই, কোথাও ফুলের গন্ধ নেই, শফিউল্লাহর কণ্ঠই একমাত্র সত্য। এভাবে বিজয়ীর আনন্দ ওকে মাতিয়ে তুললে উঠোনে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ও ভেবে নেয় কালকের যে দিনটি ওর জীবনে অন্যরকম দিন হবে তার জন্যই আজ রাতে এমন আয়োজন।

কালকে প্রথম সন্তান নীলমণির বিয়ে।

মেয়েটির জন্মের কয়েক ঘণ্টা পরে চাষীর ছেলে শফিউল্লাহ দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করতে চলে গিয়েছিল। মেয়েটিকে নাকের কাছে ধরে গন্ধ নিয়ে বলেছিল, মাইয়া তো লয়, হামার লালপদ্ম। শরীর থাইকা ঘেরান আসতিছে। এমুন ঘেরান মাইনষের জীবনে একবারই আসে। হামি গেলাম নেকজান বানু। তুমি মাইয়াডার সোন্দর দেখি একডা নাম রাইখো। বাঁইচা থাকলি দেখা হবি।

নেকজান হউমাউ করে কেঁদে উঠলে মুচড়ে উঠেছিল শফিউল্লাহর বুক। কোথায় যাচ্ছে ও? ফিরতে পারবে তো? মুহূর্তের চিন্তা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ও নেকজান বানুর সামনে থেকে সরে আসে। যে যুদ্ধে যায় তার এত কিছু ভাবলে চলে না। ও নিজেকে ঝাড়ি দিয়ে রাতের অন্ধকারে পথে বের হলো। নদীর ঘাট পেরিয়ে ওপারে যেতে দেখা হলো হারিস, বাবুল আর সুদেবের সঙ্গে। ওরাও যুদ্ধে যাবে। ভিন্ন দিক থেকে এসেছে। লক্ষ্য একটাই। পথে যেতে যেতে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। তারপর নয় মাস কত ভাবে কেটেছে সে স্মৃতি এখন আর মনে করতে চায় না শফিউল্লাহ। ও যুদ্ধে জিতেছিল। এর চেয়ে বড় পাওনা ওর আর কিছু নেই। ও যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে ঘর-সংসারে মন দিয়েছিল। কখনো মনে হয়নি স্বাধীনতার জন্য দেশের কাছ থেকে ওর কিছু পাওনা হয়েছে। এসব ভাবনার মাঝে মগ্ন হয়ে গান গাইতে গাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শফিউল্লাহ টের পায় না যে ওর কণ্ঠস্বর কতখানি চড়ে গেছে। মুগ্ধতার ঘোরে ও চক্রাকারে ঘুরতেই থাকে । জ্যোৎস্না ওকে স্নাত করতে থাকে।

সে গান শুনে ঘুম ভেঙে যায় নেকজানের। হাত বাড়িয়ে বিছানায় স্বামীকে না পেয়ে প্রথমে আঁতকে ওঠে। তারপর কান খাড়া করে গান শোনে। বুঝতে পারে শফিউল্লাহর কণ্ঠ। কিন্তু গান গাইছে কেন লোকটি? কিসের আনন্দ তার? অভাবের সংসারে তো হাসিই ফোটে না। তার ওপর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ করে মেয়ের বিয়ে দিতে হচ্ছে। তারপরও লোকটা গান গাইছে? তাও আবার এত রাতে?

গান শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায় শফিউল্লারহ দুই মেয়ে নীলমণি ও ফুলমণির। দু'জনেই একসঙ্গে বিছানায় উঠে বসে। একজন অপরজেনের হাত চেপে ধরে। এমন মধ্যরাতে গান শুনে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ওদের নেই। ওরা দু'বোনে কান পেতে গান শোনে। দু'জনই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে বলে, বাজানের গলা। বাজান গান গাইতাছে।

দু'জনই অন্ধকার উপেক্ষা করে হুড়মুড় করে চৌকি থেকে নেমে দরজা খোলে। ততক্ষণে নেকজানও বেরিয়ে এসেছে। তিনজনে একই সঙ্গে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ওদের দেখে চমকে ওঠে শফিউল্লাহ। থেমে যায় ওর গান। নেকজান দু'পা এগিয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হইছে তুমার? গান গাইতাছ ক্যান?

নীলমণি ও ফুলমণি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ই জিজ্ঞেস করে, বাজান এই রাত দুপুরে গান গাইতাছেন ক্যান?

কাইল আমার নীলমণির বিয়া। আমার মাইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইবে।

নীলমণি ভগ্ন কণ্ঠে বলে, বাবো আপনের এ্যাত আমোদ ক্যান?

মাগো তুমার সংসার অইব। তুমি স্বামী পাইবা, সন্তান পাইবা। এর লাইগা আমার এ্যাত আমোদ।

কিন্তু বাবো আমার মনে সুখ নাই।

ক্যান মা?

আমার বিয়ার লাইগা আপনে ব্যাংক ঋণ করছেন। বাবো আপন ক্যামনে এই ঋণ শোধ দিবেন? বাবো আমি বিয়া করুম না।

ছি, মা ছি, এই কথা কইয়ো না। অমি দুঃখ পামু। আমি আমার গায়ের শ্রম দিয়া দেনা শোধ করুম। তুমি মনে কষ্ট নিয়ো না মাগো।

নীলমণি কাঁদতে শুরু করে। আস্তে আস্তে ওর ফোঁপানি বাড়তে থাকে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে যায়। ফোঁপানির শব্দ কেমন অদ্ভুত লাগছে। শফিউল্লাহ বিস্মিত হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। নেকজান এতটাই বিমূঢ় হয়ে পড়েছে যে ও নড়তেও পারছে না। ফুলমণি বাবার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে, যেই ব্যাডা যৌতুক লইয়া বিয়া করে হেই সংসারে কি বুবু ভালা থাকব?

ফুলমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে তালি বাজাতে বাজাতে বলে, বুবুর বিয়াডা ভালোই হবি। আমাগো ঘরে পরী নামছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিতে মেতে মেয়েরা ওদের ঘরে ঢুকে যায়। শফিউল্লাহ আর নেকজান কাছাকাছি হয়। দু'জনেই শরীরে গন্ধ পায়। যেন প্রথম সঙ্গমের সময় এখন। সেদিন ঘরে অন্ধকার ছিল। বাইরে শামকুকড়া পাখির ডাক ছিল। বালিশে ফুলেল তেলের গন্ধ ছিল। এখন আকাশ থেকে জ্যোৎস্না উধাও। উঠোনে নিম গাছের ছায়া নেই। চারদিকে অন্ধকারের বেড়া। পরিবেশটা এমনই চাই। দু'জনের নিঃশ্বাস ঘন হয়ে গেলে প্রবল পতনের শব্দে চারদিক ঝমঝম করে।

পরদিন বিয়ে হয়ে যায় নীলমণির।

তার পর দিন ওর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা।

ফুলমণি আর পাড়ার অন্য মেয়েরা রঙিন কাগজ দিয়ে নীলমণির বাসরঘর সাজিয়ে দিয়েছে। যে কয়জন অতিথি ছিল তারা সবাই গরুর মাংস আর খিচুড়ি খেয়েছে পেট ভরে।

শফিউল্লাহ মেয়ের বিয়ে দিতে পারার মতো বড় কাজটি করতে পেরে ভীষণ খুশি। কিন্তু নীলমণি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে শফিউল্লারহ ভীষণ মন খারাপ হয়। প্রবল শূন্যতা ওকে বিমর্ষ করে রাখে। মেয়ের বিদায় যে ওকে এমন কষ্ট দেবে এটা ওর ধারণা ছিল না। শফিউল্লাহর কাজে মন বসে না। অভাবের সংসারে অভাব বাড়ে। ঋণ শোধের জন্য ব্যাংকে আর টাকা জমা দেওয়া হয় না। দুটো কিস্তি দেওয়া হলে ছয়টি কিস্তি বাদ পড়ে যায়। এভাবেই চলছিল। কত মাস চলে গেল? হিসাব রাখে না শফিউল্লাহ। আষাঢ়ে তুমুল বৃষ্টি হয়। বন্যা নামে গ্রামে। নদীর পাড়ের গেরস্থি ভেঙে যায় কারো কারো। শীতে ভীষণ ঠাণ্ডায় মরে যায় শত শত শালিক। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে মৃত শালিক দেখে। নীলমণি মায়ের বাড়িতে এসে মৃত সন্তান প্রসব করেছিল একবার। ও আবার গর্ভবতী হয়েছে। ওর স্বামী আফজাল মাঝে মাঝে বলে, আব্বা আপনের ঋণের এই মাসের কিস্তি আমি শোধ কইরা দিমু।

না, না, তুমি দিবা ক্যান?

প্রবল আপত্তি করে শফিউল্লাহ। মেয়ের জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিতে হবে ভাবতেই ওর রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। যেন ও এখন যুদ্ধক্ষেত্রে। এ্যামবুশ করে শত্রুর অপেক্ষায় আছে।

আব্বা আপনে রাগ হইলেন ক্যান?

আমি মুক্তিযোদ্ধা । যুদ্ধ করা মানুষ।

শফিউল্লার চোখে ঝামা আগুন। জ্বলজ্বল করে দৃষ্টি। ক্ষেতের কাজ সেরে ফেরার পথে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে গ্রামটা দেখে। পুরো দেশটা ওর দেখা হয়নি। গ্রামটাই ওর কাছে দেশ। এই দেশের কাছ থেকে মেয়ের বিয়ের জন্য তিন হাজার টাকা ঋণ করেছে। দেশের ঋণ তো ওকে শোধ করতেই হবে। শফিউল্লাহ বিড়বিড় করে বলে, আমি কখুনই ঋণখেলাপি হমু না। প্রতিজ্ঞার কথা নিজের ভেতরে বড় করে তোলে শফিউল্লাহ। হনহনিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর দিক ভুল হয়। রোদে-গরমে ওর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। ও তো জানে ও এ পর্যন্ত সবগুলো কিস্তি শোধ করতে পারেনি। ওর অভাব ওকে পথ আটকে ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুলমণির বিয়ের বয়স হয়েছে। দু'চারটে কথা আসছে। পাত্র পক্ষেরও নানা টালবাহানা আছে। ফুলমণির জন্য কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়া যাবে না। শফিউল্লাহ চিন্তিত। নেকজান একটা সহজ সমাধান দিয়েছে। বলেছে দরকার হলে বসতবাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে ওর বাবার বাড়িতে চলে যাবে। সেখানে দু'জনে মিলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। নেকজানের প্রস্তাবে শফিউল্লাহর রক্ত হিম হয়ে যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে শূন্যে।

শেষ পর্যন্ত ভিটে বিক্রি করে দিতে হলো। ফুলমণির বিয়ের খরচের জন্য আর কোনো উপায় ছিল না। শফিউল্লাহ শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। ওর অভাবের সংসারটা ভেঙ্গে এমন টুকরো হয়ে গেল ভাবতেই কষ্ট হয় শফিউল্লাহর। মেয়ে দুটো চলে গেল, ভিটে গেল, শফিউল্লাহর মনে হয় এই সঙ্গে ওর যৌবনের তেজও গেল। কারণ টাকা শোধ হয়নি। ওর সম্বন্ধী নায়েব বলে, দুঃখ করো না মিয়া দেখবা তুমার এই ঋণের টাকা সরকার মাফ কইরে দেবে। তুমি না দ্যাশের জন্যি যুদ্ধ করছিলা। তুমি না মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযোদ্ধা! বিড়বিড় করে শফিউল্লাহ। সত্যি কি সরকার আমার ঋণের টাকা মাফ কইরে দেবে?

ওর চোখের ঝামা-আগুন স্তিমিত। ওর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে। ক্ষিদে পায় না। ঠিকমতো ঘুম হয় না। হাত-পা কাঁপে। ও ঘরের দাওয়ায় বসে থাকে। উপার্জন নেই। ও এখন সম্বন্ধী নায়েবের সংসারে বোঝা। নেকজান ভাইয়ের সংসারের আশি ভাগ কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিজের ও স্বামীর ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এই সংসারে ওদের উপার্জন টাকায় নয়, পেটে-ভাতের এবং ঘুমুনোর ঠাঁইয়ে।

কোনোদিন মেয়ের কাছে চিঠি লিখেনি শফিউল্লাহ। মেয়েরা খোঁজখর করে, আসা-যাওয়া করে। শফিউল্লাহর এখন মনে কষ্ট নেই। ওদের ঘরে পাঁচজন নাতি-নাতনি আছে। সংসারে নতুন মানুষ পাওয়ার আনন্দ ওকে বেঁচে থাকার তৃপ্তি দেয়। এখন শফিউল্লাহর বুকের ভেতর ভিন্ন যন্ত্রণা তড়পায়। ও জানতে পারেনি যে, ওর দুই জামাই শ্বশুরের ঋণ শোধ করার জন্য দু'চারটা কিস্তির টাকা অনেক কষ্টে যোগাড় করে জমা দিয়েছে। অসুস্থ-অবসর সময় ওকে যুদ্ধের স্মৃতির ভেতর ডুবিয়ে রাখে। একদিন ও সম্বন্ধী নায়েবের কলেজ পড়ুয়া ছেলের কাছ থেকে কাগজ নিয়ে তিনটি চিঠি লেখে। মেয়েদেরকে লেখে, প্রিয় মায়েরা আমার। আমি তুমাদের অযোগ্য পিতা। আমার নাম শফিউল্লাহ হাওলাদার। মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহ এখন সংসারের বোঝা।

চিঠিতে কোনো ইতি টানা হয়নি। সম্বন্ধী নায়েবের চিঠিতে লেখে, ভাইজান, মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহ এখন সংসারের বোঝা। যুদ্ধ করা মানুষ বোঝা হয় কেন?

চিঠি পড়ে মেয়েরা হাউমাউ করে কাঁদে। আর বিষন্ন দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে তাকিয়ে থাকে নায়েব। কেন নিজেকে সংসারের বোঝা ভাবছে শফিউল্লাহ? ও তো দেশের কাছে কিংবা জাতির কাছে কিছু চায়নি। ও তো মুক্তিযোদ্ধার গৌরব নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। তাহলে? জীবনযুদ্ধে পরাজিত শফিউল্লাহর কি এই গ্লানি শোভা পায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নায়েব চিঠিটা হাতে নিয়ে শফিউল্লাহর কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, এমুন চিঠি লিখছ ক্যান শফিউল্লাহ?

শফিউল্লাহ মাথা নিচু করে থাকে।

কথা কও না যে?

দ্যাশের কাছে আমর ঋণ আছে। আমি শোধ করবার পারি নি।

অ, এই কতা। আগামী মৌসুমে ধান বেইচা আমি কিছু টাকা শোধ দিমু। তুমারে আমি ঋণখেলাপি কইরা মরবার দিমু না। যদি আমরা শোধ দিবার না পারি তাইলে তুমার ঋণ মাফ কইরা দেওয়ার জন্য আমরা ব্যাংকের কাছে আবেদন করুম। গেরামের বেবাক মানুষ এই আবেদনে সই দিব। তুমি এই গেরামে বাস করতাছ এর লাইগা গেরামের মানুষের কত গর্ব। তুমি কিচ্ছু ভাইব না শফিউল্লাহ।

শফিউল্লাহ মাথা সোজা করে কৃতজ্ঞচিত্তে নায়েবের দিকে তাকায়। যেন জীবনের ফেলে আসা বছরগুলো ফুলের মতো ফুটতে থাকে ওর দৃষ্টিতে। নায়েব বলে, তুমার মাইয়াগোরে আনতে লোক পাঠামু। ওরা কাছে থাকলে তুমার মন ভালো থাকবি।

ঠিক কইছেন ভাইজান। আমার নাতিপুতি– ওরা কত সোন্দর। ওগোরে ছুঁইলে কলিজা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

হা-হা করে হাসে শফিউল্লাহ। সে হাসি শুনে নেকজান কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, মাইয়া দু'ইটার বিয়ার দিনে আপনে এমুন কইরা হাসছিলেন।

শফিউল্লাহ হাসতেই থাকে। হাসতে হাসতে নেকজানের হাত ধরে ওর মুখের দিকে তাকায়। চারদিকে ঝকঝকে দিনের আলো। অন্ধকার হলে শফিউল্লাহ নেকজানের হাত ধরে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবত। কিন্তু সেটা এখন হবে না। নেকজান অনুভব করে শফিউল্লাহর মুঠিতে আটকাপড়া ওর দু'হাত শফিউল্লাহ পিষ্ট করছে। ওর হাত নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলছে, আমাগো মাইয়া দুইটা আমাগো কলিজার টুকরা। ওরা ছিল বইলাই তো এতগুলো বছর বাঁইচা আছি।

তাইলে কও তুমার মনে আর কনু দুঃখ নাই?

শফিউল্লাহ আবার মাথা নিচু করে। দুঃখ নাই বললে মিথ্যা বলা হবে। ও মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটে। ও নেকজানের দিকে তাকাতে পারে না।

পরদিন গ্রেফতার করা হয় শফিউল্লাহকে। ক্ষুদ্র ঋণখেলাপি হিসেবে সার্টিফিকেট মামলার ওয়ারেন্টি হিসেবে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় ভেঙে পড়ে গ্রামের মানুষ।

নেকজানের আকাশফাটা চিৎকার স্বরাজপুর গ্রামের বাতাসে ভাসতে থাকে। থানায় বসে থাকে শফিউল্লাহ। নেকজানের চিৎকার শুনতে পায় ও। থানার চার দেয়ালের ভেতর জমাট হয়ে থাকে নেকজানের কণ্ঠ। শফিউল্লাহ দেয়ালের গায়ে কাৎ হয়ে পড়ে। যেন ঘাড় মটকে গেছে। বিড়বিড় করে পানি চায়। চারপাশে কেউ নেই। শফিউল্লাহর ঘোলাটে চোখ কাঁপতে থাকে। ও বুঝতে পারে শরীরের চেয়ে মন ভেঙেছে বেশি। লজ্জায়, গ্লানিতে ও কুঁকড়ে যেতে থাকে। ভাবে, এখন যদি ওর মৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় তাহলে ঋণ শোধ করা হবে না। ও মেয়েদের নাম ধরে ডাকে। বলে, মাগো আমার মরণ অইলে আমার ঋণ তুমরা শোধ কইরা দিও। আমি তো তুমাগোরে সব ঋণের বাইরে রাখতে চাইছিলাম। পারলাম না।

শফিউল্লাহ কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়। শূন্য ঘরে কিছু নেই। ও পা লম্বা করে দেয়। ও বুঝে যায় যে ওর কোনো অবলম্বন নেই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওকে কোর্টে চালান দেওয়া হবে। কিন্তু হয় না। কেউ ওর খোঁজ করে না। ছত্রিশ ঘণ্টা ধরে ও থানার শূন্য ঘরের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বসে থাকতে থাকতে গড়িয়ে পড়ে। ওর আর জ্ঞান ফিরে আসে না। মৃত্যু হয় শফিউল্লাহর।

মৃত্যুর আগে ও পুলিশের বুটের শব্দ শুনেছিল। কেউ যেন বলছিল, শালা নাকি মুক্তিযোদ্ধা। শালার মেয়ে দু'টি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমাগো বাবারে ছাইড়া দ্যান। আমাগো বাবো মুক্তিযোদ্ধা। তারপর হা-হা করে কারা যেন হেসেছিল। ওর মেয়েদের নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছিল। শফিউল্লাহর হৃৎপিণ্ড মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

শফিউল্লাহকে দাফন দেওয়ার আগে মুক্তিযোদ্ধা শফিউল্লাহার মরদেহ জাতীয় পতাকা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়।

নীলমণি আর ফুলমণি প্রবল বিস্ময়ে পতাকার দিকে তাকিয়ে থাকে। দু'বোন একসময় বুকভরে শ্বাস টেনে বলে, ফুলের ঘেরান আসতিছে।

শফিউল্লাহকে এখন কবরে নামানো হবে। জানাজা পড়ানো হয়ে গেছে। পতাটাকা সরিয়ে নেওয়ার সময় কবরের পাশে জড়ো হওয়া গ্রামবাসী বিভ্রান্তের মতো চারপাশে তাকায়। কোথা থেকে ফুলের গন্ধ এসে ভরে গেছে চারদিক। আকাশ থেকে কি পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে?

তখন নীলমণি আর ফুলমণি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, বাবা আপনে জানতে পারলেন না যে আপনের শরীল থাইকা পদ্মফুলের ঘেরান আসতিছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর একসঙ্গে কাটিয়ে দু'জনের ভালো-মন্দের হিসেবের ধারণায় সময়টি ভালোই গেছে বলে দু'জনে ভাবার চেষ্টা করে। যদিও জাকিয়া খাতুন দাম্পত্য জীবনে এই দীর্ঘ সময় থেকে খানিকটুকু আলাদা করে রাখে, যেটুকু তার জন্য মোটেই ভালো সময় ছিল না। আশরাফুল আলমের পরকীয়া প্রেমের কারণে। মহিলা বিদেশ চলে যাওয়াতে সম্পর্ক বেশিদূর এগোয়নি। আর আশরাফুল আলম জাকিয়া খাতুনকে এমন ধারণায় ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে যে, পুরুষ মানুষের এসব একটু আধটু থাকে। এ নিয়ে স্ত্রী বেশি বাড়াবাড়ি করলে সংসারে অশান্তি হয়।

জাকিয়া খাতুনের জ্বলে ওঠা চোখ সংসারের শান্তির বাসনায় নিভে যায়। সংসার মানে তো কতগুলো ঘর, দু'ছেলে, এক মেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে একটি বিছানা। স্বামীর সবকিছু মেনে নেয়া স্ত্রীর উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে জাকিয়া খাতুন এখনও দ্বিধান্বিত, কিন্তু ওই যে ছেলেমেয়ে, তাদের ভবিষ্যৎ এবং সুখ শান্তি ইত্যাদি ধারণায় বোকাসোকা, সরল জাকিয়া খাতুন ক্যাতকেতে আবেগে ক্রমাগত তলাতে থাকে। এই তার দোষ। ছেলেমেয়ে তো একটা বিশেষ সময়ের পরে নিজেদের দেকভাল নিজেরাই করবে, এত চিন্তার কী আছে, এটুকু জাকিয়া খাতুন বুঝতে চায় না, মেনে নেওয়াও কঠিন। সে মনে করে ছেলেমেয়ে বাবা-মা মরে যাওয়ার আগের মুর্হুত পর্যন্ত তাদের পাখার নিচে থাকবে। আবারও এই পানসে ধারণা, যেটা আশরাফুর আলমের নানা কূটচালের সহায়ক বলে সে এটাকে প্রশ্রয় দিয়ে আনন্দেই থাকে।

পঁয়ত্রিশতম বিবাহবার্ষিকীতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এক ফাঁকে আশরাফুল আলম বলে, আমাদের দিনগুলো তো ভালোই গেল, নাকি?

জাকিয়া খাতুন চুপ করে থাকে। যেন আশরাফুল আলমের কথা ও শুনতে পায় নি কিংবা শুনতে পেলেও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। যেন যে মুখগুলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে মুখগুলো খুব অচেনা, ওরা ওর প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম। কেমন করে এতকাল ও এদের জন্য সংসার রক্ষা করল? আশরাফুল আলম প্রথমে বলে, কি হয়েছে?

জাকিয়া খাতুন চুপ।

বড় ছেলে সৌম মায়ের ঘাড়ে হাত রেখে মায়ের মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে, কি হয়েছে তোমার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলের বৌ নন্দিতা দু'পা এগিয়ে এসে বলে, মা কি হয়েছে? বলেন মা কি হয়েছে?

জাকিয়া খাতুন চুপ।

পেছন থেকে ছোট ছেলে শুভ চেঁচিয়ে বলে, তুমি কথা বলছ না কেন মা? এমন চুপ করে থাকা তোমার স্বভাব না। আমরা তো দেখেছি তুমি কথা বলতে ভালোবাসো।

শুভর এ কথায় মৃদু হাসির রোল ওঠে। কিন্তু ওদের এসব কথা এবং হাসিতে জাকিয়া খাতুনের ভাবান্তর হয় না। নিশ্চুপই থাকে।

এবার কাছে এসে খেঁকিয়ে কথা বলে অর্পিতা। যেন জাকিয়া খাতুন ওর মা নয়, কন্যা। মায়ের মুখের ওপর আঙুল নাড়িয়ে বলে, মা এটা একদম ঠিক নয় যে তুমি আমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করবে। হয় তোমার কি হয়েছে তা আমাদের বলবে, আর যদি না বলবে–

জাকিয়া খাতুন হাত উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে, থামো। আমার পঁয়ত্রিশ বছরের সংসার শূন্য। একটা কচিমুখ জড়িয়ে ধরতে পারব না বলে কি আমি এই সংসার আগলে বসে আছি? আমি তোমাদের কাছ থেকে বাচ্চা চাই।

বাচ্চা! অস্ফুট ধ্বনি জাগে আশরাফুল আলমের কণ্ঠে। সৌম আর নন্দিতা নিজেদের ঘরে চলে যায়। অর্পিতা চেয়ারে ঠেস দিয়ে কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। শুভ চেঁচিয়ে বলে, আমার কাছ থেকে বাচ্চা ফাচ্চা চেও না। আমি তো ঘোষণা দিয়ে দিয়েছি যে আমি বিয়ে করব ন। বিয়ে আমার পোষাবে না।

থাম শুভ। আশরাফুল আলম চেঁচিয়ে বলে, তোদের হয়েছে কি? এমন অবাস্তব কথা চেঁচিয়ে বলার কি যুক্তি আছে?

এটাই বাস্তব বাবা। তোমরা আমার ওপর প্রেসার তৈরি করবে না।

বাজে কথা বলো না। যাও নিজের ঘরে যাও।

শুভ চলে যায়। বাকি থাকে অর্পিতা। ও সোজাসুজি মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি নড়ে না। জাকিয়া খাতুনও মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। স্ত্রীকে মেয়ের দিকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আশরাফুল আলম মৃদু স্বরে বলে, ওর প্রসঙ্গটা থাক জাকিয়া। আমরা তো জানি একটা কিছু না পাওয়ার দুঃখ আমাদের দু'জনকে মিইয়ে থাকার পথে ঠেলে দিচ্ছে। সব কিছু ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও।

আমি ছেড়ে দিতে পারব না। আমার সংসারে বাচ্চা চাই। এমন মরুভূমির মতো খা-খা সংসার কি একটা সংসার!

জাকিয়া মুখ ঝামটে কথা বলে। তারপর তীব্র ভাষায় বলে–

আমি অর্পিতার আবার বিয়ে দেব। ডাক্তার তো বলেনি যে ওর বাচ্চা হবে না। বলেছে ওর কোনো সমস্যা নেই।

আমার বিষয়টি আমাকে ভাবতে দাও। তুমি মাথা ঘামিয়ো না মা।

অর্পিতা নিজের ঘরে চলে যায়। বসে থাকে আশরাফুল আলম আর জাকিয়া খাতুন। ওরা দাম্পত্য জীবনে পঁয়ত্রিশটি বছর নির্বিঘ্নে কাটিয়েছে বলে যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবছে, ঠিক তখনই দু'জনে সামনের দিনগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ওদের হিসেবে সংসারের যে ধারণা তা মিলছে না বলে মানতেও পারছে না। তিন ছেলেমেয়ের এক ডজন সন্তান নিয়ে সংসারের পরিপূর্ণ রূপের আদল ওরা দেখতে চায়। দু'জনের বয়সই তো পেরিয়েছে। আর কত অপেক্ষা!

ও পানি খাবার অজুহাতে আবার ফিরে আসে বাবা মায়ের সামনে। দেখতে পায় দু'জনে নিশ্চুপ বসে আছে। অর্পিতা রান্নাঘরে ঢুকে বোতল থেকে গ্লাসে পানি ঢালে। ইচ্ছে করে সময় কাটায়, ভাবে বাবা-মায়ের দু'একটি টুকরো কথা শুনতে পাবে, কিন্তু চারদিকে কোথাও কোনে শব্দ নেই। অপির্তা শব্দ করে দু'গ্লাস পানি ঢালে। আসলে ও শব্দ তৈরি করতে চায়, কিন্তু যে শব্দ তৈরি করলে বাড়ি ভরে যাবে তেমন শব্দ শুধু গ্লাসে পানি ঢেলে তৈরি করা যায় না। ওই ধরণের শব্দ তো ওর বুকের ভেতরে জমা হয়ে আছে, শুধু ও চিৎকার করলেই হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে অমন বিশাল চিৎকার করার ইচ্ছে ওর নেই। ও বাবা মায়ের জন্য দু'গ্লাস পানি হাতে নেয়। ভাবে, ওদের পানি খাওয়া দরকার। ওদের ভীষণ তৃষ্ণা– শিশুর হাসি, শিশুর কান্না, কলকণ্ঠ ইত্যাদির জন্য। অর্পিতা বিড়বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু বুকের ভেতর থেকে শব্দ বের হয় না। আশ্চর্য, তাহলে বিপুল তৃষ্ণা কি ওর বুকের ভেতরেও জমে আছে? ও দুপদাপ পা ফেলে বাবা মাকে দু'গ্লাস পানি দিয়ে বলে, খাও।

পানি?

হ্যাঁ, পানিই তো খাবে।

জাকিয়া খাতুন হাত বাড়িয়ে বলে, দাও। আশরাফুল আলম কিছু না বলে হাত বাড়ায়। দু'জনে এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে না। থেমে থেমে খায়। অর্পিতা সামনের চেয়ারে বসে। বলে, তোমার এমন অদ্ভুত ইচ্ছার কথা শুনে আমি খুব বিরক্ত বোধ করছি।

অদ্ভুত ইচ্ছা? দু'জনই একসঙ্গে উচ্চারণ করে। জাকিয়া খাতুন আরও বলে, এটা আমার স্বাভাবিক ইচ্ছা না?

মোটেই না। তুমি মা আমাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করে কথা বলছ।

মানবাধিকার? সেটা আবার কি?

আশরাফুল আলম মৃদু হেসে স্ত্রীর দিকে তাকায়। অর্পিতা হাসিতে ভেঙে পড়ে। তুমুল হাসি উচ্চকিত হতে থাকে। ঘর ভরে যায়। সৌম আর নন্দিতা নিজেদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। হাসির কারণ বোঝার চেষ্টা করে। শুভ সরাসরি অর্পিতার সামনে দাঁড়ায়। আঙুল নাচিয়ে বলে, এসব পাগলামির মানে হয় না। থাম বলছি অর্পিতা, নইলে–

কি করবি তুই আমার? তুই আমাকে থামানোর কে?

শুভ কথা বাড়ায় না। ঝামেলা করার ইচ্ছে নেই। নিজের ঘরে ফিরে যায়। ও দরজা বন্ধ করে দিয়ে নোরা জোনসের গানে মনোযোগী হয়। নোরা ওর প্রিয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী। সৌম ও নন্দিতা দাঁড়িয়েই আছে। অর্পিতা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন শুভ হাট করে দরজা খুলে দেয়। উঁচু ভলুমে ছেড়ে দেয়া নোরা জোনসের সুরেলা কণ্ঠ ঠাণ্ডা বাতাসের মতো প্রবাহিত হয় ঘরে। শুধু পুড়ে যায় অর্পিতার ভেতরটা। গান ওর হৃদয় স্পর্শ করে না। ও দেখে মা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। অর্পিতা মনে করে এই মুহূর্তে বল এখন ওর কোর্টে। ও অনায়াসে ওটাকে গড়াতে পারে নিজের জীবনের পতিত মাঠটার ওপর দিয়ে। নারী-পুরুষের সম্পর্ককে পুরুষতান্ত্রিক ধারণায় ক্ষেত্র ও বীজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নারী ক্ষেত্র, পুরুষ বপন করে বীজ। উৎপন্ন হয় ফসল। কিন্তু পুরুষ বুঝতে পারে না যে নারীর একটি বাড়তি শক্তি আছে। নারী ইচ্ছা করলে নিজেকে বীজমুক্ত করতে পারে। বীজরক্ষা করা এবং বীজ প্রত্যাখ্যান করা দুইই নারীর ক্ষমতার আওতায় পড়ে। হাঃ পুরুষ! অর্পিতা বড় করে শ্বাস ছেড়ে উড়িয়ে দেয় ছয় বছরের যাপিত সংসার জীবন। মাস ছয়েক আগে ওর ঘর ভেঙেছে। ও নিজের সংসার ছেড়ে মায়ের কাছে এসে উঠেছে। এই ছয় বছরে ওর কোনো বাচ্চা হয়নি। ডাক্তারের কণ্ঠ ভেসে আসে। বলছে, আপনাদের দুজনের কারও কোনো সমস্যা নেই। অপেক্ষা করুন। ভবিষ্যতে বাচ্চা হলে হতে পারে। এই রহস্য ব্যাখ্যার অতীত।

দু'জনের সামনে ডাক্তারের মুখটা একটা বিকৃত মানুষের মুখের আকার ধারণ করেছিল। সেই আকারের কোনো স্পষ্ট ধারণা ওদের সামনে ছিল না। দু'জনেই দু'জনের হাত দৃঢ়ভাবে ধরে বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু অরূপের চেহারাটা বদলাতে বেশি দিন সময় লাগে নি। কয়েক মাস যেতেই স্পষ্ট ভাষায় গলার রাশ টেনে বলল, আমার বাচ্চা চাই। আমি অপেক্ষা করতে পারব না।

অপেক্ষা করতে পারবে না বললেই হলো। কীভাবে সমাধান হবে। চাইলেই তো আর বাচ্চা হচ্ছে না।

অর্পিতার কণ্ঠে ঝাঁঝ ছিল। ওর নিজেরও তো বাচ্চার জন্য কষ্ট হচ্ছে, সেটা অরূপ কিছুদিন ধরে উপেক্ষা করছে দেখে ওর মেজাজ খিঁচড়ে ছিল। কিন্তু ওর মেজাজের তোয়াক্কা না করে অরূপ অদ্ভুত রসিকতায় চোখটা গোল করে নাকের বাঁশি ফুলিয়ে বলেছিল, ইচ্ছে করলেই সমাধান আছে।

আছে? অর্পিতার চোখ জ্বলে উঠেছিল। আবারও নিদারুণ উপেক্ষা ঝলসে উঠেছিল অরূপের চোখে। অদ্ভুত শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলেছিল, আমাদের তো কোনো সমস্যা নেই। তাহলে আমি অন্যত্র চেষ্টা করে দেখি। তুমিও তাই করতে পারো। তুমিও অন্য কাউকে পছন্দ করে বিয়ে করো অর্পিতা।

তুমি কি পছন্দ করে ফেলেছ?

অরূপ হা হা করে হাসতে হাসতে স্থান ত্যাগ করেছিল, ওর প্রশ্নের জবাব দেয়নি। অর্পিতা ওর পিছু পিছু শোবার ঘরে গিয়েছিল। বলেছিল, আমি মাত্র একদিন আগে জেনেছি যে তুমি রুমানার প্রেমে পড়েছো। তোমার মুখ থেকে বিষয়টা শুনব বলে আমি জিজ্ঞেস করিনি। অপেক্ষা করেছি তুমি কখন মুখ খোলো তা দেখার জন্য। কিন্তু কৌশলটা চমৎকার নিয়েছ। সেজন্য অভিনন্দন। তবে সঙ্গে এটাও বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, এভাবে অজুহাত দেখিয়ে কাজ হাসিল করো না। সত্য বলার সৎ সাহস রেখো।

উপদেশ দিচ্ছ?

হ্যাঁ, দিচ্ছি। যেমন তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ, তেমন।

অরূপ আবার একই ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলেছিল, বেশ তো খেলা জমেছে। চলো খেলি। দেখি কে হারে কে জেতে।

তোমার সঙ্গে মাঠে নামার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি যাকে নিয়ে মাঠে নেমেছ তার সঙ্গেই খেলো।

পরদিনই সংসার ছেড়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল অর্পিতা। জাকিয়া খাতুন ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে বলেছিল, তুই কি একা এলি? জামাই কই?

হ্যাঁ, একাই এলাম। যেখান থেকে এসেছি সেখানে আর ফিরতে না হলে একাই তো আসতে হয় মা।

মানে?

মানে কি তোমাকে স্কুল খুলে বোঝাতে হবে? সোজা কথাটা বোঝ না।

কি করেছিস?

বাচ্চা বিয়াতে পারি নি।

মায়ের মুখের ওপর প্রশ্নটা ছুঁড়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল অর্পিতা। একটুক্ষণ পর শুনতে পেয়েছিল জাকিয়া খাতুনের কান্না। অর্পিতা পাত্তা দেয় নি। মেয়ের ঘর ভাঙলে মা তো কাঁদবেই, কাঁদাই তো স্বাভাবিক। কাঁদুক, কেঁদেকেটে নিজে নিজে থামবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, কপাল চাপড়াবে, কত কি! কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে ভীষণ ধমকেছিল নিজের ভুল চিন্তার জন্য। মেয়েরা মা নাহলে তাকে কাঁদতে হবে কেন? আর যদি কাঁদেই তবে সে কান্না স্বাভাবিক হবে না কেন? অরূপের মাতো কাঁদবে না। বরং খুশি হয়ে বলবে, বাঁজা মেয়েটাকে বিদায় করে ভালো করেছিস বাবা। এবার একটি ভালো মেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আয়। সেই মা আগে থেকে কি করে বুঝবে যে মেয়েটি ভালো? তার ছেলে মেয়েটির ক্ষেতে বীজ বপন করলেই ফসল ফলবে। হাঃ! মেয়ের মায়েদের যেমন শেখাতে হবে, ছেলের মায়েদেরও তেমন শেখাতে হবে। হাঃ! কয়শ' বছর লাগবে! পাঁচশ বছর কি? তারও বেশি হতে পারে। কারণ এরও বেশি সময় ধরে পুরুষরা নারীদেরকে নারীদের বিরুদ্ধে এত কিছু শিখিয়েছে যে সেখান থেকে তাদের বের করে আনা সহজ কাজ নয়।

অর্পিতা দ্রুত নিজের অতীত থেকে ফিরে আসে। মায়ের চোখে চোখ রেখে বলে, এই মুহূর্তে সৌম আর নন্দিতাই তোমার একমাত্র ভরসা। অপেক্ষায় থেকে দেখো যে ওরা তোমার জন্য কি করতে পারে।

এ কথা শুনে সৌম আর নন্দিতা ঘরে ঢুকে যায়। শুভর ঘরের ক্যাসেট প্লেয়ারের ভল্যুম কমেছে। আশরাফুল আলম ফোন ধরার জন্য উঠে যায়। জাকিয়া খাতুন উঠতে গেলে অর্পিতা চেঁচিয়ে বলে, কেউ কোথাও যাবে না। আমি সবাইকে নিয়ে বাইরে খেতে যাব। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি বাবা ও মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িটা ঝিম মেরে গেছে। কেউ সাড়া দেয় না। সবাই জানে অর্পিতা যা করতে চেয়েছে সেটা ও করবে। কেউই ছাড় পাবে না। একই সঙ্গে সবাই অনুভব করে এই ঘরে আর কোনো গান নেই। শুভ বোধহয় যন্ত্রটি বন্ধ করে দিয়েছে। অর্পিতা বিড়বিড় করে বলে, সুর সবার ভেতরে ঢোকে না, কখনো সেটা বাতাসে মিশে মিলিয়ে যায়। এই বাড়িতে বাস করা মানুষগুলোর বুকের ভেতর এখন সুর নেই। পুরো বাড়িজুড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে তরকারির গন্ধ। বুয়া রাঁধছে, ওর রান্নার হাত দারুণ। নোরা জোনসের কণ্ঠের সঙ্গে কি বুয়ার রান্নার তুলনা হতে পারে? দু'জনের দক্ষতা কি একই ধরণের? অর্পিতা মৃদু হাসে। কখনো এসবের উত্তর মেলে না। সমীকরণ ঘটানো সহজ নয়। ও দেখতে পায়, জাকিয়া খাতুন রান্নাঘরে ঢুকেছে। আশরাফুল বলছে, আমাকে এক কাপ চা দিও। জাকিয়া খাতুন কিছু বলে না। আশরাফুল আলমের দিকে তাকায় না। কিন্তু আশরাফুল আলমের কাছে এক কাপ চা ঠিকই পৌঁছে যাবে। এভাবেই দু'জনে সংসার করেছে। অর্পিতার মনে হয়, ভালোই কাটিয়েছে ওরা। যদিও মায়ের কাছ থেকে পুরুষের বাড়তি সুযোগ নিতে বাবা ছাড়েনি। মা ক্ষমা না করলে ওরা তিনজনে ভাঙা পরিবারের সন্তান হয়ে যেত। বাবার পরকীয়া বিষয়ে দু'জনের ঝগড়া তো ওরা তিন ভাইবোন কান খাড়া রেখে শুনতো। অর্পিতার মনে হয় ওর আবার ভীষণ হাসি পাচ্ছে– গলা ফাটানো হাসি– ও হা-হা করে হাসতে হাসতে নিজের ঘরে যায়। কেউ কারো ঘর থেকে বেরিয়ে আসে না। অর্পিতা নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে।

সকালে নন্দিতা অফিস যাওয়ার আগে অর্পিতা ওর হাত ধরে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে বলে, তোমাদের বিয়ের তো তিন বছর হয়ে গেল। তোমরা মায়ের ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারো।

শুধু মায়ের ইচ্ছে কেন, আমিও বাচ্চা চাই অর্পিতা। কিন্তু হচ্ছে না। ছ'মাস ধরে কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছি।

অর্পিতা শুকনো মুখে বলে, তোমার জীবনেও কি আমার মতো নাটক হবে কি-না?

নন্দিতা হাত উল্টে ভ্রু কুঁচকে বলে, কে জানে!

তোমরা তো ডাক্তার দেখাওনি। দেখিয়েছে?

না। ভাবছি দেখাব।

সৌম রাজি?

হ্যাঁ, সকালে মায়ের কথা শুনে আমাকে বলেছে আজই ডাক্তারের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে।

বাহ, চমৎকার। তোমাদের জীবনে ফুল ফুটুক। আমরা তোমাদের দিকে চেয়ে আছি।

অর্পিতা নন্দিতাকে জড়িয়ে ধরে। দু'জনের গভীর আলিঙ্গনে দুজনেই অনুভব করে, নারীই শক্তি। ক্ষেত্র অনুর্বর হলে বীজ যেমন ফসল ফলাতে পারে না, তেমনি ক্ষেত্রেরও সাধ্য আছে বীজ ছুঁড়ে ফেলার। আহ, কী শক্তি। নন্দিতা বের হওয়ার আগে জিজ্ঞেস করে, অফিস যাবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আজ মায়ের সঙ্গে থাকব। ছুটি নিয়েছি।

দেখো আমরা তিনজন নারী একটি সম্পর্ক আঁকড়ে এখানে জড়ো হয়েছি। আমরা ভালো থাকতে চাইলে থাকতে পারি। বাধা কোথায়?

অর্পিতা মৃদু হেসে বলে, বাধা অনেক। তবে সম্পর্ক জিইয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে বেশি বর্তায়। আমরা খেসারত বেশি দেই।

পরে আলোচনা হবে।

নন্দিতা দ্রুত বেরিয়ে যায়। নারী বিষয়ক আলোচনায় ও তেমন আগ্রহ বোধ করেনা। অর্পিতার ধারণা ও এখনো লক্ষণরেখার ভেতরে আটকে পড়ে আছে। ওকে বাইরে আনা যাবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ও হাত উল্টিয়ে স্রাগ করে, তারপর রান্নাঘর থেকে এক কাপ চা নিয়ে আবার নিজের ঘরে আসে, সঙ্গে পত্রিকা। পত্রিকাটির লিড নিউজ পড়ে শেষ করার আগেই শুভ উঁকি দিয়ে বলে, মাঝের পৃষ্ঠায় যা একটা ইন্টারেস্টিং নিউজ আছে।

কেমন? বলে ফ্যাল।

খবরের পাতায় আছে সাবেক আর্চ বিশপ জর্জ ক্যারি–

কি করেছেন তিনি?

শুভ হো হো করে হাসতে হাসতে বলে, বলেছেন প্রিন্স চালর্স ও কামিলা পার্কারের বিয়ে করা উচিত।

বেশ মজা তো! বিয়ের আর বাকি কি?

হেসে গড়িয়ে পড়ে অর্পিতা। হাসতে হাসতে বলে, কিছুই বাকি নেই। শুধু একটা বাচ্চা হলে বলবে অবৈধ সন্তান।

সেজন্যই তো বিয়ে নামক ইন্সটিটিউশনকে আমি ঘেন্না করি। ওর মধ্যে আমি ঢুকতে পারি না।

বাচ্চা চাস না?

বেশি খায়েশ হলে একটা অবৈধ নিয় নেব।

হ্যাঁ, যা বলেছিস। কোনো মেয়েই তো অবৈধ বাচ্চা বিয়ানোর জন্য বসে নেই।

না বিয়ালে না বিয়াবে। দরকার নেই।

শুভ দুপদাপ পা ফেলে চলে যায়। অর্পিতা পত্রিকার মাঝের পৃষ্ঠা খুলে চার্লস আর কামিলার ছবি দেখে। দু'জনের বয়স হয়েছে। আর্চ বিশপ কামিলার পক্ষে ওকালতিতে নেমেছেন। অর্পিতা বিড়বিড়িয়ে বলে, তুমি ডায়নার সংসার ভেঙেছ কামিলা। এখন বিয়ের পক্ষে কথা বলার জন্য লোকজন যোগাড় করছ। রাজকুমার তোমাকে যে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে সেটাও হজম করে যাচ্ছ। বেশ আছ ভেজা বেড়াল কামিলা। এমন ভাব করছ যেন ভাজা মাছটি উল্টে শেখোনি। ভেজা বেড়াল কামিলা লেজ উঠিয়ে লাফ দিতে শেখো, পরের হাঁড়িতে নাক ঢুকিয়ো না কেবল। ঝনঝন করে বেজে ওঠে রেকর্ড, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও অর্পিতা, ও চমকে ওঠে। কামিলা ওকে ধমকাচ্ছে। তুমি কে যে আমাকে উপদেশ দিচ্ছ? তোমার স্বামীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা একবার ভাব। সে কি প্রিন্স চার্লসের চেয়ে আলাদা আচরণ করেছে? সেও তো তোমাকে মেঘনা নদীর প্রবল ঢেউয়ে ডিঙি নৌকায় তুলে দিয়ে নিজে সটকে পড়েছে। উঠেছে ময়ূরপঙ্খী নায়ে। হা-হা অর্পিতা তুমি আমাকে ভেজা বেড়াল বানিয়েছে। আমি মোটেই ভেজা বেড়াল নই। প্রিন্স রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী। হা-হা করে হেসে ওঠে অর্পিতা, তেমার আশায় গুড়ে বালি কামিলা, তোমার কপালে রাজসিংহাসনের ভাগ নেই। অর্পিতার হাসি শুনে জাকিয়া খাতুন ঘরে ঢোকে।

হাসছিস যে?

তোমার জন্য সুখবর আছে মা। সৌম আর নন্দিতা ডাক্তারের কাছে যাবে। শিগগিরই তুমি একটা বাচ্চা পাবে তোমার সংসারে।

ওরা তো পরীক্ষার জন্য যাবে। আগে পরীক্ষাটা শেষ হোক।

ও বাব্বা তুমি দেখছি বুদ্ধিমতী হয়ে যাচ্ছো মা।

জাকিয়া খাতুন নিঃশব্দে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখ বড়, গোলাকার, কালো মণি ছটফট করে না, ওটা স্থির। অর্পিতা এই প্রথম আবিষ্কার করে যে ওর মায়ের চেহারাটা ভোঁতা, চ্যাপ্টা, ধ্যাবধেবে ফর্সা গায়ের রঙ উজ্জ্বল নয়, ফ্যাকাসে দেখায়– তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু মা বেশ তৃপ্ত চেহারা নিয়ে হাসিমুখে দিনযাপন করে, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা তাকে খুব পীড়িত করে বলে অর্পিতার কখনো মনে হয়নি। এই মা এখন শাণিত, বুদ্ধিদীপ্ত চকচকে চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসির আভা, যেন বলতে চায় ভাবিস না যে আমি তোদের কথা বুঝি না, বুঝি।

ক'দিন পর বাড়ি ফিরে সৌম আর নন্দিতা নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খোলে জাকিয়া খাতুন নিজে, কিন্তু দু'জনের কেউই তার দিকে তাকায় না। বাড়িতে অর্পিতা ও শুভ নেই। সুতরাং জাকিয়া খাতুনকে নিজের ওপরই ভরসা করতে হবে। দরজার একটি কপাট খোলা, হু হু করে বাতাস ঢুকছে, একতলা বাড়ি বলে সামনের প্রাঙ্গণ থেকে শুকনো পাতা উড়ে আসছে। জাকিয়া খাতুন দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে ওদের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহলে কি ওদের কোনো ভালো খবর নেই? কিন্তু কি হয়েছে তা জানার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করে না। জাকিয়া খাতুন ধীরেসুস্থে দরজা বন্ধ করে বেডরুমে আসে। আশরাফুল আলম কপালে হাত রেখে শুয়ে আছে। জাকিয়া খাতুনের পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ না খুলেই বলে, কি হয়েছে?

ঘরের ভেতরে একগাদা ধুলা আর শুকনো পাতা ঢুকলো। বাইরে একটি ছোট ঘূর্ণিঝড়ের মতো উঠেছিল।

তোমার কি হয়েছে জাকিয়া খাতুন?

এই সংসারে শিশু আসবে এমন আশা নেই।

আশরাফুল আলম কিছু বলার আগেই দু'জনে শুনতে পায় কলিং বেলের শব্দ। জাকিয়া খাতুন দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায়। বুঝতে পারে এটা অর্পিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিস থেকে ফেরার সময়। আশরাফুল আলম আর জাকিয়া খাতুন দু'জনেই দরজা খোলার জন্য ছুটে যায়। অর্পিতা দু'জনকে একসঙ্গে দেখে আশ্চর্য হয়। চেঁচিয়ে বলে, কি হয়েছে? দু'জনের মুখে কথা নেই। অর্পিতা দু'জনের হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। তখন দরজা খুলে সৌম ওকে ডাকে।

অর্পিতা আমার ঘরে আয়।

সন্ধ্যায় অর্পিতা বাবা-মাকে বলে, সমস্যাটা সৌমের। ও কখনোই বাবা হতে পারবে না। নন্দিতা ঠিক আছে। বেচারা! অর্পিতা শ্বাস ফেলে চুপ করে যায়। বাড়িজুড়ে গা ছমছম করা অখন্ড নীরবতা। কোথাও কোনো শব্দ নেই।

শেষপর্যন্ত এই বাড়ির সবটুকু মনোযোগ অর্পিতার ওপর গিয়ে পড়ে। ও একটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে এবং তার পক্ষে অবস্থান নেয়।

একদিন সকালবেলা অফিসে যাওয়ার আগে অর্পিতার মাথা টলে উঠলে ও দেখতে পায় ওর চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু হলুদ ফুলকি, কিন্তু অল্প সময়ে নিজেকে সামলে নিতে পারে ও। জাকিয়া খাতুন টেবিলে নাস্তা রেডি করছিল। সন্দেহগ্রস্ত দৃষ্টিতে কপাল কুঁচকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে মা?

মাথা ঝিমঝিম করছে। শরীরও কেমন জানি লাগছে।

অফিসে যেতে হবে না, শুয়ে থাক।

না, অফিসে যেতে হবে। অনেক কাজ আছে। নাস্তা দাও। আমি আসছি।

আসছি বলে দ্রুত পায়ে বাথরুমে ঢোকে অর্পিতা। বমি করে। খালি পেটে বমির তোড় কম, কিন্তু কষ্ট হয়, যেন পেট মুচড়ে নাড়িভুঁড়ি উগলে আসছে। জাকিয়া খাতুন মেয়ের পিছু এসে বাথরুমের দরজায় দাঁড়ায়। বুঝতে পারে বমি করার ভঙ্গিটা চেনা, বাচ্চা পেটে এলে বেশিরভাগ মেয়েদের এমন বমি হয়। কিন্তু অর্পিতার হবে কেন? জাকিয়া খাতুন বুঝতে পারে ওর নিজের মাথাটা টলছে। চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু হলুদ ফুলকি উড়ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে অর্পিত কি বলবে, মা তোমার জন্য সুখবর আছে, তোমার সংসারে বাচ্চা আসবে।

না, জাকিয়া খাতুনের মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বের হয়। ও ভয়ে নড়তে পারে ন। অর্পিতা বেসিনের দিকে মুখ নামিয়ে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। বেশ অনেকক্ষণ ধরে ও জল নাড়ে। জাকিয়া খাতুনের মনে হয় জল নেড়ে ও স্বস্তি পাচ্ছে। কিন্তু ওর নিজের ভেতরে জলের ভয়াবহ প্লাবন ভাসিয়ে নিচ্ছে দু'কুল। ওর বুকের ভেতরের নিজস্ব জমিটুকু জলের নিচে। তখন অর্পিতা মুখ ঘুরিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, ফেরার পথে ডাক্তরের কাছে যাব। ওষুধ নিয়ে আসব। ঠিক হয়ে যাবে। জাকিয়া খাতুন আস্তে করে বলে, দাঁড়া।

কিছু বলবে মা?

হ্যাঁ। দম নেয় জাকিয়া খাতুন।

কি বলবে বলো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তুই কি কাউকে ভালোবাসিস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থমকে যায় অর্পিতা। তারপর স্মার্ট ভঙ্গিতে বলে, জীবনকে আমি উদার দৃষ্টিতে দেখি। আমার সংস্কার নেই মা।

তুই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলি না।

দুই চারজন তো আমার চারপাশে আছে কিন্তু আমি এখনও কাউকে নির্বাচন করিনি।

আমার মনে হয় তুই নির্বাচন করেছিস। আয় নাস্তা খাবি।

জাকিয়া খাতুন ভয় ঝেড়ে ফেলে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। পরিবারের অন্যরা টেবিলে বসে। আশরাফুল আলম হাসতে হাসতে বলে, এই ভোরবেলা মা মেয়ের সভা কিসের? আমরা কি জানতে পারি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো?

দু'জনের কেউই আশরাফুল আলমের কথার জবাব দেয় না। চেয়ার টেনে বসে নাস্তা খেতে মনোযোগী হয়। একটা পরোটা খেয়ে অর্পিতা বুঝতে পারে ওর শরীর আবার গুলিয়ে উঠছে। ও দু'হাতে মুখ চেপে ধরে ছুটে বাথরুমে যায়। ডাইনিং টেবিলে বসে সবাই শুনতে পায় যে অর্পিতা বমি করছে। নন্দিতা উঠে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আশরাফুল আলম জাকিয়া খাতুনের দিকে তাকিয়ে বলে, ওর কি হয়েছে?

জাকিয়া খাতুন প্রবল বিরক্তিতে মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, জানি না।

অর্পিতা বিকেলে বাড়ি ফিরলে জাকিয়া খাতুন কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, ডাক্তার কি বলেছে?

ইউরিন টেস্ট করতে হবে।

ও সোজা নিজের ঘরের দিকে হেঁটে যায়। মায়ের সামনে দাঁড়ায় না। ডাক্তার যা সন্দেহ করছে সেটা সত্যি হবে কি-না তা নিয়ে নিজের ভেতরে প্রবল উত্তেজনা। কিন্তু সেটা কারো সঙ্গে এই মুহূর্তে ভাগ করার উপায় নেই। ও দরজা বন্ধ করে কাপড় খুলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে। নিজের শরীরে এত বিস্ময় ছিল তা কি ও কোনো দিন জানতে পেরেছিল!

দু'দিন পর বাড়িতে একটা একতরফা ঘোষণা ওকে দিতে হয়। প্রথমে ভেবেছিল, মা আর নন্দিতাকে বলবে। পরে ভাবল, অন্যায়টা কোথায়? এই সংসার তো একটা শিশু চায়। ও মা হবে এর চেয়ে বড় খবর এই সংসারের আর কি হতে পারে?

ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ, শীত পড়েছে দারুণ, বাইরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও হচ্ছে। আকাশে কালো মেঘের ভেসে যাওয়া দেখার কেউ নেই। ওরা সবাই সোফার উপর গুটিসুটি বসে আছে। শুধু উসখুস করছে শুভ। আগামীকাল ক্রিসমাস, প্যাট্রিসা বলেছে ওর সঙ্গে সারাদিন কাটাতে। বৃষ্টি দেখে ও বিরক্তি বোধ করছে। কালকের প্রোগ্রামটা নষ্ট হতে পারে। এমন আশঙ্কায় ও চুপসে আছে। কিন্তু অর্পিতা ঘরে এসে দাঁড়ালে সবাই নড়েচড়ে বসে।

ও সুন্দর করে সেজেছে। ময়ূরকণ্ঠী রঙের চমৎকার তাঁতের শাড়ি পরনে, সঙ্গে একই রঙের টিপ। হালকা লিপস্টিক ঠোঁটে, লম্বা চুলের গোছা পিঠের ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে আছে। হাতের কাছে বেলি ফুলের মালা থাকলে ও খোঁপা বাঁধত। গায়ে কালো রঙের শাল। ওকে দেখে শুভ চেঁচিয়ে বলে, তোকে দারুণ দেখাচ্ছে অর্পিতা। সৌম সায় দেয়। বলে, অর্পিতা আজ একদম অন্যরকম। ওকে দেখে আমার ভেনাসের কথা মনে হচ্ছে।

নন্দিতা উঠে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, ওকে আমার সরস্বতীর মতো মনে হচ্ছে। যেন সাদা ধবধবে রাজহাঁসের পিঠে ও এখন।

থামো। জাকিয়া খাতুন সবাইকে থামিয়ে দেয়। বলে ও আজ আমাদের একটা খবর দেবে। আমরা ওর কথা শুনব।

অর্পিতা ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আশরাফুল আলম নরম কণ্ঠে বলে, তুই আমাদের কি বলবি মা?

দাঁড়াও খবরটা শোনার আগে আমি নোরা জোনসের সিডিটা ছেড়ে আসি। শুভ উঠে দাঁড়ায়।

যখন মৃদু লয়ে নোরা জোনসের কণ্ঠের সুর ভেসে বেড়ায় চারদিকে তখন অর্পিতা দু'পা সামনে এগিয়ে এসে বলে, আজ আমার ভীষণ আনন্দের দিন। আমার আনন্দ তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।

সবাই উদগ্রীব হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পলকহীন।

অর্পিতা কণ্ঠের শব্দে জোয়ার এনে বলে, ডাক্তার বলেছে আমি মা হবো।

পলকহীন চোখগুলো পাথুরে চোখের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর একে একে যে যার ঘরে চলে যায়। ঘরে অর্পিতা একা। শুভ ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়েছে। অর্পিতার মনে হয় পুরো বাড়িজুড়ে অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। একা হয়ে যাওয়ার অনুভব ওর ভেতরে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনার চন্দ্রকলা

রাজাকার সুলেমানের দিকে দা উঁচিয়ে নিকলির সখিনা বলে, এইডা কি চিনস? কল্লা ফালায়ে দিমু।

সুলেমান কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলে, মাগী।

সখিনা শব্দটা ঠিকই শুনতে পায়। বয়স হলেও ওর শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ম। ও দা উঁচিয়ে সুলেমানকে তাড়া করলে সুলেমান ছুটে পালায়। সখিনাও পিছু নেয়। এক পর্যায়ে ও সুলেমানকে লক্ষ্য করে দা টা ছুঁড়ে মারলে সেটা অল্পের জন্য ওর গায়ে লাগে না। তারপরও দা'টা কুড়িয়ে নিয়ে সুলেমানের পিছু ছাড়ে না। ও বুঝে গেছে যে রাজাকারটার গায়ে একটা কোপ দিতে না পারলে ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে না। ওর শরীরে আগুন। আকাশ যদি সব বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয় তবু ওর আগুন নিভবে না। কিন্তু বেশিক্ষণ ওর দৌড়ানো হয় না। আকবর আলী ওর পথ আটকায়।

সখিনা খেঁকিয়ে বলে, কি অইছে?

আমার লগে আপনেরে যাইতে অইবে বুজান।

ক্যান? ফাতেমার ব্যাদনা উঠছে?

হ। মেলাক্ষণ ধইরা কঁকাইতাছে।

আর তুমি মিয়া বইয়া রইছ। চলো। ওই রাজাকার শুয়োরডারে মারতে পারলাম না।

পারবেন এ্যাকদিন।

হেইদিন তুমি থাকবা আমার লগে?

গেরামে থাকলে থাকমু। আর যুদ্ধে গেলে–

থাম। বাতাসের কান আছে।

এই দ্যাশের বাতাস অহন আমাগো লগে। হুনলেও মুখ খুলব না।

সখিনা একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে আকবর আলীকে দেখে। মানুষটা যুদ্ধে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে, শুধু স্ত্রীর প্রসবের অপেক্ষা। যে কচি মানুষটা পৃথিবীতে আসবে তার মুখটা দেখে তবেই তো বিদায় নেবে। সেটা হবে শুভ বিদায় নেয়া। আকবর আলীর কপালে বড় একটা কাটা দাগ আছে। দু'কান বরাবর একদম সোজা টানা লাইন, যেন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। সখিনার চোখের আগুন নিভে গিয়ে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ওর শুকনো হাড়গোড়সর্বস্ব শরীরে কোথায় যেন কি আছে, যেটা এই গ্রামের অনেকের চেহারায় নেই, এটা আকবর আলীর ভাবনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনা মৃদু কণ্ঠে বলে, এই গেরামের আকাশ-বাতাস-পশু-পক্ষী-তৃণলতা সব আমাগো পক্ষে। যুদ্ধে আমরাই জিতুম।

আকবর আলী সখিনার হাত থেকে দা'টা কেড়ে নিয়ে নিজের কপালে ছোঁয়ায়। সফিনার হাতে দা'টা ফেরত দিয়ে বলে, বুজান তাড়াতাড়ি চলেন।

তোমার কিন্তু মাইয়া অইবে আকবর আলী।

ক্যামনে বুঝলেন?

কত প্যাড খসাইলাম। আমি যা কই হেইডাই হয়।

সখিনার তীক্ষ্ম খনখনে কণ্ঠে প্রবল আত্মবিশ্বাস। এ আত্মবিশ্বাসের বলে একটি ধারালো দা নিয়ে ও যুদ্ধ করতে নেমেছে। সুলেমানের মতো রাজাকাররা, যারা গায়ের জোয়ান মেয়েদের পাকবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়ার জন্য খুঁজে বেড়ায় তাদের ও তাড়া করে। খুব সহজে ও বুঝতে পারে যে মানুষটার মতলব কি। সখিনা একই কণ্ঠস্বরে বলে, তেমার মাইয়াডা আর সময় পাইল না। যুদ্ধ মাথায় কইরা আসতে আছে। কথা শেষ করতে না করতে হো-হো করে হাসে নিজের মনে।

হাসেন ক্যান বুজান?

মাইয়াডারে মিলিটারির হাত থাইকা বাঁচান লাগব না! সখিনার হাসি থামে না। আকবর আলী বিব্রত হয়ে বলে, কি যে কন বুজান।

সখিনার কণ্ঠস্বর একই রকম। কণ্ঠস্বরের হেরফের হয় না। বলে, যুদ্ধ যদি মেলা দিন চলে?

চলতে পারে। চলুক। আমার মাইয়া আপনের মতো মুক্তিযোদ্ধা অইবে। যুদ্ধ করবে।

ঠিক কইছ, মিলিটারির হাতে পড়ার আগে কয়ডারে মাইরা লইবে।

দু'জনে কথা শেষ করতে করতে বাড়িতে পৌঁছে যায়।

ফাতেমার মা আমিনা বিবি শুকনো মুখে মেয়ের কাছে বসে আছে। মেয়েটা কেমন নেতিয়ে পড়েছে, ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ আলোহীন। ওর নিবু নিবু চোখের তারার দিকে তাকালে বুক ধড়ফড় করে। কিন্তু ব্যাথা জোরেশোরে ওঠে না। প্রসবের সময়ই তো মেয়েমানুষ বোঝে জোরেশোরে ব্যাথা ওঠা কি! সখিনা দীর্ঘদিন ধরে দাইয়ের কাজ করছে। কতগুলো ছেলেমেয়ে ওর হাতে হয়েছে তার হিসেব নেই। জিজ্ঞেস করলে মাথা নেড়ে বলবে হাজার হাজার। আকবর আলীর সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়। ফাতেমার কাছে বসে ওকে চেপে-চুপে দেখে বলে, আর বেশিক্ষণ লাগব না। হইয়া যাইব।

হইয়া যাইব? আমিনা বিবি বিস্ময়ে সখিনার দিকে তাকায়। মেয়েমানুষটা কি জাদু জানে, এমন করে কথা বলছে কীভাবে? তারপর জোর জোরে বলে, আল্লাহ মাবুদ রহম করো।

আমিনা বিবি দু'হাত উপরে তোলে। দরুদ পড়ে মেয়ের কপালে ফুঁ দেয়। সখিনার দু'হাত ধরে বলে, আপনেরে দেইখা আমার ধড়ে পরান আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনা মৃদু হাসে। ওর হাসিতে মায়াবী রহস্য আছে, আমিনা বিবির তাই মনে হয়। অন্যদের হাসিতে ওর এমন কিছু চোখে পড়েনি। এই গাঁয়ের কেউই সখিনার মতো না। সখিনা মুখে হাসি আটকে রেখে ফাতেমার পেটের কাপড় আলগা করে দেয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা আকবর আলীকে উঁচু কণ্ঠে বলে, নাড়ি কাডার লাগাই বেলেড আনছ? আমিনা বিবি বলে, সব রেডি আছে।

চুলায় গরম পানি রাখো।

আইচ্ছা।

আমিনা বিবি সুলতানের মাকে চুলায় এক হাঁড়ি পানি বসাতে বলে।

ত্যানা রাখছ?

দুইডা পুরান শাড়ি আছে।

সখিনা ঘুরে আমিনা বিবির মুখের দিকে তাকায়। আবার সেই রহস্যময় ভঙ্গি দু'চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে উঠে দপ করে নিভে যায়। সখিনা অভিজ্ঞ কণ্ঠে বলে, বাইচ্চা বিয়ানো মাইয়ালোগের একডা যুদ্ধ, বুজলা।

আমিনা বিবি মাথা নাড়ে। সে নিজে দশটা ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে দু'টা মরা হয়েছিল। যুদ্ধ কি ও বোঝেনি। বাচ্চা বিয়ানো খুব কঠিন সেটাও ওর মনে হয়নি। কিন্তু সখিনার অভিজ্ঞতা এমন কেন?

সখিনা মা হতে পারেনি। নিঃসন্তান। কিন্তু সখিনা যুদ্ধ বোঝে। সেজন্য সখিনা দেশের যুদ্ধকে নিজের দায়ের মাথায় তুলে নিয়েছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে নেমেছে। আমিনা বিবি হঠাৎ করে সখিনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। সখিনা ভ্রু কুঁচকে বলে, কি অইল সালাম করলা ক্যান?

আপনে সালাম পাওয়ার মানুষ হের লাইগা।

সখিনা হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসেত দা'টা উঠিয়ে বলে ইডা চিনো?

কি এডা?

যুদ্ধ। স্বাধীনতার যুদ্ধ।

ঠিক বুজছ। তুমিও মুক্তি। মুক্তিরা বাড়িতে আইলে ঠিকমতন খাওন দিও।

আমিনা বিবি ঘাড় কাত করার সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা ও মাগো বলে আর্ত-চিৎকার দিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে। কাছাকাছি যারা ছিল তারা উঠোনে জড়ো হয়। শুকনো মুখে তাকিয়ে থাকে বন্ধ দরজার দিকে। ফাতেমার আর্তনাদের শব্দে আকবর আলী বারান্দা থেকে নেমে চলে যায়। ওর বুকের ভেতর প্রবল জলের শব্দ গুমগুম করে। ও নিজেকে সামলাতে গিয়ে অনুভব করে ফাতেমার আর্তচিৎকার শুনে ওর দু'চোখ জলে ভরে গেছে।

এর কিছুক্ষণের মধ্যে সখিনা দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলে, একডা মাইয়া হইছে গো। চাঁদের মতো ফুটফুইট্টা মাইয়া। মিলিটারি আর রাজাকাররা দেখলে অহনই লইয়া যাইব। কইব, এই দ্যাশে এমুন খুবসুরত মাইয়া ডলনের লাইগা আর পাই নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনার কথা শুনে উঠোনে দাঁড়ানো মানুষগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। যে যার কাজে চলে যায়। শুধু আকবর আলী একা দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, অহনই তো যুদ্ধে যাওয়ার সময়। মাইয়ার মাথা ছুঁইয়া কমু স্বাধীনতা না লইয়া ঘরে ফিরুম না। ওর নাম রাখুম চন্দ্রমণি।

একটু পরে সখিনা ওকে ডাকে। বলে, আহ মাইয়ার মুখ দ্যাহ।

আকবর আলী দ্রুত পায়ে ঘরে ঢোকে। ন্যাকড়ায় জড়ানো ছোট মানুষটা অপূর্ব সুন্দর, মাথা ভর্তি চুল। ও অপলক তাকিয়ে থাকে।

আমিনা বিবি ভীত কণ্ঠে বলে, নজর দিও না বাজান।

কোলে দিবেন?

সখিনা চেঁচিয়ে বলে, না কোলে দিমু না। অহন যাও। আকবর আলী ফাতেমার কপালে হাত রেখে বেরিয়ে আসে। নিচু এবং তীক্ষ্ম স্বরে বলে, মাইয়া দেখছ। অহন যুদ্ধ। অহনই গেরাম ছাড়বা। তোমারে গেরামে দেখলে কল্লা ফালায়ে দিমু।

আকবর আলী সখিনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। বলে, মাইয়ারে আপনের জিম্মায় থুইয়া গেলাম। মাইয়ার মায়েরেও দ্যাখবেন।

চিন্তা মাথায় রাখবা না। সব ঝাইড়ে ফালায়ে যাও। রব বাহিনীর কাছে টেরেনিং লইবা। ক্যাম্পের রাস্তা চিনো তো?

আকবর আলী মৃদু হেসে ঘাড় নাড়িয়ে চলে যায়। এ গ্রামের সব খোঁজ তো ওর নখদর্পণে। সবই তেমন আছে, শুধু পাক বাহিনীর ঘাঁটিগুলো নতুন, ওগুলো আবর্জনা, পোড়াতে হবে। সাধারণ মানুষ তো ঠিকই আছে, শুধু রাজারকারগুলো বদলা মানুষ, ওগুলোকে শেষ করতে হবে। এ দু'টা বাড়তি জঞ্জাল ছাড়া দেশটা তো ওদের ঠিকই আছে। ও বাঁশঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয় যাওয়া পর্যন্ত সখিনার দৃষ্টি ওকে অনুসরণ করে। নড়তে পারে না সখিনা। মাথার ভেতর একটা প্রবল ঘূর্ণি ওকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। জ্বলে ওঠে চোখ। রব বাহিনীর ইনফর্মার হয়ে কাজ করে। সামনে একটা বড় যুদ্ধ, করতেই হবে, না করলে শুয়োরগুলো নড়বে না। ঘোঁত ঘোঁত করতেই থাকবে। সখিনা আপন ভাবনায় তলিয়ে যায়। ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে, ঘরের ভেতর থেকে একটু আগে জন্ম নেয়া চন্দ্রকন্যার কান্না ভেসে আসে। আহা, গানের মতো লাগছে, সখিনার বুক ভয়ে যায়, যুদ্ধের সময় জন্ম নিলেও যুদ্ধ বুঝবে না, কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে দেশের নদীর জল ওর হবে, বাতাসের শ্বাস নেয়াটা ওর নিজের হবে। ওর জন্য এসব আনবে বলেই তো ওর বাবা যুদ্ধে গেল। আজ থেকে মেয়েটির নাম চন্দ্রকলা।

ও ঘুরে দাঁড়াতেই দৌড়াতে দৌড়াতে আসে জামাল। ওকে দেখেই চিৎকার করে ওঠে, খালা গো!

কি অইছে?

আপনের বইনের পোলা তাজুলরে মিলিটারিরা গুলি দিছে। ও স্কুলের মাঠে চিৎ হইয়া পইড়া আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনা মুহূর্তমাত্র বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে ঢুকে নিজের পরনের শাড়িটা খুলে ফেলে ফাতেমার মেয়ের জন্য ন্যাকড়া বানানোর পুরনো শাড়িটা পরে। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া শাড়িটার বিভিন্ন অংশ গায়ের ওপর টেনে রাখে। রান্নাঘরে গিয়ে চুলোর ছাই মাখায় মাথায়-হাতে-পায়ে-চুলে। ভিখারিনী সাজে। একটা নারকেলের মালা দড়ি বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে মাগা ভিখ দ্যান বলতে বলতে বেরিয়ে যায়। এভাবেই ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে নানা খবর পৌঁছায়। ছোটখাটো অপারেশনেও অংশ নিয়েছে। কখনো সরাসরি চলে যায় পাকবাহিনীর ক্যাম্পে। কলসি ভরে টিউবওয়েল থেকে পানি এনে দেয়। দু'বার দু'জন রাজাকার হাত ধরে পাট ক্ষেতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা দিয়ে কুলোতে পারেনি। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে যে, এটাও যুদ্ধ। শরীর দিয়ে যুদ্ধ। মাইয়ামানষ পুরুষের চাইতে বেশি পারে। ও ধর্ষণের ব্যাপারটি গায়ে মাখেনি। বরং ওই ধর্ষণ ওকে অরও তেজী করেছে। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলেছে, দেহামু যুদ্ধ কারে কয়। তবে কেউ ওকে বেশি বিরক্ত করেনি– ওদের লক্ষ্য জেয়ান ডবকা মেয়ে। তখনই তো ওর হাতে দা উঠেছে। কুপিয়ে শেষ করার তাড়নায়। একদিন একজনকে পাগলিনী সেজে তাড়া করেছিল। লোকটি ব্রিজের ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিল নদীতে।

সখিনা এসব ভাবতে ভাবতে মাঠের ধারে বড় গাবগাছটার নিচে বসে। স্পষ্ট দেখতে পায় জামালকে। গুলিতে বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, মুখটা তেমন আছে, যেমন ও ঘুমিয়ে থাকে, ঠিক তেমন– সখিনা নিজেকে বোঝায়, এমন বীরই তো চাই, চিৎ হয়ে নিজের আকশের দিকে মুখ উঁচু করে রাখবে।

সারা দিন পড়ে থাকে জামালের লাশ।
সারা দিন আকাশে ওড়ে শকুন।
সারা দিন বসে থাকে সখিনা।
সূর্য দপদপ করে মাথার ওপরে।
ওর ক্ষিদে পায় না।

ওর বুকের ভেতরে ক্রোধ জমে। ও দু'চোখ ভরে শকুনের ওড়া দেখে, ভাবে মাঠ ভরে হাজার হাজার শকুন নামাতে হবে– মিলিটারি আর রাজাকারগুলোর চর্বিসর্বস্ব শরীর খুবলে খাবে ওরা। ওহ, বুকটা তড়পায়, কিন্তু কাঁদে না, ওর কান্নাও পায় না। যুদ্ধের সময় মানুষকে মরতে হবে, কিন্তু তার জন্য কাঁদতে হবে না। কাঁদলে ক্রোধ ভিজে যাবে। ক্রোধ ভেজানে চলবে না। একজন এসে ওকে একটা লাথি দিয়ে বলে, বসে আছিস ক্যান?

ক্ষিদা লাগছে বাজান।
ক্ষিদে পায় কেন? মরতে পারিস না?
তাইলে গুলি দ্যান, খাই আর মরি।
ওই তুই কেরে এত বড় কথ বলিস! মাথা তোল তো মুখট দেখি।

সখিনা মাথা তোলে না। কাত হয়ে পড়ে যায়। মুখ গোঁজে মাটিতে। লোকটা ওকে আর একটা লাথি মেরে চলে যায়। শুয়ে থেকেই ও দেখতে পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামালের লাশ চ্যাংদোলা করে তুলে নদীতে ফেলার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। সখিনা দু'হাতে ঘাস আঁকড়ে ধরে। ভাবে গাছের ছায়ার নিচের কি শীতল মাটি, ওর শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে! তখন ওর চোখ ভিজতে শুরু করেছে। নিজেকে আর সামলানো যাচ্ছে না, কিছুতেই না, লোহার মানুষ হলেও এ সময় তার চোখ না ভিজে পারে না।

বুকের ভেতর ভেসে উঠে ছবি।

স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করার পরে আর একদিনও থাকেনি শ্বশুড়বাড়িতে। কাউকে কিছু না বলে এক কাপড়ে বেরিয়ে চলে যায়। কোথায় যাবে? বড় বোনের সচ্ছল পরিবার। সেখানে থাকার জায়গা হতে পারে। বোনের বাড়িতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দশ বছরের জামাল চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে বলেছিল, খালা আসছে। আমি খালারে আর ছাড়ুম না। খালা আমাগো বাড়িতে থাকবে।

ওর বোন দুলাভাইও ওর ফিরে না যাওয়ার সঙ্কল্পের সঙ্গে একমত হয়। নিজের উপার্জনে ভাত খাবে বলে ধাত্রীবিদ্যা শেখে। সরকারি হাসপাতালে সাত টাকা বেতনে কাজ পায়। এ বছরে এটা বেড়ে হয়েছে পনেরো টাকা। সেই জামাল ওর চোখের সামনে বড় হয়েছে। ও কি বুঝে ওকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল। ও কখনো ওই বালকের কাছে তা জানতে চায়নি। সেই বালক এখন যুবক। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে জীবন দিল। ওর বাবা মা ভয়ে আসেনি। সখিনা এই মাঠে একা।

ও উঠে দাঁড়ায়।

দু'দিন পাকবাহিনীর ক্যাম্প রেকি করে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হয়। ক্যাম্পে যারা ছিল ওকে ঘিরে ধরে।

খবর কি বুজান?

অপারেশনে যাইবা?

কহন?

অহন। অহনই।

অহনই অহনই– সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে ছেলেরা। তৈরি হতে থাকে। একজন ওকে এক বাটি মুড়ি দেয়, সঙ্গে গুড়। সখিনা মুড়ি-গুড় খেয়ে দু'তিন গ্লাস পানি খায়। মনে হয় আজ রাতই ওর রাত– আজই একটা কিছু হবে।

সে রাতেই একটা কিছু হয়। মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণে হতাহত হয় বেশ কয়েকজন পাকসেনা ও রাজাকার। সখিনা ওর দা দিয়ে কুপিয়ে একাই হত্যা করে পাঁচ রাজাকার। সে রাতে ক্যাম্পে ফেরার পথে সখিনা দেখতে পায় চন্দ্রকলার বিস্তার। আকবর আলীর মেয়েটির মুখ তারার মতো ফুটে থাকে গাঁয়ের আকাশে! জন্ম ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের মুহূর্তটিতে সখিনা আবার ব্যাকুল হয়ে জামালের জন্য কাঁদতে থাকে।

ক্যাম্পে ফিরে ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাত রান্না করে। নুন ভাত আর মরিচ পোড়া। বিজয়ের আনন্দে সাদা ভাত ওদের কাছে অমৃত। ওরা তরকারি চায় না, মাছ না, মাংস না। গল্পতে, উচ্ছ্বাসে বিজয়ের আনন্দ ওদের থালার সাদা ভাতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি যেন প্রস্ফুটিত জুঁইফুল। রাতে ঘুম আসে না সখিনার। ক্যাম্পের বাইরে বসে থাকে। একা।

স্বামীর বাড়ি ছেড়ে আসার পরে ও আর বিয়ে করেনি। প্রস্তাব এসেছিল অনেক। ও রাজি হয়নি। বেঁচে থাকাকে নিজের মতো করে নিয়েছে। মনের মতো লোক না পেলে একা থাকাই তো ভালো। খবরদারি করার কেউ থাকবে না। ও খুশি। বেশ কেটে গেল জীবন। এখন এই যুদ্ধ, ওর জীবনকে বদলে দিয়েছে। ও আর দুঃখী বিবি এবং সোনারবের কন্যা না। ওর ডাক নাম ঘটকি না। ওর গাঁয়ের নাম গরুই না। ওর সামনে পথঘাট এখন অনেক বড়। ওর নদীটা সাগর আর ওর চারপাশের গাছগুলো পাঁচশত বছরের পুরনো। শুয়োরগুলোকে মেরে সাবাড় করে দিতে পারলে সব কিছুর ভেতরে নতুন জীবন আসবে। ও নতুন জীবন পাবে। সখিনা বিবি হাতের কাছে রাখা দায়ের গায়ে চুমু খায়।

একদিন দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

সবার মনে আনন্দ।

উৎফুল্ল জোয়ারে মানুষের ভেতরে স্রোতের ঢল।

কিন্তু সখিনা বিবি বেশি খুশি হতে পারে না। ওর বুকের ভেতর আশঙ্কা। রাজাকার সুলেমানটা তো মরেনি। ওকে শেষ করতে না পারলে জামালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।

ও একা ঘরে শুয়ে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। ভাবে স্বাধীনতার জন্য অনেক দিয়েছে, কিন্তু পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায়নি। জামালের মা পাগলের মতো দিন কাটায়।

একদিন কমান্ডার রব এসে বলে, আমাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন সখিনা বুবু।

না। আমি যামু না। সখিনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে।

কেন যাবেন না? দেশ স্বাধীন হয়েছে।

স্বাধীন অইলে কি অইবে। রাজাকার সুলেমান মরে নাই। আবার যুদ্ধ লাগলে দা পামু কই?

হা হা করে হাসতে হাসতে কমান্ডার চলে যায়। ভাবে, মানুষটার মাথা খারাপ হয়েছে। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে আবার যুদ্ধের কথা ভাবতে হবে কেন?

সখিনা বিবিকে তখন ডাকতে এসেছে কেউ। ধর্ষণের শিকার একটি মেয়ের গর্ভ খালাস করতে হবে। মেয়েটিকে এতদিন ঘরের মাচার উপর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সখিনা তীব্রভাবে লোকটির দিকে তাকিয়ে বলে, পোলা হোক, মাইয়া হোক আমারে দিবা? লোকটি আগ্রহ ভরে বলে, দিমু, দিমু। আমার মাইয়া তো তাইলে বাঁইচা যায়। জন্মের লগে লগে আপনে লইয়া আইসেন। অহন আমার লগে চলেন।

হ, চলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনা দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। আজ ও একটি নতুন কাজে যাচ্ছে। একটি যুদ্ধশিশুর মায়ের গর্ভ খালাস!

দাই-জীবনে এই কাজটি ওর করা হয়নি। এমন কতগুলো মেয়ে আছে এই গাঁয়ে যাদের এমন গর্ভখালাস ওকে করতে হবে।

আর একটি যুদ্ধ তো এখনই শুরু হলো। সখিনা চারপাশে তাকায়। গ্রামটা কেমন নীরব হয়ে আছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে ওর পায়ের শব্দই কেবল মাটি ফাটিয়ে চৌচির করে দিচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দ ওকে তেজী, একরোখা এবং সাহসী করে তোলে। নিজেকেই বলে, সখিনা বিবির হাতে মেলা কাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~